অগ্নিযুগের কথা

সতীশ পাকড়াশী

নবজাতক-প্রকাশন

এ-৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি. গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

অগ্নিযুগের শহীদ স্মরণে

অতীত সন্ত্রাসবাদী মুক্তিবিপ্লব আন্দোলন ভারতে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগের 'স্বদেশী আন্দোলন' থেকেই আরম্ভ। এখন তা অতীতের স্মৃতিকথা মাত্র। তবু ইতিহাসের উপাদান হিসাবে আমার এ বইয়ের কিছুটা মূল্য থাকতে পারে।

উষার রঙীন আলোর মতই একদিন বাংলার বুকে জ্বলে ওঠে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম রক্তশিখা। শত শত বৎসরের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের কঠিন আবরণ বিদীর্ণ করে গর্জে উঠেছিল বাঙালীর হাতের বোমা ও পিস্তল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তখন বাঙালী যুবকের বীরত্ব গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সারা ভারতবর্ষ বিস্ময়ে চেয়ে দেখে 'ভীরু বাঙালীর' এই জীবন-অভিযান। কত যুবক সে-অনলে আত্মাহুতি দেয়, ফাঁসিতে গুলিতে প্রাণ দেয়—দ্বীপান্তরে অন্ধকার কারাকক্ষের অসহনীয় নির্যাতনে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে; নিজেদের ত্যাগ, সাহস ও ঐকান্তিকতা দিয়েই দেশজননীর বন্ধন মোচন করবে, এমনই ছিল তাদের দুর্জয় সংকল্প যারা সেদিনে সাম্রাজ্যবাদী দানবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে নির্বিচারে জীবন বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল—যারা মৃত্যুর গর্জন শুনেছিল সঙ্গীতের মতো, তাদেরই সাথী হওয়ার জন্য আমিও কিশোর বয়সে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম দেশে। স্বাধীনতার মন্ত্রে জীবন পণ করে গুপ্ত-বিপ্লব সমিতির কাজে নেমে পড়েছিলাম। মরণ অভিযানে বেরিয়েও আমার মৃত্যু আসেনি। পথ চলতে চলতে পেয়েছি বিপ্লবের এক নতুন পরিচয়, জীবনের নতুন কর্ম সাধনা, ক্রম-বিকাশমান মানবতার এক অভিনব সুন্দর পরিকল্পনা, পুলিসী উৎপাত, অজ্ঞাতবাস, কারাবাস ও দ্বীপান্তর বাসের দীর্ঘ যাতনা সয়েছি, সহকর্মীদের সঙ্গে বর্বর পুলিসী নির্যাতন ও অমানুষিক কারা নির্যাতনে ইংরাজের অসভ্য কদর্য চরিত্র উপলব্ধি করেছি। সাথীদের অনেকে শত্রুর গুলিতে মরেছে, ফাঁসিতে মরেছে, জেলের নিষ্ঠুর নির্যাতনে মরেছে, আমি কিন্তু আজও বেঁচে আছি। বেঁচে আছি বলেই দীর্ঘ উনত্রিশ বছর দেশী ও বিদেশী শাসনের বন্ধনে থাকার পর বৃদ্ধ বয়সে অতীত জীবনস্মৃতি লিপিবদ্ধ করতে পারলাম। যুগ যুগান্তর অতিক্রম করার পর আমার এ তুচ্ছ জীবন কাহিনী ঐতিহাসিকের কাজে লাগতে পারে। অন্ধকার যুগের নিশীথে যারা স্বদেশের মুক্তি প্রেরণায় দুঃসাহসিক উদ্যোগ নিয়ে জীবনের আলো জ্বালিয়ে দেশের মানুষের কাছে মুক্তি পথের সন্ধান দিয়েছিল—যারা আত্ম-জীবন উৎসর্গ করে ভারতের জাতীয় জীবনের ঊষর ক্ষেত্রে প্রাণের ধারা প্রবাহিত

করেছিল, যাদের কথা অনেকেই ভুলতে বসেছে, এ ছোট বইয়ে তাদেরই কথা বলতে চেষ্টা করেছি, তাদেরই জীবনের রক্তে গড়া অতীত অগ্নিযুগের বিপ্লব সংগ্রামের কিছুটা আভাস দিতে চেষ্টা করেছি এখানে।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে যে বিপ্লবের সঙ্কল্প ও প্রেরণা নিয়ে আমার কর্মজীবনের আরম্ভ, আজও সে সঙ্কল্প তেমনই আছে। কিন্তু বিপ্লবের লক্ষ্য ও তার সুদূর-প্রসারী উজ্জ্বল মানব জীবনাদর্শ এবং তার আনুসঙ্গিক গণমুক্তির কর্মপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিশোর বয়সে স্বাদেশিকতায় রঙীন আলোকে যে-স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম দীর্ঘ সংগ্রাম পথের সাধনায় সে-স্বাধীনতার বৃহত্তর ব্যাপকতর স্পষ্ট সংজ্ঞা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গণ-মুক্তি বিপ্লবের মহান উচ্চ আদর্শ আমাদের বিপ্লব-চিন্তাকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত করে তুলেছে।

সমগ্র গণমানবের মুক্তির উচ্চতর বিপ্লবের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। পেটি বুর্জোয়া ভাবালুতায় আচ্ছন্ন মধ্যবিত্তদের বিপ্লব চিন্তা থেকে দুর্গত শোষিত সর্বহারা গণ-সমষ্টির বিপ্লব-চেতনা আমাদের অন্তরকে সমুজ্জ্বল করেছে। পৃথিবীর সকল দেশের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সর্বহারাদের সহযোগিতায় আমরাও এগিয়ে যাব জনগণতন্ত্রের মহান উচ্চতর বিপ্লবী সংগ্রাম সাধনায়। সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক শক্তি নির্মূল হয়ে সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিজয়ী হবে। বিংশ শতাব্দীর রুশ ও চীন বিপ্লব আদর্শের ও বিপ্লব চিন্তার আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে দুঃস্থ শোষিত বিশ্বজনের কাছে। বিপ্লবের এমন অপরূপ রূপ, এমন সুদূরপ্রসারী ব্যাপক লক্ষ্য পূর্বে আর লক্ষিত হয় নাই। হাজার হাজার বছরের শোষক ও শোষিত মানুষের বৈষম্য ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব অবসান হয়ে এক সাম্য, স্বাধীনতা ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার চেতনা ও জয়যাত্রায় পথের রেখা উন্মুক্ত হয়ে গেছে আমাদের কাছে—পৃথিবীর মানব জাতির কাছে। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের সঙ্কীর্ণ স্তর থেকে উন্নত স্তরের সর্বমানবস্পর্শী বিপ্লব আজ কাম্য ও করণীয়।

দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন আন্দামান দ্বীপের অন্ধকার কারাকক্ষে বিপ্লবের নতুন আলো আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়; জেলে বসেই আমরা বিপ্লবের নতুন আলোকে মুক্তিপথের নতুন রেখার ছক কেটে নিই। ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারের ভয়ে বাংলার সশস্ত্র বিদ্রোহীরা পুরানো পথ ছেড়ে নতুন সংগ্রাম পথে যায় নাই, গান্ধীর অহিংস আন্দোলনও তাদের দুর্বল করতে পারে নাই, বিপ্লবের নতুন আলোক রেখাই আমাদের পথ চলার দৃষ্টি সম্প্রসারিত করেছে, বিপ্লবী

সংগ্রামের সফলতা লাভের পথে আমাদের সকল মানসিকতা জাগিয়ে দিয়েছে। মধ্যবিত্তদের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে সর্বহারা মেহনতী জনগণের বিপ্লবী কমিউনিজম মুক্তিপথে বিংশ শতাব্দীর নতুন অবদান।

অনেক সঙ্কট এড়িয়ে অনেক বাধা অতিক্রম করে এ লক্ষ্যে পৌছানো গেছে। আন্দোলনের প্রথম যুগে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের চিন্তা, চেতনা ও সংস্কার আচ্ছন্ন ছিল। শহরের শিক্ষিতদের অনেকে বিলাতী শিক্ষা সভ্যতা ও কালচারের মোহে মুগ্ধ থাকায় ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীর অনুগত ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ও অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহ তাদের কোন কোন অংশের সমর্থন ছিল না। ভয়-ভীতি শিক্ষিতদের ইংরাজ তোষণের দিকে নিয়ে যায়। বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বাংলার রাজা-জমিদারদের, কিংবা পরবর্তী বুর্জোয়া মালিকদের কারো কোন আকর্ষণ ছিল না। বরং এদের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দোলন ওরা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করতো। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনেও ধনী রাজনৈতিক নেতারা সশস্ত্র সংগ্রামীদের ঘৃণাসূচক প্রস্তাব নিতেন প্রতিবৎসর আর সাধারণ দেশবাসী ইংরাজ অত্যাচারে ভীত হয়ে কালযাপন করত এমনই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের জীবন আরম্ভ। রক্তাক্ত সংগ্রামের অনলে পুড়ে পুড়ে বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা প্রথমে বাংলায় পরে সারা ভারতে জাতীয় স্বাধীনতায় উদ্দীপনায় জোগায়। আমার বইয়ে অতি সংক্ষেপে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

এ বই লেখার জন্য অনেক বন্ধু আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। উদীয়মান তরুণ কবি শ্যামসুন্দর দে সক্রিয় সাহায্য দিয়ে আমার বই প্রকাশ সম্ভব ও সার্থক করেছেন। আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

এ বইয়েরই প্রথম সংস্করণে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভূমিকা লিখে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। সেই ভূমিকাটিও এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।

১লা বৈশাখ, ১৩৬৭ — সতীশ পাকড়াশী

১৯০৫-০৬ সালের কথা। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল হয়ে উঠেছে সে-আন্দোলন। ঢাকা জেলার একটি গ্রাম্য হাইস্কুলের ছাত্রদের প্রাণেও তার ঢেউ-এর দোলা এসে লেগেছে। ১২-১৩ বছরের একটি ছেলেও তাতে মেতে উঠেছে। সে বড়দের ফাইফরমাস খাটে, ভলান্টিয়ারী ক'রে বেড়ায়। এর বেশী কী-ই বা আর সে করতে পারে ?

প্রকাশ্য আন্দোলনের দ্বারা ব্রিটিশ সরকারকে নোয়াতে না পারার ফলে যুবকদের প্রাণে যে-হতাশা এলো তা কাটিয়ে ওঠার জন্যে কলকাতায় গঠিত হলো গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান—অনুশীলন সমিতি। এবারে শুধু বঙ্গভঙ্গের রদ তারা চায় না, ভারতের স্বাধীনতাও কাম্য। তেমন কোনো প্রোগ্রামও তাদের নেই, জনগণের সঙ্গেও নেই কোনো যোগাযোগ, তবুও ভদ্রঘরের ছেলেরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে—তারা মারবে ও মরবে।

ঢাকাতেও অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হলো। আমাদের সেই ১২-১৩ বছরের ছেলেটিও যোগ দিল এই সমিতিতে। তারপরে, তাঁর বয়স কিছু বাড়ল, কাজের ভিতর দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন অনুশীলন সমিতির নেতাদের একজন। বাংলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে আজ তিনি—আমাদের শ্রদ্ধেয় কমরেড সতীশ পাকড়াশী—সুপরিচিত। ১৯০৫-৬ সালে তিনি কাজে নেমেছিলেন, আর আজ হচ্ছে ১৯৪৭ সাল। এই সুদীর্ঘ সময়ের ভিতরে এক দিনের জন্যেও তিনি নিজের বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্র থেকে স'রে দাঁড়াননি। রিভলভার নিয়ে ধরা প'ড়ে তিনি জেল খেটেছেন সেই যুগে যে-যুগে কয়েদীদের গলায় লোহার হাঁসুলি, আর পায়ে লোহার মত মল পরতে হ'ত।

বছরের পর বছর তাঁকে গা-ঢাকা দিয়ে কাজ করতে হয়েছে, ১৮১৮ সালের ও নম্বর রেগুলেশন অনুসারে নজরবন্দী হয়েও তাঁকে কাটাতে হয়েছে কয়েকবছর। ছাড়া পাওয়ার পরে আবার নজরবন্দী হয়েছেন, মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় সাজা নিয়ে গিয়েছেন আন্দামানে, আবারও হয়েছেন নজরবন্দী। এইভাবে তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে রাজ-লাঞ্ছনার ঝড়ের পর ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু কোনো কিছুই দমাতে পারেনি তাঁকে, অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করা জায়গায়। তাঁকে দেখলে কিংবা তাঁর সাধারণ কথাবার্তা থেকে নতুন পরিচিতেরা বুঝতেই পারেন না যে, চল্লিশ বছরেরও বেশী কাল ধ'রে তিনি বৈপ্লবিক কর্ম-সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে রেখেছেন। সাদাসিদে অল্পভাষী লোক তিনি।

'অগ্নিদিনের কথা' কমরেড সতীশ পাকড়াশীর 'স্মৃতি-কথা'। অনাড়ম্বর

ভাষায় তিনি তাঁর সন্ত্রাসবাদী জীবনের কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্মৃতি মানুষকে অনেক সময়ে প্রতারণা ক'রে থাকে। সেই দিক থেকে কোনো কোনো ঘটনার বিবৃতিতে সামান্য কিছু ভুল থাকা অসম্ভব নয়। তা সত্বেও এই পুস্তকখানা কেবলমাত্র কমরেড পাকড়াশীর স্মৃতি কথাই নয়, এ-খানা আমাদের দেশের রাজনীতিক সংগ্রামের একটি যুগের একটা দিকের ইতিহাসও বটে। সন্ত্রাসবাদী বাংলার অনেক খ্যাতনামা বিপ্লবী কর্মীদের মতো কমরেড সতীশ পাকড়াশীও কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছেন। বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌঁছেও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মঠ সভ্য। দীর্ঘ জীবনের রাজনীতিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি বুঝেছেন যে, জনগণকে বাদ দিয়ে বিপ্লব হয় না এবং কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের একমাত্র বিপ্লবী পার্টি।

অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়েও কি ক'রে কাজে লেগে থাকতে হয় তা আমরা কমরেড পাকড়াশীর জীবন থেকে শিখতে পারি। এইজন্যেও রাজনীতিক কর্মীদের এই পুস্তকখানা পড়া উচিত।

কলিকাতা
৩রা এপ্রিল, ১৯৪৭

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে

তখন বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের বিপুল আলোড়ন চলছে। লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে চারিদিকে প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রবল উদ্দীপনা। ১৯৬ সালে আন্দোলন সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। আমি পাড়াগেঁয়ে স্কুলের ছাত্র। বয়স খুব কম। মনে পড়ে সেখানেও জোয়ার চলেছে সভা-সমিতি বক্তৃতা ও শোভাযাত্রার। জাতীয় আন্দোলনের বিপুল উচ্ছ্বাসের মাঝে খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেলাম। শোভাযাত্রায় সমবেত গান ও জাতীয় ধ্বনি করতে করতে মিটিংয়ে যাওয়া, ভলান্টিয়ার হওয়া, দোকানে দোকানে বিলাতী জিনিস বিক্রির বিরুদ্ধে পিকেটিং করা, 'রাখী-বন্ধন,' ইত্যাদিতে খুব স্ফূর্তি পেতে লাগলাম। মেলায় জলসত্র খুলে লোকজনকে জলপান করানো, ব্রহ্মপুত্র স্নানে যাত্রীদের সাহায্য, রোগীর সেবা, মৃতের সৎকার—দলবদ্ধ ভলান্টিয়ার সেজে এ সব কাজে বেশ আনন্দ ছিল।

পুলিসের অপেক্ষা আমাদের শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা লোকে বেশী প্রশংসা করত। কিন্তু নিয়মিত পড়াশুনা হয় না, রাত্রিতে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায় বলে অভিভাবক তিরস্কার করেন; বলেন—'পড়াশুনা নাই, স্বদেশীতে পেট ভরবে?' চুপ করে থাকি, তারপরেও বাড়ি ফিরতে রাত্রি হয়, ভয়ে ভয়ে বাড়ি ঢুকি। অভিভাবকগণ আমার সামনেই আলোচনা করেন,—স্কুলের ছেলেগুলোর সাহসের প্রশংসা করতে হয়, পুলিসের ধমকে একটুও ঘাবড়ায় না। প্রসেশন তো না করে ছাড়লেই না। সতীশও ছিল এই ছাত্রদলের শোভাযাত্রায়। পুলিসের সামনে সে-ই উচু গলায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে লাগল, পুলিসগুলো তার দিকে কট-মটিয়ে চাইল, কিন্তু কিছু করল না।

শুনে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠল।

একদিন আমাদের স্কুলেই এক সভার আয়োজন হল। ভদ্রলোকের সভা, আমরা নেতাদের নির্দেশ মতো রাস্তা থেকে কৃষকদের ডেকে এনে টুলে বসালাম। তাদের হাতে কাস্তে, পরনে নেংটি। বেশ মনে পড়ছে তাদের একটা অসোয়াস্তি-বোধ করা ভাব। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য এই সব মুসলমান কৃষকদের সভায় ডেকে এনে আদর করে বসানো হয়েছিল। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান মিলে বাঙালী একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি। এই বাংলা দেশ বিভাগ করা চলবে না, ইত্যাদি।

ভলান্টিয়ার দলভুক্ত হয়ে পরের দিন 'চিনিসপুর' কালী বাড়িতে সভায় গেলাম। শত শত লোক এক সঙ্গে সভায় দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম—বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া অবধি আমরা প্রতিরোধ আন্দোলন করে যাবো, জীবন দিয়েও এর প্রতিবিধান করব। বিলাতী জিনিস বয়কট আর স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাও নেওয়া হল।

তখন কিন্তু জমিদার, তালুকদার, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরা সকলেই এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম একত্র হলে জমিদারদের অধিকার ক্ষুন্ন হবে আশঙ্কায় তারা আন্দোলনে যোগ দেন। আমিও ছাত্রদের সঙ্গে ওই আন্দোলনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম। পরাধীনতার গ্লানি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। সে ১৯০৫-০৬ সালের কথা। বিশিষ্ট যুবক কর্মীরা ঢাকা শহর থেকে এসে জানালেন, পুলিন বাবুর সঙ্গে কলকাতা থেকে পি. মিত্র এসেছেন। পি মিত্র ব্যারিস্টার, স্বদেশী সংগ্রামে বাংলার যুবকদের প্রধান নেতা, এবং বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। পুলিন দাস পূর্ববঙ্গ অনুশীলনী সমিতির অধিনায়ক ও পরিচালক। পি. মিত্র বলেন—বিলাতী লবণ বা চিনির পিকেটিং করে কি হবে? তা দিয়ে স্বাধীনতা হবে? রাষ্ট্র বিপ্লব হবে? লাঠি খেলা, বন্দুক, তরোয়াল চালনা শেখ, কুচকাওয়াজ শেখ, সমিতি গঠন কর। শুনে মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠল। সাটীরপাড়া গ্রামে 'অনুশীলন সমিতি' গঠিত হয়েছিল। লাঠিখেলা, ড্রিল, কুচকাওয়াজ ইত্যাদিতে স্কুলের ছাত্ররা ও যুবকগণ মেতে উঠেছিল। আমিও অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিলাম। সকলের প্রিয় ছাত্র নেতারা এক নিভৃত কক্ষে নিয়ে গিয়ে আমাকে সমিতির 'আদ্য প্রতিজ্ঞা' পড়ালেন। আমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে উৎসাহের সহিত সমিতির সভ্য হলেম। 'সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না। সর্বদা সমিতির পরিচালকের আদেশ মানিয়া চলিব। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই সমিতির উদ্দেশ্য।' ইত্যাদি বহু দফা প্রতিজ্ঞা যা ওই পত্রে আছে তা সবই স্বীকার করে নিলাম। আমাদের স্কুলের প্রায় অর্ধেক ছাত্র অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়ে গেল। শিক্ষকগণও এর অনুকূলে ছিলেন। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। স্কুলের উপরের ক্লাসের ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও অন্য দু'তিনজন ছাত্রদের নেতা। নেতাদের আমি শ্রদ্ধা করতাম খুবই এবং তাঁদের নির্দেশ আনন্দে পালন করতাম। মন্ত্রগুপ্তির দিকে এ-সময় আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, সমিতির গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করা যায় না; শত্রুর চর আছে সর্বত্র সুতরাং কথাবার্তায়

সংযত হতে হবে। এই মন্ত্রগুপ্তির শিক্ষা পেলাম। লাঠি খেলার সাংকেতিক 'ফরমূলা' (সঙ্কেত শব্দ) অতি সংগোপনে নোটবইয়ে লিখে রাখতাম এবং স্কুলের ছুটির ঘণ্টায় সেগুলো মুখস্ত করতাম। অন্যান্য ছাত্র সভ্যগণও তাই করতেন। আমরা জানতাম লাঠিটা আসলে লাঠি নয়—তরোয়াল আর বড় লাঠি হলো বন্দুক ও বেয়নেট। তরোয়াল ও বন্দুকের লড়াই শেখার উদ্দেশ্যেই আইন বজায় রেখে লাঠি ও ছুরি খেলা সামরিক প্যারেড-এর প্রবর্তন করা হয়।

কিন্তু তা কারুর কাছে প্রকাশ করা নিষেধ ছিল। জঙ্গলাকীর্ণ আম-কাঁঠাল ও বাঁশবনের মাঝখানে ছিল আমাদের অনুশীলন সমিতির লাঠি খেলা ও কুচকাওয়াজের ফাঁকা জায়গা। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা ওখানে জমায়েত হতাম। মনে হত, আমরা যেন আনন্দমঠের সন্তান দল,—পরাধীনা ভারত জননীর শৃঙ্খল মোচনকল্পে স্বাধীনতার সংগ্রামে সাধনারত।

সত্যি, লাঠিচালনায়, ড্রিল প্যারেড শিক্ষায় যুবকদের সাহস, উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ঢাকায় কেন্দ্রীয় সমিতি মাঝে মাঝে বিভিন্ন জেলার বীর যুবকদের ডেকে কৃত্রিম যুদ্ধের (মক ফাইট) মহড়া দিত। তাতে অনেকে আহতও হতো। সারা পূর্ব বাংলায় এরূপ সংগ্রামী যুব আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে।

কলকাতা থেকে নব যুগের অগ্নিময়ী বাণী নিয়ে এল 'যুগান্তর' পত্রিকা। বিপ্লবী যুবকগণ যুগান্তর কাগজ পরিচালনা করতেন। আমাদের স্কুলে ছাত্রনেতারা সপ্তাহে সপ্তাহে 'যুগান্তর' বিক্রি করতেন লোকের মনে বিপ্লবী কর্মোদ্দীপনা জাগানোর জন্য। আমি মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটি কাগজ পড়ে ফাইল করে রাখতাম।

ওগুলিতে লেখা হত মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়যুদ্ধ করার উপদেশ, কর্মযোগের কথা, চণ্ডীর সুর-অসুর যুদ্ধের কথা, শিখ, রাজপুত ও মারাঠাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অপূর্ব বীরত্ব-কৌশলের কথা এবং ইতালির মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির গুপ্ত সমিতি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্দীপনাময়ী কথা! শিবাজীর গেরিলা যুদ্ধের কাহিনীও বর্ণনা করে গেরিলা যুদ্ধ কৌশলের দিকে যুবচিত্ত আকৃষ্ট করা হত।

গৌরবমণ্ডিত ভারতের বর্তমান দাসত্বের সঙ্গে উক্ত বিষয়-সমূহের এমন উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় তুলনা করা হত যে আমাদের সকল চিত্ত-মন মথিত হয়ে উঠত সংগ্রামের উদ্দীপনায়, রোমান্টিক কল্পনার আবেগে। 'যুগান্তর' পত্রিকা ও

বিপ্লবী বই পড়া, লাঠি খেলা ও কুচকাওয়াজ শিক্ষা, ভলান্টিয়ার সেজে শোভাযাত্রা করে সভায় যাওয়া আর দলের নির্দেশে কাজ করা এই ছিল আমাদের ছাত্রদের কাজ। এইসব কাজে আমরা খুব উৎসাহ পেতাম। 'বিপ্লব' বা 'রেভলিউশন' এর কল্পনাতেই অদ্ভুত প্রেরণা জাগাত মনে।

যেখানে দু চারজন একত্রে বসে স্বদেশী ও স্বরাজ বিষয়ে আলোচনা করতেন আমি আগ্রহ ভরে সেখানে বসে কথাবার্তা শুনতাম। বাড়ির অভিভাবক, গ্রামের ভদ্রলোকেরা এবং স্কুলের শিক্ষকগণ কেউই স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। কিন্তু তবু আমরা বেশী মেতে উঠি এটা কেউই পছন্দ করতেন না। তার জন্যে বাবার কাছে ও অন্যান্য গুরুজনদের কাছে আমাকে অনেক গালাগালি শুনতে হত। তাঁরা পড়াশুনায় বেশী করে মন দিতে বলতেন, পুলিসের চোখে পড়ার ভয়ও করতেন। সর্বত্রই দু'চারজন লোক আমাদের আন্দোলনের বিরোধীও ছিলেন। তাদের বলা হত সরকারের 'খয়ের খাঁ'।

১৯০৭ সালের শেষভাগে গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট 'এলেন' সাহেবকে গুলি করার সংবাদ পেয়ে গ্রামের যুবকগণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। আমার মনেও আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হল। শত শত যাত্রীর ভীড়ের মধ্যে এমন দুঃসাহসিক কাজ করে যে যুবকগণ রিভলভার হাতে নির্বিঘ্নে সরে পড়ল কে তারা? কি তাদের শক্তি?

রুশ-জাপান যুদ্ধে দুর্ধর্ষ পাশ্চাত্য জারের পরাজয় এবং প্রাচ্য জাপানের বিজয়ে বাঙালীরা গর্ববোধ করেছিল। ইহা ছিল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়ার প্রথম জয়। জাপানীদের ত্যাগ, সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের অনেক চমকপ্রদ গল্প আমাদের স্বদেশী সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল। এ যুদ্ধের কাহিনী পড়ে ও শুনে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উৎসাহ আমাদের অনেক বেড়ে যায়। জাপান থেকে যেমন বিদ্রোহের উদ্দীপনা আসে, রুশের ১৯০৫ সালের বিপ্লবী সংগ্রামও তেমন আশার সঞ্চার করে। স্বদেশে মহারাষ্ট্রের সংগ্রাম থেকেও নবজীবনের প্রেরণা আসে। শিবাজীর দেশের লোক বলে মহারাষ্ট্রীয়দের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, মহারাষ্ট্রের নেতা তিলক সদলবলে কলকাতায় শিবাজী উৎসবে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ তেজোদ্দীপ্ত উদ্দীপনাময় ভাষায় 'শিবাজী উৎসব' কবিতা লিখে যুবক হৃদয়ে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলেন। প্রবল শক্তিমান ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মাওলীসেনা নিয়ে শিবাজীর গেরিলা যুদ্ধ ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়ায়ের উপাদান রূপে আমরা নূতন করে পেলাম। বাংলার

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেই মহারাষ্ট্রীয় যুবকগণ প্লেগ রোগ নিরাষণী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংরাজ রাজ-কর্মচারী হত্যা করেছেন ও ফাঁসিতে জীবন দিয়েছেন।* মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙলার বিপ্লবী মৈত্রী-বন্ধন স্থাপিত হয় এরই জন্যে। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী নেতা সাভারকার লণ্ডনে বসে 'ভারতে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ' বই লিখে ইংরাজের লেখা সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত করেন। এ বই পড়ে আমাদের রোমাঞ্চ হত। রুশিয়ার সন্ত্রাসবাদী নিহিলিস্ট আন্দোলনের অনুসরণ করার পরামর্শ আসে জাপানী প্রফেসর ওকাকুরার কাছ থেকে। লণ্ডন ও ফ্রান্সের ভারতীয়েরাও খবর পাঠাতেন, ইংরেজের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে ঐ পন্থাই গ্রহণ করুন। গোপনে গোপনে এ সকল কথা নানা স্থানে যুবকদের কাছে পৌঁছে যেত। বাংলার উদ্ভিন্ন যৌবন তখন বিপ্লবের পথে আত্মপ্রকাশের আকুলতায় অস্থির। 'যুগ যুগ সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।' সমাজের প্রগতিশীল অংশ ইস্পাতের মতো শক্ত সুদৃঢ় বিপ্লবের রক্তাক্ত পথের স্বপ্নে বিভোর, অপর অংশের কাছে নরম সংস্কারের পথই শ্রেয়। এ দুয়ের দ্বন্দ্বের মাঝে চলে অগ্রগতি পথের সংগ্রাম।

*১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে পুনায় মহামারীতে যখন মানুষ মরছিল সরকার তখন প্লেগ নিবারক আইন করে র্যাণ্ড নামক এক উচ্চ রাজকর্মচারীর উপর যথেচ্ছভাবে প্লেগ নিবারণের ভার দেয়। তিনি বাড়িতে বাড়িতে প্লেগ রুগীর খোঁজে অত্যাচার আরম্ভ করেন। রুগী ও রুগীর বাড়ির সকলকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করেন এবং বাড়ির সব কিছু পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। রোগ হয়েছে সন্দেহে প্লেগ-নিরোধী-বাহিনীর সৈন্যরা সর্বত্র অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করে। মেয়েদেরও লাঞ্ছিত করে। তখন লোকের মনে ত্রাস উপস্থিত হয়। রোগের চেয়ে রোগের প্রতিকার বেশী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। শহরবাসীরা প্লেগ কমিশনার র্যাণ্ড সাহেবের নিকট অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করেন কিন্তু সাহেব তাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। তখন পুনা যুবসঙ্ঘের নেতা চাপেকার ও তার ভাই র্যাণ্ড ও তাহার সহকারী আয়স্ট অত্যাচারী অফিসারদের গুলি করে হত্যা করেন। যুবক দুটি ফাঁসিতে জীবন দিয়া মহারাষ্ট্রে জাতীয় বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলেন।

বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

১৯০৫ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'রাণা প্রতাপসিংহ' অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। গভর্নমেন্ট কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তরবারি স্পর্শ করে রাণা প্রতাপসিংহ আর রাজপুত সর্দাররা দেশ উদ্ধারের জন্য পবিত্র শপথ গ্রহণ করছেন—'আমরা চিতোরের জন্য প্রাণ দিব প্রয়োজন হলে'। দেশ উদ্ধারের জন্য দীক্ষাগ্রহণ কালে বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মানসে ভেসে উঠেছিল রাণা প্রতাপের নাটকের কথা। বারীন ঘোষ প্রমুখ অগ্নিযুগের নেতারা মুরারীপুকুর বাগান বাড়িতে ভবানী মন্দিরে এক হাতে গীতা ও অপর হাতে তরবারি নিয়ে ভারত উদ্ধারের পবিত্র শপথ এবং মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প গ্রহণ করেন। তার কিছু পরেই ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ভারত সরকার বঙ্গদেশ বিভাগ করার ব্যবস্থা করেন। বাঙালী এ-ব্যবস্থা মেনে নিল না। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সারা বাংলা। সভা শোভাযাত্রায় পরস্পরের হাতে মিলনের রাখীবন্ধন হল ঐদিন।

১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেসে গোখলে বলেন, 'বাংলা আজ যা চিন্তা করে ভারত আগামী কাল তা গ্রহণ করে'। ১৯০৬ সালে কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী 'স্বরাজ' ঘোষণা করেন। বাংলা ও বোম্বাইয়ের গরম দলের নেতারা কলকাতায় সমবেত হয়ে ভারতে জাতীয়তাবাদ উদ্বোধনের সংকল্প নেন; বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে বিপ্লবী যুবকগণ কলকাতায় গোপনে মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ও সংগ্রামের কথা আলোচনা করেন। পি. মিত্র, বারীন ঘোষ ও অন্যান্য যুব নেতাদের নেতৃত্বে এক গোপন বৈঠক হয়।

১৯০৭ সালে বাংলায় অনুশীলন সমিতি এবং মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম আরম্ভ হয়।

বিদ্রোহাত্মক পত্রিকা, পুস্তিকা, বক্তৃতা, গান ও সাহিত্যের প্রাচুর্য, গুপ্ত সমিতির কর্মীদের আখড়া বা ক্লাবের কর্মোদ্যোগ, পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির পাঁচশ' শাখার ইংরাজ শাসন-বিরোধী আন্দোলন, স্কুল-কলেজে ছাত্রদের 'আইন শৃঙ্খলা-বিরোধী' কাজ ও 'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা দিল।

১৯০৭ সালের শেষভাগে বাংলার লেফটানান্ট গভর্নর ফ্রেজার-কে মেদিনীপুর যাওয়ার পথে বোমা দিয়ে ট্রেন উড়িয়ে হত্যার চেষ্টা হয়। বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ট্রেনের কামরা লাইনচ্যুত হয় কিন্তু ছোটলাট সাহেব বেঁচে যান। এই

ঘটনা এবং ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করা, চন্দননগরের ফরাসী মেয়রের জীবননাশের আয়োজন, ইংরাজদের মনে ভীতির সঞ্চার করে।

কংগ্রেসে নরম গরম দলের বিরোধে ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে যায়। বিদেশী শাসন-বিরোধী জাতীয় নেতৃবর্গ—তিলক, লাজপত রায়, বিপিন পাল—কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন; শাসন সংস্কারপন্থী নরম দলের নেতারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দখল করেন।

নরম ও গরম দলের বিরোধে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে যাবার পর সরকার কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। সরকারী নিষ্পেষণে ও নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ১৯০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে ভাটা পড়ল। প্রকাশ্য আন্দোলন দমে গেল কিন্তু গুপ্ত সমিতির বীরোচিত কার্যকলাপ এক নূতন আন্দোলন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করল।

১৯০৮ সালে এপ্রিল মাসে মজঃফরপুর জেলা জজ কিংস ফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষিপ্ত হলে জজ সাহেবের পরিবর্তে দুজন মেমসাহেব নিহত হন।

এই কিংসফোর্ড সাহেব কলকাতায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে স্বদেশী আন্দোলনকারীদের উৎপীড়ন করে কুখ্যাত হয়েছিলেন। জনসাধারণের বিরাগভাজন হওয়ায় তাকে বদলী করা হয় মজঃফরপুর জেলায়। কলকাতা হতে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল কুমার চাকী তার উপর বোমা নিক্ষেপ করতে যায়। পরে ধরা পড়ে কিশোর বয়স্ক ক্ষুদিরাম ফাঁসীতে জীবন দান করেন। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মদান বাংলার পল্লীগীতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করা'র পূর্বক্ষণে পর পর তিনটি রিভলবারের গুলি নিজের দেহে ছুঁড়ে আত্মহত্যা করে শত্রুর স্পর্শ থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেন। প্রফুল্ল নিজ হাতে নিজেকে তিন তিনবার গুলি ছোঁড়ায় অমিতশক্তিতে 'পাইওনীয়ার' পত্রিকার ইংরাজ সম্পাদক তার প্রশংসা করেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর হাজার হাজার ফটো জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

মজঃফরপুরের বোমার আওয়াজে সমস্ত ভারত প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ইংরেজ ভীতি কমে যায়। দেশের সুপ্তোত্থিত মানুষ আচম্বিতে দেখল যেন পরাধীনতার অন্ধকার ভেদ করে স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রভাতী আলো বেরিয়ে আসছে। মহারাষ্ট্রের জাতীয় নেতা তিলক ক্ষুদিরামের বোমার সমর্থন-সূচক প্রবন্ধ লেখেন 'কেশরী' পত্রিকায়—সরকারী শাসন নীতির দোষে বোমা ফাটে। রাশিয়াতেও একই কারণে বোমা ফাটে। এই ছিল তিলকের লেখার সারমর্ম। এরই জন্যে

তিলককে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে মান্দালয়ে নির্বাসন দেওয়া হল। এ-অপরাধে মাদ্রাজে ও অন্ধ্রেও নেতারা গ্রেপ্তার হন। জননেতা তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাই-এর সুতাকল শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘট হয়।

রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করে তারা সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিরোধ করে এক নূতন যুগের সূচনা করেন। ভারতের শ্রমিকদের এটাই প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম। লেনিন এই ধর্মঘটকে ভারতে নবযুগের সূচনা বলে অভিনন্দিত করেন।

প্রফুল্ল চাকীকে যে পুলিস কর্মচারী ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে ইন্‌স্পেক্টার পদে উন্নীত হয়েছিলেন, সেই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার পথে গুলিতে নিহত হয়। স্বভাবতই দেশের লোক এতে খুশি হয়।

মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ, প্রফুল্লর আত্মহত্যা, ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও ফাঁসির পর পুলিস কলিকাতায় অরবিন্দ ঘোষের মানিকতলা, বাগান বাড়িতে তল্লাসী চালায়—এখানে বোমা, ডিনামাইট, কার্তুজ, বন্দুক, রিভলবার এবং বিপ্লবীদলের বহু চিঠি-পত্র পুলিস হস্তগত করে। কলকাতা ও অন্যান্য জেলায় বহু বিপ্লবী যুবকের বাড়ি তল্লাস হয়। মানিকতলার বাগান বাড়িতে বোমা তৈরির সরঞ্জাম সহ অরবিন্দের ভাই বারীন ঘোষ ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস প্রমুখ যুবকগণ ধরা পড়েন। অরবিন্দ ঘোষও গ্রেপ্তার হন। বোমা ও অস্ত্রের কারখানা ধরা পড়ার ও শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকদের গ্রেপ্তারের খবর অতিরঞ্জিত হয়ে এসে বাংলা দেশের ছাত্র ও তরুণ মনে বীরত্বপনার রোমান্স জাগিয়ে দিল। আমারও উৎসাহ আর ধরে না। নব জাতীয়তার আবেগভরা উদ্দীপনা কোনো কিছুর বাঁধ মানে না। ইংরাজ সরকার যত উৎপীড়ন অত্যাচারের ভীতি প্রদর্শন করে, তত পরাধীন মানুষ নির্ভীক হয়ে ওঠে সংগ্রাম পথে। কবির ভাষায় বলা যায় 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই'।

১৯০৮ সালে চল্লিশ জন বিপ্লবী নেতা ও কর্মীর নামে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগের ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' স্বাধীনতা সংগ্রামের মামলা হিসাবে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে। নরেন গোঁসাই এ-মোকদ্দমায় দলের অনেক গোপন কথা পুলিসের নিকট প্রকাশ করে দেয়। এ-মামলার আসামী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য জেলের ভিতর সুকৌশলে পিস্তল সংগ্রহ করেন। আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলের হাসপাতালে তাদের উভয়ের গুলিতে নরেন গোঁসাই প্রাণ হারায়। নরেনকে হত্যা করার পরই দুঃসাহসী বীর যুবকদ্বয়কে

জেল সিপাহীরা ডিগ্রী বন্ধ করে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের ফাঁসির হুকুম হয়। চন্দননগরের বীর বিপ্লবী কানাইলাল হাসিমুখে ফাঁসিতে যান। কানাইলাল সচ্চরিত্র শিক্ষিত ছেলে বলে সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসা পেতেন। সহস্র সহস্র লোক শোভাযাত্রা করে তার শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যায়। তার পবিত্র চিতাভস্ম নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি হয়। একটা অপরাধীকে এত বড়ো বীরের সম্মান দিতে দেখে ইংরাজ রাজ কর্মচারীরা উদ্বেগ বোধ করে। সত্যেন বসুর মৃতদেহ দাহ করার জন্য আর বাইরে দেওয়া হল না। কিন্তু তাদের উভয়ের এবং ক্ষুদিরামের হাজার হাজার ছবি বাঙালীর ঘরে ঘরে শোভা বর্ধন করে। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি-বিধানের সৎসাহস দেখিয়ে কানাই ও সত্যেন দেশের সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করেন। মৃত্যু অবধারিত জেনেও তারা এ-কাজ করেন। তাদের এই অপূর্ব সাহস ও বীরত্ব আমাদের তরুণ চিত্তে গভীর দাগ কেটেছিল, দেশের জন্য তাদের আত্মত্যাগ মরণভীতু জাতিকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

ঐ সময় দারুণ সরকারী নিষ্পেষণ আরম্ভ হল। পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় 'পিউনিটিভ' পুলিস বসিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীদের মনে ভয়ের উদ্রেক করে। ধর-পাকড় খানাতল্লাস, যুবকদের নামে নানা অছিলায় মামলা দায়ের করা, স্কুল কলেজে ক্লাবে পাঠাগারে পুলিসের উৎপাত দিকে দিকে চলতে লাগল। অনুশীলন সমিতি ও অন্যান্য সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হল। বাংলার ৯ জন প্রখ্যাত নেতাকে কারাগারে আটক করা হয় তার মধ্যে অনুশীলন সমিতির প্রধান নেতা পুলিন দাসও ছিলেন। জাতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিপিনচন্দ্র পাল দুইমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিখ্যাত নেতা অরবিন্দ ঘোষ তো মানিকতলা বোমার মামলায় হাজতেই বাস করছিলেন। সভা-সমিতি বন্ধ করে দেওয়া হল। সরকার রাজনৈতিক আন্দোলনের সকল প্রকার প্রকাশ্য পথ বন্ধ করে দিলেন। ফলে গোপনে গোপনে বিপ্লববাদ প্রসারিত হতে থাকে সারা বাংলায়—বিশেষ করে পূর্ববাংলায়।

আলিপুর বোমার ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় ও পরে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ও দুঃসাহসিক রাজনৈতিক ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা ইত্যাদি চলতে থাকায় সরকারী লোকদের মনে বিভীষিকা সঞ্চার হয় ও শাসকগোষ্ঠী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার' সরকারী উকিল হিউম সাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টা হয় কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই মামলার অন্যতম উকিল আশুতোষ বিশ্বাস

কানাই লাল ও সত্যেন বসুর মামলাও পরিচালনা করে কুখ্যাত হয়েছিলেন। চারু বসু নামক বিপ্লবী যুবকের গুলিতে আশু বিশ্বাস নিহত হয়। তাকে গ্রেপ্তার করে পরে ফাঁসি দেওয়া হয় (১৯০৯ ফেব্রুয়ারী)।

কুমিল্লা শহরে একটি মাল গুদাম হতে বিপ্লবীরা ৩টি রাইফেল নিয়ে উধাও হয়; ঢাকা জেলার রাজেন্দ্রপুর স্টেশনে এক দুঃসাহসিক ট্রেন ডাকাতি করে বিপ্লবীরা ২৩ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। চলতিগাড়ি হতে টাকার থলেগুলি ছুঁড়ে ফেলে রিভলবার হাতে যুবকগণ লাফিয়ে পড়েন। পুলিশ কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করে। তারা বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ঢাকা বিপ্লবী সমিতির অর্থ সংগ্রহ অভিযানে একদল যুবক রাইফেল, রিভলবার ও অন্যান্য অস্ত্র সহ মদনগঞ্জের অন্তর্গত 'বাড়ড়া' গ্রামের এক কুখ্যাত ধনীর বাড়িতে ডাকাতি করে। তারা যখন সিন্দুকের অর্থ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করতে থাকে, তখন চারদিক থেকে গ্রামবাসীরা এসে তাদের বাধা দেয়। বিপ্লবীরা ২৬ হাজার টাকা ও অলঙ্কার নিয়ে গুলিবর্ষণ করতে করতে নৌকায় চলে যায়। গুলিবর্ষণে গ্রামের চৌকিদার নিহত হয়, ধনীর বাড়ির অনুগত লোকদের বল্লমের আঘাতে কয়েকজন বিপ্লবীও আহত হয়।

সকাল হয়ে গেলে পুলিশ ও গ্রামের লোক একত্রে বিপ্লবীদের নৌকার পিছনে ছুটতে থাকে এবং দুইপক্ষে গুলি বিনিময় চলতে থাকে। এর ফলে উভয়পক্ষেই কিছু হতাহত হয়, একজন বিপ্লবী যুবক পুলিসের গুলিতে নিহত হয়। কিন্তু বিপ্লবীদের নৌকা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরেও আবার খালের দু-দিক থেকে বহুলোক বিপ্লবীদের নৌকা আটকাবার চেষ্টা করে কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করে অস্ত্র ও লুণ্ঠিত অর্থ সহ বিপ্লবীরা ঢাকা চলে যায়। আর তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। স্বদেশী ডাকাতির এই চমকপ্রদ সাফল্য সমগ্র পূর্ববঙ্গে উৎসাহ সৃষ্টি করে। ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা পুলিসের বড় গোয়েন্দা অফিসার সামশুল আলম 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার' তদ্বির করে হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে নামার কালে বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত নামক এক কিশোর তাকে গুলি করে হত্যা করে। বীরেন্দ্র গুলি চালাতে চালাতে রাস্তায় নেমে এলে জনৈক পুলিস-সার্জেন্ট তাকে ধরে ফেলে। বিচারে বীরেন্দ্রের ফাঁসির আদেশ হয়।

মানিকতলার বোমার মামলায় (আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলা নামে খ্যাত)

অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলেন আর প্রায় সকলেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র দাস প্রমুখ কয়েক জন বীর বিপ্লবী নেতার নাম দেশের বিপ্লব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এঁরা সকলেই স্ব স্ব এলাকায় কৃতী কর্মী বলে আদৃত ছিলেন।

বিংশশতাব্দীতে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে আলিপুর যুদ্ধোদ্যোগের ষড়যন্ত্র মামলাই বিপ্লব ইতিহাসের প্রথম মামলা। এই দলের ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, কানাই লাল দত্ত ও সত্যেন বসু স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম শহীদ। বিপ্লব প্রচেষ্টায় ভারতে এই প্রথম বোমা বিস্ফোরণ হয়। এরাই প্রথম বিপ্লবী দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নরেন গোঁসাইকে জেলের ভিতর গুলিতে হত্যা করে নিজেরা ফাঁসিতে মরেন। পৃথিবীর বিপ্লব-সংগ্রামের ইতিহাসে এ-এক বিস্ময়কর ঘটনা।

একদিকে সরকারী চণ্ড শাসনে প্রকাশ্য আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়ে যায় আর একদিকে দেশের বিক্ষুব্ধ যুবশক্তি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে গোপন পথে কর্মোদ্যোগী হয়ে ওঠে। বিদেশী অত্যাচারী প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তির রক্তচক্ষু মুক্তি আন্দোলনের গতিবেগ হ্রাস করার পরিবর্তে প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে তাকে আরো তীব্রতর করে তোলে।

আমার পাড়াগাঁয়ের স্কুলে তখন আন্দোলনের জোয়ার থেমে গেছে, সকল যোগাযোগ ছিন্ন। এমন সময় আমি স্কুলের এক ছাত্র বন্ধুর কাছ থেকে 'যুগান্তর' নামে একটি ছোট ইংরাজী ইশ্‌তেহার পাই। তাতে লেখা—"শ্বেতাঙ্গ জাতির হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প আমরা কিছুতেই ছাড়ব না—টাকার ভাবনা নেই। পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারি লুঠ করে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে। টাকা হলেই পিস্তল রিভলবার সংগ্রহ করা যায় এবং বোমাও তৈরি করা যায়। যুবকগণ, তোমরা দেশমায়ের পূজার আত্মবলি দিতে বদ্ধপরিকর হও। বিপ্লবী দলের কাজে এগিয়ে এস।" সে-দিন অপূর্ব আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ও কর্মোদ্দীপনায় রোমাঞ্চে মন ভরপুর হয়ে রইল। অতি গোপনে ইশ্‌তেহারটি লুকিয়ে রাখি। ধরা পড়লে কঠিন শাস্তির আশঙ্কা ছিল।

বিপ্লবী উদ্দীপনা হলে কি হয়,—আমার কাজের কোনই সুবিধা হচ্ছে না। স্কুলের ছাত্রনেতারা ও বাইরের পরিচিত কর্মীরা কেউ জেলে কেউ বা ফেরার। গুপ্ত সমিতি কর্মীদের সঙ্গে কোন সংযোগই করতে পারছি না। 'স্বাধীনতা' শীর্ষক একটি বিপ্লবী দলের ইশ্‌তেহার শহরে বন্দরে গোপনে বিতরণ হয়, আমিও

মাঝে মাঝে একটি ছুটি পেয়ে যাই—এদিকে ঝোঁক আছে বলেই পাই কিন্তু গোপন দলের সন্ধান পাই না—তবু ব্যাকুলতা বাড়ে বই কমে না।

"স্বাধীনতা" পুস্তিকায় লেখা আছে,—'স্বাধীনতাকামী বীর যুবকগণ, আমাদের সন্ধান করে নাও,' কিন্তু কে জানে কোথায় থাকে তারা। খবরের কাগজে কেবলই দেখি ধরপাকড় ও ষড়যন্ত্র মামলার কথা পিস্তল রিভলভারের সন্ধানে চারদিকে খানাতল্লাস আর গ্রেপ্তার।

গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন না করতে পারলেও বিপ্লবপথে দাঁড়াবার মানসিক প্রস্তুতির চেষ্টা ছাড়ি নাই। পত্রিকা পড়তাম খুব আগ্রহ ভরে। স্বদেশ প্রীতি থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের খবর জানার ঔৎসুক্য বেড়ে গিয়েছিল। নিয়মিত কাগজ পড়তাম, দৈনিক কাগজ পাওয়া যেত না। স্কুলের হেড মাস্টারের ইংরাজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' লুকিয়ে এনে পড়ে আবার রেখে আসতাম। সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা তখন বাংলার বিখ্যাত জাতীয়তা-বাদী কাগজ। এ-কাগজে নির্ভীক ভাবে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' দাবি তুলে সারা ভারতের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অন্য প্রদেশে এ-কাগজের গ্রাহকগণ পুলিসের কু-দৃষ্টিতে পড়ে যেতো, স্বদেশী সংগ্রামীদের আন্দোলন, গুলি, পুলিস ও বিশ্বাসঘাতকের হত্যা, স্বদেশী-ডাকাতি, রাজনীতিক ষড়যন্ত্র মামলা সংক্রান্ত সংবাদগুলি আমাকে খুব আকৃষ্ট করতো। এ-সকল সংবাদ জানার জন্যই খবরের কাগজ পড়ার দিকে ঝোঁক পড়েছিল। পড়ার উৎসাহে ইংরাজী ভাষাটাও সহজে আয়ত্ত হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষ কাজের সুযোগ না পেয়ে 'স্বদেশী' সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য পড়ায় মন দিলাম। সখারামের দেশের কথা, বাজীরাও ও গেরিলা যুদ্ধ, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আনন্দমঠ, ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্‌ডির জীবনী, নিহিলিস্ট রহস্য, ফরাসী বিপ্লব কাহিনী, আয়রল্যাণ্ডের সশস্ত্র সংগ্রাম ইত্যাদি বই পড়তাম; বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাস, রবি ঠাকুরের প্রবন্ধ, উপন্যাস, সাহিত্য ও কবিতা উৎসাহের সহিত পড়তাম। সাধারণ ধর্মগ্রন্থও পড়তাম। দেশ ভ্রমণের বই, শিকার কাহিনীও ভাল লাগত। সাটীরপাড়া গ্রামে যুবকগণ এ ধরনের বই দিয়ে লাইব্রেরী করেন। বিবেকানন্দের বইগুলি আমাদের কাছে ছিল খুবই আদৃত।

'ভারতে বিবেকানন্দ' 'বর্তমান ভারত' 'চিকাগো বক্তৃতা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' —এ বইগুলি পড়ে পাশ্চাত্য দানবের বিরুদ্ধে প্রাচ্যমানবের অভ্যুদয়ের কথা বেশ মনোমত হল।

জাতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও কালচার বাদ দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা নয়। এমন ধারণা মনের মধ্যে দানা বাঁধে। অতীত ভারতের গৌরব ঐতিহ্যে আমরা নিজেদের গর্বিত মনে করতাম। ভারতকে অতীত গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করাই ছিল সেদিন আমাদের কামনা। যার বর্তমান নাই, অতীত ছিল, সে তো অতীত দিনের গৌরবমণ্ডিত দিনের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতের নূতন দিনের পথে সবল চিত্তে অগ্রসর হবে। নব জাতীয়তার সংগ্রামপথে স্বাধীনতার নূতন প্রেরণা সংগ্রামী কর্মীদের চেতনায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। পশ্চিমের যন্ত্র ও বিজ্ঞান, শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাধীন ভারতে আমাদের গ্রহণীয় বলে আমরা বিশ্বাস করতাম। রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প-বাণিজ্য সব কিছুই ধর্মের ভিত্তিতে চলবে—ধর্ম ছাড়া ভারতে কিছু হতে পারে না, সকল শিক্ষিতদের মতো আমরাও তা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। পৌরাণিক সুর-অসুর যুদ্ধ, মহাভারতের যুদ্ধ ও রামায়ণের যুদ্ধ থেকে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনা পেতেম। ইংরাজ অত্যাচারী অশুভ শক্তি, দানব। আমরা ন্যায় পথের শুভ শক্তি,—মানব। গীতায় যুদ্ধবিমুখ দুর্বল অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সবলচিত্তে যুদ্ধ করে শত্রু নিহত করার উপদেশ প্রথমযুগের বিপ্লবীদের গভীর প্রেরণা দিত। গীতার উপদেশ তাদের মনোবল উদ্দীপ্ত করে ইংরাজ অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তি ও উৎসাহ যোগাত।

স্কুলে, গ্রামে ও বাড়িতে সর্বত্রই দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথা এবং ইংরাজের শোষণের কথা নিয়ে আলোচনা হত—

'ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা'
'—পঙ্গপাল এসে সার শস্য গ্রাসে যা ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভূষি শেষে ;
—হায়গো রাজা কি কঠিন।

এমনি পরাধীনতার দুর্গতির কথা বাঙালীর ঘরে ঘরে। আমি তা শুনে শুনেই ছাত্রজীবনে বেড়ে উঠেছিলাম। তাঁতীদের আঙুল কেটে বিলাতী কোম্পানী দেশের তাঁতশিল্প ধ্বংস করে দিয়েছে। দাদাদিদিমাদের খেদোক্তি শুনতেম—"কি দিন ছিল, আর কি হল?" প্রচুর খাদ্যসম্পদ, সবল স্বাস্থ্য, সুখ ঐশ্বর্য যা ছিল সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, পরাধীনতার এই গ্লানি প্রথম জীবনে আমাকে স্বাধীনতার অভিযানে প্রেরণা জুগিয়েছিল। নানা বিষয়ে পড়াশুনা করে বিদেশী অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগুন আমার ভিতরে জ্বলতে থাকে স্কুলের ছাত্র বয়স থেকেই।

১৯০৭ সালে কিশোর বয়সে স্কুলে পড়ার সময়েই বিপ্লবী স্কুলেও আমার হাতে-খড়ি হয়। এখন এই বৃদ্ধ বয়সেও সে-স্কুলের ছাত্রই আছি। বিপ্লব আজো সম্পন্ন হয় নাই, কাজেই বিপ্লবী ছাত্রজীবনও আছেই।—সুদূর অতীতের স্মৃতিকথা আজ জীবন-সন্ধ্যায় লিখতে বসেছি।

১৯১০ সালে থেকে ১৯১৩।১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব অবধি জাতীয় আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মিণ্টো-মর্লে রিফর্ম বা শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করায় এবং পরে 'বোমার দলের' প্রভাব ক্ষুণ্ন করার জন্য 'বঙ্গ-ভঙ্গ' রহিত করে দেওয়ায় আন্দোলনকারীরা বিশেষ করে নরম দলের নেতারা খুশী হয়ে যান। ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলনের ধার ভোঁতা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার একটু উদার হতে বাধ্য হয়েছিল। বিপ্লবীদলের কর্মীরা এতেই সন্তুষ্ট হন নাই। নিষ্ঠুর অত্যাচারের পথে উৎপীড়নের মধ্যেও তারা দলের কাজ অব্যাহত রাখেন। বিদেশী শাসন নির্মূল না-করা অবধি তাদের ব্রত শেষ হবে না এমনই তাদের প্রতিজ্ঞা।

সরকারী দমননীতি, ধরপাকড়, খানাতল্লাস, বহু লোককে গ্রেপ্তার করে ষড়যন্ত্র মামলা সাজানো, বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে বিপ্লবী দলও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ-সময় তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও কিছুটা হ্রাস পায়, তবু তাদেরই অনুষ্ঠিত মাঝে মাঝে দু-একটি বোমা-পিস্তল অভিযান ও বড় গোয়েন্দা পুলিস হত্যার ফলে দেশের গতানুগতিক জীবনে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসত। এই দলের কর্মীরাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও মনোবল নিয়ে ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। দেশে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল ছিল না, আন্দোলনও ছিল না; দেশের মানুষের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার কোন প্রতিবাদ ছিল না। দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কল্পনা ম্লান হয়ে পড়েছিল এবং বর্তমান ছিল অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন। বিপ্লবীরা অতি সঙ্গোপনে ছাত্র ও যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জাগাত, সন্ত্রাসবাদী দু-টি একটি সাহসিক কাজের দ্বারা লোকের মনে স্বাধীনতার উদ্দীপনা জাগাত, যুবকচিত্তে সৃষ্টি করত স্বাধীনতা সংগ্রামের রোমান্স-স্বপ্নময় বীরত্ব ও কল্পনা—ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারত স্বাধীন করতেই হবে।

দু তিন বৎসর ধরে বহু ডাকাতি, গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতক হত্যা চলছিলই। ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকা হতে বিপ্লবীরা বোমা রিভলভার সঙ্গে নিয়ে শ্রীহট্ট জেলায় অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডন সাহেবকে হত্যা করতে যায়। মৌলভি

বাজারে সাহেবের বাড়িতে তারের বেড়া ডিঙিয়ে প্রবেশকালে হঠাৎ বোমটি পড়ে গিয়ে ফেটে যায়। যুবক যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর দেহ ভয়ঙ্কর বোমার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। গর্ডন সাহেব বেঁচে গেলেন। এ দুর্ঘটনায় বিপ্লবীদের কেউ কেউ ভগবানের অশুভ ইঙ্গিত মনে করে হতাশ হয়েছিলেন—নেতারা তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনেন।

কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার পুকুরের সিঁড়িতে বসে হরিপদ নামে এক টিকটিকি পুলিস (ডিটেকটিভ) সন্দিগ্ধ বিপ্লবীদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। সবে মাত্র তখন সন্ধ্যা—চারদিক আলোকমালায় সজ্জিত। অসংখ্য লোক এই সময়টায় কলেজ স্কোয়ারের পুকুরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। অকস্মাৎ পিস্তলের আওয়াজ—গুপ্তচর পুলিসের দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত। রিভলবার হাতে হত্যাকারী যুবকদ্বয় জনারণ্যে মিশে গেলেন। সান্ধ্যভ্রমণকারীরা নীরবে সরে পড়ল কলেজ স্কো'য়ার থেকে। শুধু বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের দেহটি মাটিতে পড়ে রইল। পরদিন সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ শহরে গোয়েন্দা বিভাগের কুখ্যাত পুলিস ইনসপেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীকে বোমার আঘাতে হত্যা করা হয়। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার সময় এই লোকটি খুব তৎপরতার সহিত দলের ক্ষতি করা এবং বন্দীদের সকল তথ্য সংগ্রহ করার কাজ করে। দুইবার চেষ্টার পর এবার বিপ্লবী দলের কর্মীরা সফল হয়—কিন্তু পুলিস কাকেও গ্রেপ্তার করতে পারে নাই। এরূপ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে পুলিস জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হয় নাই।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাতেই কয়েকটি অমূল্য জীবনের অবসান হয়ে গেল। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন, চারু, বীরেন বীরের মতো ফাঁসি বরণ করে জাতীয় জীবনের ভাটার মুখে দেশবাসীর মনে নূতন সাহস, নূতন প্রেরণা ও নূতন আশার জোয়ার এনে দিলেন।

মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনদান কখনো ব্যর্থ হয় না। তাদের জীবনদান আরো সহস্র যুবককে নিজের জীবন দিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করল। মৃত্যুর বিনিময়ে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাঙ্গালীর জীবন—ভারতবাসীর জীবন।

মৃত্যুদণ্ড ছাড়াও বহুকর্মী দীর্ঘ কারাদণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে অন্ধকার কারাকক্ষে নীরবে নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁদের কারাজীবনের দুঃসহ লাঞ্ছনা দূর করার কথা বলার মতো কোন পত্র-পত্রিকা, রাজনৈতিক নেতা বা দল পেছনে ছিল না। ইংরাজ শাসন-ভীতি দেশের মানুষকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল—দেশহিতৈষী বীর যুবকদের নির্যাতনের প্রতিকারে

অসহায় মানুষ শুধুই বেদনাবোধ করতেন। অনেকে মনে করতেন—এই বিপ্লবী দলের কর্মধারাই একদিন পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশবাসীর দুর্গতি ঘুচাবে। কিন্তু সে কবে—কতকাল পরে !!

হাফ প্যান্ট, হাফ শার্ট পরা যুবকের দল বন্দুক রিভলবার নিয়ে 'স্বদেশী ডাকাতি' করে বিপ্লবী দলের জন্য অর্থসংগ্রহ করতেন। ডাকাতির টাকা দিয়ে অস্ত্র কেনা, বোমা তৈরি করা এবং বিপ্লবী সংগঠন গড়া হত। আত্মগোপনকারী ঘরবাড়ি ছাড়া সর্বক্ষণের কর্মীদের খরচও চলত এ-টাকা থেকে। ধনীরা খেতাবের আশায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করতেন। বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের মূল্যবান ভেট দিতেন। জমিদাররা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট তোষণ ছাড়াও বিলাস-ব্যসনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন; দেশের স্বাধীনতার কাজে টাকা দেয় কে? পূর্বতন জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় ডাকাতি করে ও দৌরাত্ম্য করে অর্থ লুঠে নিতেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'র দলের লুণ্ঠিত টাকা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার মহান কাহিনী রচনা করেছিলেন।

বাংলার বিপ্লবী দলের স্বদেশী ডাকাতির লক্ষ্যস্থল ছিল অত্যাচারী জমিদার, সুদখোর মহাজন, বিলাতী পাট ব্যবসায়ী, আর ছোট-খাটো সরকারী তহবিল। অস্ত্র সংগ্রহ, বিদ্রোহ ভাবোদ্দীপক পুস্তিকা প্রচার এবং বিপ্লবী সংগঠন বিস্তার, আর অত্যাচার-পরায়ণ শাসক ও তাদের দেশী দালালদের মনে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা—এ সবই ছিল সে দিনের জাতীয় আন্দোলন।

অনেকেই প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে অপরাজেয় মনে করত। এর বিরুদ্ধে কোন রাজনীতিক দলের আন্দোলন ছিল না। উপরতলার ধনী ও জমিদারদের পরিচালিত কংগ্রেস তখন শাসনসংস্কার দাবি করতো—স্বাধীনতা দাবি করার মতো সৎসাহস কংগ্রেস নেতাদের ছিল না। মডারেট কংগ্রেস নেতারা বৎসরে একবার মিলিত হয়ে প্রস্তাব পাশ করতেন মাত্র। দেশের শিক্ষিতেরা ইংরাজী কালচারের মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন। ধর্মের মোহ, মধ্যযুগীয় ভূমি-কৌলীন্যের মোহে, আর বিলাতী কালচারের মোহে সমাজ-মানস আচ্ছন্ন ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে ও পরবর্তী বোমার দলের উদ্ভবে মোহমুক্তির উৎস সঞ্চার হল। রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনে নূতনের আঁচ পড়ল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের পরিচালিত তীব্র গণ-আন্দোলন দেখা দেয় এ সময়ে। স্বদেশী আন্দোলন সারাভারতে প্রভাব বিস্তার করে; বোমার যুগে আন্দোলনকে আরো গভীর আরো জঙ্গী ভাবাপন্ন করে তোলে। বাংলাদেশের

সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত ও শিল্পকলা নবরূপে রূপায়িত হয়। মানুষের চিন্তা-বুদ্ধি ও সাংস্কৃতিক-চেতনা গতানুগতিক পথ ছেড়ে প্রগতি-পথের সন্ধান পেল। বিদেশী-রাষ্ট্রের অধীনতা-বন্ধন ছিন্ন করার সংকল্প জাগিয়ে তুলে স্বাধীন ভারতের জাতীয়তাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা। সকল চিন্তা-বুদ্ধি ও রাজনৈতিক কর্মের পুরোভাগে ছিল সশস্ত্র সংগ্রামী দলের কাজ ও আত্মদান ;—তাদের ত্যাগ-নিষ্ঠা ও দেশহিতৈষণা—তাদের কাজই দেশের সাধারণ লোকদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদের অন্তরে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণা জাগ্রত করেছে।

প্রথম কারাদণ্ড—১৯১১

১৯০৮ সালে গভর্নমেন্ট প্রকাশ্য অনুশীলন সমিতি ও অন্যান্য যুব সমিতিগুলি ভেঙে দিল। লাঠি-ছুরিখেলা, বেয়নেট চালানো, সামরিক কায়দায় প্যারেড, কৃত্রিম যুদ্ধ চর্চা—এ সবই বন্ধ হয়ে গেল। দেশবরেণ্য যে নেতারা এই যুব সংগঠনের নেতৃত্ব করতেন বা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাঁরা বিভিন্ন জেলে বিনা বিচারে বন্দী হলেন।

স্বাভাবিক প্রকাশ্য পথ থেকে বিপ্লবী প্রবাহ গুপ্ত পথে প্রবাহিত হল। বিপ্লবী আন্দোলন গোপন খাতে সশস্ত্র শক্তিতে দাঁড়াবার সংকল্পে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিরা সরে দাঁড়ালেন। নূতন নূতন তরুণ সবল মানসিকতা নিয়ে দল পুষ্ট করলেন। পুলিস শত শত কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দিল।

সরকারী সন্ত্রাসের রুদ্ররূপে জনমনে ভীতি ও বিপ্লবী কর্মী-মনে জেগে ওঠে আনন্দের উৎস।

১৯১ -১১ সালে পুলিসী অত্যাচার পূর্ববঙ্গে চরমে উঠে, তাতে আমি ঢাকা পার্টি কেন্দ্রের সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ক্রমাগত চেষ্টার পর দলের সংস্রবে আসতে সক্ষম হলেম। পূর্ব পরিচিত ফেরারী বিপ্লবী বন্ধুরাই অতি গোপনে দেখা করে আমার মনোভাবের পরিচয় পেলেন। একজন নেতা ঢাকায় রিপোর্ট করেন, ঐ অঞ্চলের প্রায় সকলেই হতাশ ও নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে। সতীশ ঠিকই আছে। তার উৎসাহ একটুও দমেনি। তাকে আমাদের কাজে ডেকে নেওয়া উচিত।

১৯১১ সালের মধ্যভাগে আমার উপর এক গুরুতর কাজের নির্দেশ এল। অনুশীলন দলের নেতা নরেন সেন স্বয়ং এসে আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং আমিও সোৎসাহে তার আদেশ গ্রহণ করলাম। ব্যাপারটা এই প্রায় দশ মাইল দূরে এক স্থানে তিনটি '৪৫০ বোরের রিভলবার ও কতকগুলি কার্তুজ আছে, সেখান থেকে অতি সন্তর্পণে সেগুলি আনতে হবে। সেগুলি আনতে গিয়ে আমি ধরা পড়লাম। পুলিস আগেই রিভলভারের প্যাকেটটি পেয়ে যায়। তারা ওৎপেতে বসে ছিল—কে ওগুলো নিতে আসে তা দেখার জন্য। আমি না জেনে সে-খপ্পরে গিয়ে পড়লাম। আমাকে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেল পুলিসের আড্ডায়। বড় বড় পুলিস অফিসাররা রিভলভার ধরা পড়ার সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিল ওখানে। হাজার রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমাকে তারা উত্যক্ত করতে থাকে।

আমার কিন্তু ধারণা ছিল আমি ধরা পড়েছি সত্য, কিন্তু রিভলভারগুলি যথাস্থানে ঠিকই রয়েছে। রাত ১০টার পর পুলিস ইনস্পেক্টার আমাকে হাতকড়া পরাবার হুকুম দিল, এবং বলল, রিভলভার তিনটা তুমিই নিতে এসেছিলে, স্বীকার করলে হাতকড়া খুলে ছেড়ে দেব নতুবা হয়ত সারাজীবনই তোমাকে জেলে বন্দী থাকতে হবে। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। রিভলভারগুলি ওরা পেয়ে গেছে তা হলে!! উত্তর দিলাম: আমি রিভলভারের কথা কিছুই জানি না, আমি পথের পথিক মাত্র! সারারাত ওরা আমাকে মশার কামড়ের মধ্যে বসিয়ে রাখে, কিছু খেতেও দেয়নি। আমি চাইওনি।

পরদিন সকালে হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিস আমাকে 'ডাঙা' থেকে স্টীমারে নারায়ণগঞ্জ জেলে পাঠিয়ে দিল। পথে কারো সঙ্গে একটি কথাও বলতে দেয়নি। স্টীমারে 'লক্ষ্য' নদীর তীরের পানে চেয়ে মনে হয়েছিল কে জানে কোথায় চলেছি। কতকালের জন্যে চলেছি।

পুলিস আমাকে নারায়ণগঞ্জ জেলে নিয়ে গেল। এই প্রথম জেলযাত্রী, কিশোর বয়সের ছাত্র। চোর ডাকাত বদমায়েশদের মাঝে আমি একা। দেখলাম ওখানে কথায় কথায় কিল, লাথি ও লাঠির আঘাত; ইতর-ভদ্র সকলেরই এক অবস্থা। আমাকে বিনা কারণেই কয়েকটি বেতের ঘা খেতে হয়েছিল। 'শালা', শুয়ারকা বাচ্চা' তো সিপাহীদের সাধারণ বুলি। চোর বদমাশদের মাঝে আমাকেও তাদেরই মতো একজন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

এই দুঃসময়ে পুলিস ইনস্পেক্টার আমাকে ডেকে পাঠালেন। বুঝালেন—আপনি বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, পড়াশুনা করে আপনিও একজন বড়

সরকারী কর্মচারী হতে পারবেন। আপনার এ-কাজ শোভা পায় না। খারাপের দলে ঢুকে বংশের কলঙ্ক করবেন না। বলুন, কে আপনাকে রিভলভার আনতে পাঠিয়েছিল। বললেই আপনাকে ছেড়ে দেব। চুপ করে রইলাম। পুলিস অফিসার বলে চললেন, 'তিন-তিনটা পাওয়ারফুল রিভলভার, আর এতগুলি বুলেট পাওয়া যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার বুঝতেই পারেন। চাই কি আপনার দশ-পনর বছর জেল হয়ে যেতে পারে।

বললাম—আমি কিছুই জানি না। এর পরে তিনি আমাকে খুব শাসিয়ে চলে গেলেন। কয়েকমাস হাজত বাসের পর ঢাকা জেলার এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হল। রিভলভারের সঙ্গে আমার সংযোগ পুলিস প্রমাণ করতে পারেনি। ঢাকা সেনট্রাল জেলে কয়েদী হয়ে প্রবেশ করলাম —সে এক সাক্ষাৎ যমালয়। জেলার টুলি সাহেব স্বয়ং যম। লাঠি নিয়ে ঘোরেন যত্রতত্র কয়েদীর পিঠে চালান।

মনে আমার ভয়, কৌতুহল ও বিস্ময়। এ হচ্ছে ১৯১১ সালের কথা। জেলে তখন রাজবন্দীর কোনই মর্যাদা ছিল না, সেও চোর-ডাকাতেরই সামিল।

সিপাই ও কয়েদীরা অনেকে বুঝতই না যে রাজনৈতিক অপরাধটা কি রকম অপরাধ। জুলুম, অত্যাচার, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ—তার উপর কঠোর খাটুনী তো ছিলই। জাঙিয়া-কুর্তা পরে, গলায় হাঁসুলী ও কাঠের তকৃতি ঝুলিয়ে খাঁটি কয়েদী সাজলাম। জেলে প্রেসে কাজ করতে হয় বলে এক পায়ে একটি মোটা লোহার মল পরতে হল। প্রতিদিন গলার হাঁসুলী, হাতের বালা ও এক পায়ের মল—এই লোহার অলঙ্কারগুলি মাটি দিয়ে ঘসে চকচকে করে রাখতে হত—নইলে শাস্তি। লোহার থালা বাটি প্রতিদিন খাওয়ার পর সকলে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে এক মিনিটের মধ্যে মাজে ঘসে পরিষ্কার করতে হত। মোটা জাঙিয়া কুর্তাও ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হত। কয়েদী জীবনের এমনি অদ্ভুত ব্যবস্থাই ছিল তখনকার রেওয়াজ। নিয়ম শৃঙ্খলার কড়াকড়ি রক্ষা করা হত লাঠির ঘায়ে। প্রতিদিনই একজন-দুজনের ভাগ্যে বেত্রদণ্ড দাগা ছিল, সামান্য অপরাধেই বেত্রদণ্ড হত। কয়েদীরা বলত, 'ফাটক, প্রতি কথায় আটক'। লাথি, কিল, ঘুষি যে কত হত তার সীমা পরিসীমা ছিল না। পশুর চেয়েও অধম ছিল এখানকার মানুষের জীবন।

পঞ্চাশ বৎসর পর ১৯৬১ সালে কলকাতা জেলে রাজবন্দী থাকা কালে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন দেখেছি। পূর্বের নির্যাতন-উৎপীড়ন ও অমানুষিক

ব্যবহার অনেক হ্রাস পেয়েছে। আগে জেলটা ছিল শাস্তির আগার, এখন তা কিছুটা পরিমার্জিত করার চেষ্টা চলছে। সুসভ্য (?) ইংরাজের জেলে যে বর্বর অত্যাচার ভোগ করেছি তার স্মৃতি আজো শিহরণ মনে আনে।

জেলে গিয়ে প্রথম কয়েকদিন আমাকে দিয়ে উঠান ও ঘর ঝাড় দেওয়া হয়—তারপর বালতি করে জল তোলা, বস্তা বাঁধা, তু'মণের বস্তা টানার কাজ—সবই চোর বদমাশ খুনী ডাকাতদের সঙ্গে মিশে করতে হত। খুব কষ্ট হলেও আমি হাসিমুখে তাদের সঙ্গে মিশে কাজ করে যেতাম।

তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো বছর। ছোট ছেলে ও ভদ্রলোকের ছেলে বলে কেউ কেউ স্নেহ করত—কাজে একটু আধটু সাহায্যও করত। কিন্তু সেপাইরা দেখলে আর রক্ষা নেই। যে সাহায্য নেয় এবং যে দেয়—উভয়কেই খেতে হবে মার। রবিবার দিন ছুটি থাকলেও আসলে খাটুনি আরো বেশী। কাপড় কাচা, সব পরিষ্কার করা, বস্তাটানা, গাঁইতি দিয়ে রাস্তায় খোয়া উঠানো ইত্যাদি কাজে সারাদিন খাটতে হয়—এ সবকিছু কয়েদী অফিসারের হুকুমে নির্দিষ্ট কায়দায় সকলে মিলে করতে হয়। সামরিক নিয়মে জেলের কয়েদীদের পরিচালনা করা হত। সেপাই প্রখর দৃষ্টি রাখত, আমরা নির্দেশ মতো ঠিক ঠিক কাজ করছি কিনা। ঢাকা জেল প্রেসে আমাকে কাজ দিল। সারা দিন দাঁড়িয়ে থেকে হাজার হাজার কাগজে "নাম্বারিং মেসিন" দিয়ে নম্বর মারতে হত। তাতে অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল।

কিছুদিন পরে কেরানীর কাজে বদলী করল—তাতে কাগজের হিসাব রাখার দায়িত্ব অনেক বেশী; ভুল ভ্রান্তির অপরাধটা সব সময়েই কয়েদীর ঘাড়ে চাপানো হত,—কথায় কথায় কৈফিয়ৎ তলব। একদিন একেবারে বিনাদোষে শুধু অফিসারের অন্যায় অভিযোগের প্রতিবাদ করেছিলাম বলে চার রাত্রি হাতকড়া ও চারদিন ফ্যান খাওয়ার শাস্তিবিধান হয়।

ঢাকার বিখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা তখন ঢাকা জেলে ছিলেন। পূর্ব বাংলার অনুশীলনী সমিতির খ্যাতিসম্পন্ন নেতা পুলিন দাসও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সেই জেলে ছিলেন। ঐ মামলার অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরাও ১০।১২ বৎসর, কেহ বা ৫ বৎসর কারাদণ্ড নিয়ে ঐ জেলেই কয়েদী জীবন যাপন করছিলেন। জেলের কঠোর বিধানে সকলের সঙ্গে দেখা হওয়ার উপায় ছিল না।

নেতা পুলিন বাবু সিপাইর সঙ্গে খাতির করে সুকৌশলে একদিন কয়েক মিনিটের জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন এবং নানা উপদেশে আমাকে

বিপ্লবী পথে চলার জন্য উৎসাহিত করে গেলেন। এতবড় বিপ্লবী নেতার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুব আনন্দিত হই এবং গর্ববোধ করি। পরে ঐ ষড়যন্ত্র মামলার আরো কেউ কেউ আমার সঙ্গে চুপচুপি দেখা করেন। একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, 'আর কেন? এবার গিয়ে পড়াশুনায় মন দাও। এ-সব আন্দোলন করে আর কিছুই হবে না'। কথা শুনে সেদিন একটু দমে গিয়েছিলাম। ভেবেছি, আমাদের সব আশা ভরসাই কি বৃথা হবে? এ সংগ্রামে কি কিছুই হবে না? পরে আমি বুঝেছিলাম, ওই মামলায় দণ্ডিত ৩০।৩২ জন বন্দীর মধ্যে অনেকেই মন-মরা হয়ে পড়েছে। ওদের মধ্যে জেলের ভিতর দলাদলিও শুরু হয়েছিল। সুদিনের বন্ধুরা দুর্দিনে হতাশায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতেন।

পুলিনবাবু জেলে থেকে বাইরে পার্টির কাছে চিঠিপত্র দিতেন, পার্টির নীতি-পদ্ধতি সংবলিত লেখা আমি ঢাকা জেল প্রেস থেকে একজন প্রেস কর্মচারীর মারফত বাইরে পাঠিয়ে দিতাম। এ কাজে আমার বেশ আনন্দ হত। আবার নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সময় বুক দুরু দুরু করত। ধরা পড়লে আর ক্ষমা নাই। ধোলাই, বেত্রদণ্ড ও কারাদণ্ড সবই ভোগ করতে হত। একদিন জেলার টুলি সাহেব স্বয়ং দাঁড়িয়ে আমাদের সকলের দেহ তল্লাশী পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

সিপাই ও মেটরা খুব সন্ত্রস্ত। আমার বুক শুকিয়ে গেল, সঙ্গে আমার বিপ্লবী কাজের চিঠি। বোকা সিপাই যখন আমার গায়ে হাত দিয়েছে জেলার সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জলদি কর, ম্যান'। সিপাই আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্য আর একজন কয়েদীর তল্লাশী নিতে এগিয়ে গেল। শত শত কয়েদীর দেহ তল্লাশী হচ্ছিল।

অত্যাচারী মূর্খ এক সাহেবকে ঢাকা জেলায় দু'হাজার কয়েদীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে দিয়েছিল। কিন্তু তার এ বোধটা ঠিক ছিল যে সাধারণ কয়েদীর চেয়ে স্বদেশী সংগ্রামী কয়েদীরা বেশী খারাপ। কারণ তারা ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদ করতে চায়, চোর ডাকাতরা তা চায় না। তাই তিনি স্বদেশী বন্দীদের বেশী খাটানোর নির্দেশ দিতেন। যা হোক আমি এবার তার কবল থেকে রক্ষা পেলাম।

জেলে আমার বসন্ত হল—গায়ে গোটা ওঠা মাত্র তারা আমাকে জেলেরই প্রাঙ্গণে তাঁবু গেড়ে শিকলে বেঁধে রাখে। একটা শক্ত খুঁটির চারদিকে অন্যান্য ৮।৯ জন চোরের সঙ্গে আমাকে এক পায়ে পাঁচ সের (পাঁচ কেজি) ওজনের

একটা লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হল। সেপাই দায় করে ছুটো কম্বলও দিয়েছিল বটে। ১০৩।৪° জ্বর, সর্বাঙ্গে বসন্তের গোটা; এ-অবস্থায় কয়েদীদের খসখসে কম্বল যে কি পীড়াদায়ক, তা আজও ভুলিনি। ডাক্তার দূর থেকে দেখে দাওু পথ্য দিয়ে চলে যেতেন। তরুণ বয়সের একটি ভদ্র সন্তানের কাছে দুর্দান্ত নোংরা কয়েদীদের এমনি ধারা সঙ্গ সেদিন মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল বৈ কি?

সারাদিন খাটুনীর পর প্রতিদিন প্রেস থেকে ফিরে আসি। নিত্যকার সেই কাঁকর-ভরা মোটা চাল, ডালের জল আর ঘাসমিসানো তরকারী খেয়ে সারি বেঁধে শুতে যাই ঘরে। জোড়ায় জোড়ায় ফাইল করে সিপাই আমাদের সংখ্যা গুণে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা বন্ধ করে রেখে যায়, আমরা সারারাত ঘরে আটক থাকি। কয়েদী মেট পাহারাওয়ালা সারারাত চিৎকার করে আমাদের সংখ্যা গুণে গুণে বাইরে পাহারারত সিপাইকে জানিয়ে দিত।

প্রতি মুহূর্তের গ্লানিভরা সমস্ত জীবন নিয়ে কাটিয়ে দিলাম দীর্ঘ একটা বছর। সতেরো বছরের এক তরুণ বন্দীর পক্ষে প্রতিকূলতায় ভরা নিঃসঙ্গ-জীবনে একটা বৎসর দীর্ঘই বটে।

কি বিষাদ মাখা আনন্দেই দিনগুলি কেটেছিল। সাধারণ চোর বদমায়েশের চেয়ে স্বদেশী সংগ্রামী কয়েদীর এখানে এক কানাকড়িও মূল্য বেশী ছিল না। অপমান লাঞ্ছনা নিরন্তর লেগেই ছিল। দুর্দান্ত বদমায়েশ কয়েদীদের মধ্যে আমি একাই ছিলাম ৭নং খাতার রাজনৈতিক বন্দী।

জেল জীবনের দুঃসহ বেদনার মধ্যেও বাইরে গিয়ে বিপ্লবী দলের কাজে লাগার ইচ্ছা এতটুকু হ্রাস পায়নি। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে গোপনে খবর পাওয়া গেল যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয়ে গেছে, আর সেই রাজকীয় ঘোষণার দিনই বরিশালের গুণ্ডা প্রকৃতির পুলিস ইন্‌স্পেক্টার মনোমোহন ঘোষ গুলিতে নিহত হয়েছে। রাজনীতিক দলের দলনকার্যে এই পুলিস কর্মচারীটি ছিলেন অত্যন্ত তৎপর; তিনি সাহেব উচ্চ কর্মচারীদের প্রিয়পাত্রও হয়েছিলেন এ জন্যে। প্রেসের কেরানীবাবুরা ফিসফিস করে খুশীভাব প্রকাশ করলেন। আমার জেল জীবনের সমস্ত গ্লানি কেটে গেল এই একটি গুপ্ত হত্যার খবরে। একটা পরিপূর্ণ প্রীতির উৎস জেগেছিল মনে। বোঝা গেল, দল সক্রিয় আছে। পুলিনবাবু বলেছিলেন, সৎ উদ্দেশ্য পরিচালিত আন্দোলন কখনো মরে না। সত্যিই কি আমাদের আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠবে!!

বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার সংবাদ আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিরাট সংকল্পের কাছে এ সাফল্যটুকু আমলই দিইনি। বোমা-পিস্তলের দলের প্রভাব নষ্ট করার জন্যই ইংরাজ সরকার বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করার কৌশল নেয়। কংগ্রেসী নেতারা একে বিরাট জয় মনে করে ব্রিটিশ ন্যায়-পরায়ণতার তারিফ করেছিলেন।

বাড়ি ছেড়ে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কাজে

১৯১২ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মাধবদী গ্রামের বাড়িতে গেলাম, গ্রামবাসীরা আমাকে একটা সাংঘাতিক রকমের 'স্বদেশী' দলের ছেলে মনে করেছিল। কেউ কেউ বললেন, ছেলেটি বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির হলে কি হয়, ভেতরে ভেতরে বড় তেজী। একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বললেন গুপ্ত-সমিতির ছেলেরা এমনিই হয়, তারা যেমন শান্ত, সরল, পরোপকারী, তেমনি আবার দুর্ধর্ষ, নিজেদের লক্ষ্য-পথে অটল। সহানুভূতিশীল হয়েও ইংরেজ শাসনের ভয়ে কেউ বেশী কাছে ঘেঁষে নাই—কোন কোন অভিভাবক ছেলেদের আমার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দেন। আমাদের গ্রামবাসী ভদ্রলোকেরা কিছুটা রাজনীতিক সচেতন ছিলেন বলে জেল-বাস করে আসার পর আমার উপর কোন সামাজিক বিধান বা প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্ন ওঠে নাই। কোন কোন গ্রামে গোঁড়া মোড়লরা জেল ফেরত রাজনীতিক কর্মীদের পুরানো সামাজিক নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ করে নিয়েছেন। জেল থেকে এসে আমার স্বদেশ-প্রীতির উৎস যেন আরো বেড়ে গেল। গুপ্ত সমিতির লোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সমিতির কাজে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সংকল্পই গ্রহণ করলাম, ১৯১২ সালের শীতকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে ঢাকা চলে গেলাম।

অনুশীলন সমিতি (তখন গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন) মাদারীপুর মহকুমায় আমাকে কাজ করার জন্য পাঠায়। পালং থানার অন্তর্গত ভড্ডাগ্রামে মধ্য ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হয়ে ঐ অঞ্চলে দলগঠনের কাজে ঘোরাফেরা করতাম। দলের লোকেরাই আমাকে স্কুলের কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। সমস্ত এলাকাটাই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের এলাকা। প্রায় সকলেই কিছু জোত জমির মালিক। আবার চাকরী করেও অর্থোপার্জন করেন। এদেরই ছেলেরা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের গোপন দলের রিক্রুট। ভদ্রলোকেরা নিজেরাও ইংরাজ-শাসনের

নিন্দায় মুখর। নিজের প্রকৃত নাম-ধাম ও পরিচয় গোপন করে সাধারণ সংপ্রকৃতির একজন শিক্ষকরূপেই আমি নবীন-প্রবীণ সকলেরই প্রশংসাভাজন হয়ে পড়ি। তাতে আমার কাজে সুবিধা হল। যুবক ও ছাত্রদের দেশের দুরবস্থা বুঝিয়ে নানাবিধ জনহিতকর কাজে লাগানো এবং দলগঠনের কৌশল শিক্ষা দেওয়া, তারপর সাহসী সচ্চরিত্র ছেলেদের সশস্ত্র বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আকৃষ্ট করাই ছিল আমার কাজ। ঘৃণ্য পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বদেশপ্রাণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা সহজেই দলের সংস্রবে আসতে লাগলো, পিস্তল-রিভলবার নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কল্পনায় রোমান্স ছিল। অস্ত্র আইনে অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ, সৈন্যদলেও বাঙালীর স্থান নাই। পরাধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে মরণপণ লড়াই করার রোমান্সের উদ্দীপনাও যেমন মহান লক্ষ্যপথে প্রেরণার উৎসও তেমনই। প্রতিটি স্কুলে ও গ্রামে ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে একটি করে 'গ্রুপ' (ছোটদল) সংগঠিত হল। স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপনা যোগায় এমন সব বই পড়ার ব্যবস্থা ছিল। লাইব্রেরী, ক্লাব ও ব্যায়ামের আখড়া করে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাও চলতো। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষার আদর্শে ত্যাগ, পরোপকার অর্থাৎ স্বদেশবাসীর উপকার ও স্বদেশ-হিতৈষণা ব্রতে দীক্ষা নিয়ে কাজ করার সংকল্পে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে তুলত। শিখ-রাজপুতের কঠোর স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিবাজীর গেরিলা যুদ্ধ, গ্যারিবল্ডি, মাৎসিনির ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রাম, রুশের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রোমাঞ্চকর বোমা-পিস্তল-ডিনামাইটের সংগ্রামের কথা আমাদের যুবচিত্তে আলোড়ন তুলত। "আমরা ডরি না ধরাতে ঝরাতে রক্ত, দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর"। এমনি ধারা মানসিক উদ্দীপনায় তখনকার যুবক-বাংলা পরাধীনতার রুদ্ধদ্বার ভাঙতে গিয়েছিল। প্রকাশ্য যুব সংগঠন বা ছাত্র সংগঠন তৈরী করার অধিকার ছিল না, সরকারী বিধি-নিষেধে সব পথ বন্ধ, কাজেই গোপন পথে আন্দোলনের স্রোত বইতে থাকে। ধর্ম ও রাজনীতি তখন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তবে বিপ্লবীদের ধর্ম সমন্বয়বোধ জেগে উঠে সংগ্রাম পথের তাগিদে। জাতি ধর্মসম্প্রদায় সব একাকার হয়ে যায় বিপ্লবের তীর্থ যাত্রায়। দল গঠনের ও জনমনে ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব তীব্র করার আনুসঙ্গিক বিদ্রোহ ভাবোদ্দীপক পুস্তিকা স্কুলে, কলেজে, ছাত্রাবাসে, পাঠাগারে, রাস্তার পার্শ্ববর্তী আলোক স্তম্ভে (লাইট পোস্ট) গোপনে ছড়ানো হত। এই পুস্তিকাগুলি বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করত শিক্ষিতদের মধ্যে।

ভড্ডাগ্রাম থেকে সংগঠনের কাজে মাদারীপুর মহকুমার নানা স্কুলে যেতে হত।

ঢাকা পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশে একটা বিশেষ কাজে আমাকে শালদ গ্রামে যাতায়াত করতে হয়। সে সময় 'শালদ'তে একজন কুখ্যাত সি, আই, ডি, পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসেন। তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। বিচার বিবেচনা করে দেখা গেল ওই পুলিশ-পুঙ্গবের উপর গুলি চালিয়ে ওখান থেকে সরে পড়া কঠিন। ছয়জন সশস্ত্র গুপ্ত পুলিস সর্বদা তাকে আগলে থাকত। এখানে তাকে হত্যা করার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়, আমরা ক্ষুণ্ণমনে ফিরে আসি।

মাদারীপুর মহকুমা বিপ্লবী যুব আন্দোলনের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। অনুশীলন দল ও পূর্ণ দাসের দল এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছিল, এদের মধ্যে দলীয় রেষারেষিও ছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতি ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করত, ডাকাতি করে টাকা সংগ্রহ করত, অত্যাচারী পুলিস কর্মচারী ও ইংরেজ রাজকর্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করত। এ-দলগুলির পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতা দু'রকমই চলতো।

১৯১২ সালে ঢাকা ও পূর্ববঙ্গে ১৪।১৫টি ডাকাতি ও পুলিস হত্যা বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। গ্রেপ্তার হয় অনেক যুবক। কয়েকস্থানে অস্ত্রাদিও ধরা পড়ে।

১৯০৫—১৯১১।১২ সালের ঘটনাপ্রবাহ জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে তীব্র গণ-আন্দোলন জেগে উঠেছিল, আর আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা হয়। আন্দোলনের শক্তিতে ১৯০৯ সালে শাসন সংস্কার ঘোষিত হয়, ১৯১১ সালে 'বঙ্গ-ভঙ্গ' রহিত হয়ে গেল। আন্দোলনের আংশিক জয়লাভ বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস এনে দিয়েছিল, জনসাধারণের অন্তরে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণা জাগ্রত করেছিল এবং তা অর্জন করার ভিত্তি রচনা করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই পটভূমিকায় বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তদের ভিত্তি করে বিপ্লববাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সরকারী দমনপীড়নে জাতীয় আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে গেলেও বিপ্লবীদলের সন্ত্রাসবাদী কাজ চলতেই থাকে।

ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে পরিবর্তন করা হয়। বড়লাট 'লর্ড হার্ডিঞ্জ' খুব ঘটা করে ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করবেন—রাজা-মহারাজারা হাতী-চড়ে বড়লাটের সুসজ্জিত জুড়ি গাড়ির পিছনে শোভাযাত্রা করে চলেছেন, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী রাজপথের দুধারে পায়ে পা মিলিয়ে রণবাদ্যের

তালে তালে মার্চ করছে। উৎসব-মুখর দিল্লী, ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাস, অকস্মাৎ এক বাড়ির ছাদের উপরের শত শত দর্শকের ভীড়ের মাঝ থেকে এক বোমা পড়ে স্বয়ং বড়লাট সাহেবের সুসজ্জিত হাতীর উপর। বোমা ফেটে বড়লাট সাংঘাতিক রূপে আহত হন এবং একজন গার্ড নিহত হন। পুলিস দর্শক শ্রেণীর উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বোমা নিক্ষেপকারীকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না।

সারা ভারতে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পুলিস সারা উত্তর ভারতে জোর জুলুম করে বোমার দলের সন্ধান করছে। বাংলাদেশেও পুলিস তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি রাজনীতিক কর্মীর ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তির খোঁজ খবর নিতে লাগলো। আমার নিজ বাড়িতে, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে পুলিস আমার সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সকলকে উত্যক্ত করছিল। কেউ উত্তর দিতে দ্বিধা করলে তাঁকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো হতো। পুলিস জুলুম তখন খুব বেশী ছিল, পুলিসের ভীতিও ছিল বেশী।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর আমাকে খুঁজে বার করার জন্য পুলিস উঠে পড়ে লেগে যায়। আমার এক মামা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ছিলেন,—তার উপর হুকুম হল আমাকে যে-করে হোক খুঁজে বার করতে হবে। নইলে চাকরী থাকবে না। আমি অনুশীলন দলের কাজে তখন উত্তরবঙ্গে ঘুরছিলাম,—কে কাকে খুঁজে বার করে। তখন আরো অনেক যুবক বাড়ি থেকে চলে এসে আত্মগোপন করে বিপ্লবী দলের কাজ করতেন।

১৯১৩ সালের প্রথমভাগে ঢাকার পার্টি কেন্দ্রে আমি ঢাকায় ফেরারী বিপ্লবীদের এক ভাড়া করা বাসায় ছিলাম। ছিলাম সাত-আট জন। চাল কম ছিল বলে প্রত্যেকেই কিছু কম করে খেতাম। সকালে মুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রান্না-বান্না ও থালা-বাটি ধোয়া নিজেদেরই করতে হতো। পার্টির অবস্থা শোচনীয়। সর্বক্ষণের কর্মী ও গৃহস্থ কর্মী মিলে সারা পূর্ববঙ্গে একশ জনের বেশী হবে না। সমস্ত দেশ যেন অসাড়, রাজনীতিক চেতনা-লেশহীন, পুলিস শাসন দিকে দিকে। রাজনীতিক আন্দোলন ও রাজনীতি নেতৃত্ব নিস্তেজ। বিপ্লবীদলের কার্যকলাপ চলছেই, নেতা ও কর্মীদের আশা উদ্যম ও দৃঢ়প্রত্যয় তাদের চালিত করছে। দিন আসবেই, এই তাদের কথা। এমন দুঃসময়ে এক দুর্ঘটনার খবর পার্টি কর্মীদের মনে কিছুটা হতাশা ও উদ্বেগ এনে দিল। মৌলভী বাজারের অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডন সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে যোগেন চক্রবর্তী নিজেই

বোমা ফেটে মারা যান, সাহেব বেঁচে গেলেন। এই গর্ডন সাহেব দয়ানন্দ স্বামীর অরুণাচল আশ্রমে রাজনীতির গন্ধ পেয়ে পুলিস-ফৌজ নিয়ে চড়াও করে। আশ্রমবাসীরা বাধা দেন, লাঠি-ত্রিশূল চালান; পুলিস গুলি চালায়। বিখ্যাত দেশপ্রিয় মহেন্দ্রসিং গুলির আঘাতে মারা যান। আশ্রমবাসী নরনারীর উপর পুলিস বর্বর অত্যাচার করে এবং অনেককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। যোগেন চক্রবর্তী নিজের বোমায় নিজে মারা যাওয়ার খবর এলে আমাদের একজন বলে উঠলেন—আমাদের এ কর্মপন্থা বুঝি ভগবানের অভিপ্রেত নয়। নেতাদের দৃঢ় প্রত্যয় দেখে তার ভুল ভাঙে।

কথাটা সে-সময় বড় রূঢ় শোনাল, কারণ কিছুদিন পূর্বেই অনুশীলন দলনেতা মাখন সেন সশস্ত্র সংগ্রাম বিরোধী মতের জন্য দলত্যাগী হয়েছিলেন। পরে তিনি গান্ধীবাদী নেতা হয়েছিলেন।

য-হউক সকল দুরবস্থা অতিক্রম করে অনুশীলন দল আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো ও ক্রমে বিশাল ও শক্তিশালী দল গঠন করে তুললো। দুর্দান্ত ব্রিটিশ সিংহ এ দলের প্রভাব খর্ব করতে পারে নাই। ক্ষুদ্র চারাগাছটি যেমন সকল বাধা ঠেলে চারদিকের অনুকূল অবস্থার রস টেনে প্রকাণ্ড একটি মহীরুহে পরিণত হয়, অনুশীলন বিপ্লবী সমিতিও ধৈর্য ও কর্মকুশলতায় তেমনি বড় হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী যুবকগণ অতি সামান্য অতি তুচ্ছ অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন এক সময় গেছে যখন শুধু বাইরের বন্ধুরাই নয়, দলের কর্মীরাও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিঁকে থাকতে পারবে কিনা কেউ কেউ তা সন্দেহ করতেন। দেশের মাটি উর্বরা হলে বিপ্লবের বীজ রোপণ করে তাকে ফলানো যায়। ইতিহাসের শিক্ষাও তাই।

স্বদেশী আন্দোলনের পরই যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বীর বিপ্লবীর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং দেশের আদর্শস্থানীয় নেতা বলে জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাঁরা কেউ কেউ ফাঁসিতে ও গুলিতে মরেছেন, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা জেলে ও দ্বীপান্তরে। বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস মানিকতলা বোমার মামলায় দণ্ডিত। অনুশীলন দলনেতা পুলিন দাস ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত। পূর্ববঙ্গের নেতা নরেন সেন ও প্রতুল গাঙ্গুলী, মদন ভৌমিক, রমেশ আচার্য প্রভৃতি সকলেই ইংরাজের কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করছেন। অমৃত হাজরাও দ্বীপান্তরে নির্বাসিত। অরবিন্দ দেশত্যাগী। ছোট ছোট জেলা নেতারাও জেলে। নেতাদের অনুপস্থিতিতে কিন্তু দলের কাজ

বন্ধ হয়নি। অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক কর্মীরা কাজের ভিতর দিয়ে জ্ঞাত ও খ্যাত হয়ে উঠেছেন—দলের বিপ্লবী কর্মধারা বজায় রেখেছেন। গোপন দলের নেতার খ্যাতি তখনকার দিনে দলের কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রকাশ হয়ে পড়ত তার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা। পূর্বতন নেতারা ধরা পড়ে গেলে পরবর্তী পর্যায়ের নূতন নেতারা পূর্বগামীদের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিতেন। পরাধীন দুর্গত সমাজে সংগ্রামী যুবকের অভাব হয় না। সরকারী অত্যাচারেই বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হয়, নূতন নূতন কর্মী এসে দল পুষ্ট করে।

১৯১৩ সালে ঢাকা থেকে আমাকে নাটোরে পাঠানো হয়। নাটোরে পার্টি দরদী এক বড় উকিলের বাড়িতে কিছুদিন থাকি। অনুশীলন দলের শ্রদ্ধেয় নেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) উত্তর বাংলা সংগঠনের ভার নিয়ে ওখানে থাকতেন। তিনি আমাকে রংপুর জেলায় কুড়িগ্রাম মহকুমায় সংগঠক হিসাবে পাঠান। ভিতর বন্দ থানায় উলিপুরে থাকি এবং ঘোরাফেরা করে ছাত্র ও যুবকদের গ্রুপ গঠন করি। পূর্ববঙ্গে বিপ্লবী যুবকদের যে কর্মোদ্দীপনা, রাজনীতিক চেতনা ও যে সংগঠন দেখেছিলাম উত্তর বঙ্গে এসে তাঁর তেমন পরিচয় পাওয়া গেল না। এ বৎসরের শেষদিকে কলকাতায় গিয়েও সংগঠন দুর্বল মনে হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলন নিষ্প্রভ হয়ে গেলে পূর্ববাংলার বিপ্লবীরাই তেজোদ্দীপ্ত প্রাণস্পন্দনে বিপ্লবী সংগ্রামের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। মহারাজের চিঠি পেয়ে কুড়িগ্রাম থেকে কলকাতা রওনা হলেম—এই আমার প্রথম কলকাতা আসা। এর পূর্বে একবার এসেই ফিরে গিয়েছিলাম।

১৯১৩ সালে শীতের প্রারম্ভে অতি প্রত্যূষে রাজাবাজারে একটি বাড়ির গেটে প্রবেশ করতেই সশস্ত্র পুলিস আমাকে চ্যালেঞ্জ করল। আমি দৌড় দিলাম। দু'তিনজন পুলিস আমার পিছনে ধাওয়া করায় আমি অন্ধকার গলিতে ঢুকে সরে পড়ি. বুঝলাম ঐ বাড়িতে তল্লাসী হচ্ছিল। দোতলায় বারন্দায় দাঁড়িয়ে আমার বন্ধুরা কি যেন ইঙ্গিত করছিলেন। আমি বুঝতে না পেরে ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। বিপ্লবী বন্ধুদের এক আড্ডায় ছুটে যেয়ে খবর দিতেই একজন সংবাদ নিতে এলেন,—রাস্তার ভিড়ের মাঝে শুনে গেলেন যে, এ বাড়িতে বোমা পিস্তলসহ একদল যুবক ধরা পড়েছেন। পুলিস এখানে বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার করেছে। পার্টির নেতা অমৃত হাজরা ও অন্য চারজনের বিরুদ্ধে রাজাবাজার বোমার মামলা দাঁড় করানো হয়। এদের কাছে আমার ঠিকানা পেয়ে রংপুর

জেলায় জুনাই তাঙ্গায় আমার বাসস্থান তল্লাস করে 'স্বাধীনতা' শীর্ষক রাজ-দ্রোহাত্মক পুস্তিকা পায়। রাজাবাজার বোমার মামলায় ষড়যন্ত্রের সহায়করূপে (কো-কনসপিরেটর) অভিযুক্ত করার জন্য আমার নামে ওয়ারেণ্ট বার হয়। আমি তখন পুলিসের নাগালের বাইরে। নাম পরিবর্তন করে কলকাতাতেই কয়েক মাস ছিলাম। বোমা তৈরি করার অপরাধে অমৃত হাজরা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

আমরা কয়েকজন কলকাতার বাইরে বরাহনগরে বাসা করে থাকি। সকলেরই নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, সকলেই দলের ভাল কর্মী। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান বলে ওখানে বাসা নেওয়া হয়। তখন চারজন যাত্রী নিয়ে কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করতো—ভাড়া চার পয়সা করে।

অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র ঢাকায়—কলকাতায় তার প্রধান শাখা। এখানে বহু ছাত্র, কর্মচারী ও বিভিন্ন রকম কাজে নিযুক্ত যুবক এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিস্ফোরক পদার্থ (Explosives) তৈরির মাল-মশলা, পিস্তল-রিভলবার সংগ্রহ, প্রেসে বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা ছাপানোর ব্যবস্থা কলকাতা থেকেই হয়। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীদের সঙ্গে ও উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পক্ষে কলকাতাই সুবিধাজনক স্থান। এখান থেকেই বাংলা পুস্তিকা 'স্বাধীনতা' ও ইংরাজী পুস্তিকা 'লিবারটি' ছাপিয়ে প্যাকেট তৈরি করে বিভিন্ন জেলায় ও প্রদেশে পাঠানো হতো। একই নির্দিষ্ট তারিখে ঐ বিদ্রোহ ভাবোদ্দীপক পুস্তিকাগুলি বিলি করার ব্যবস্থা ছিল। খবরের কাগজে সংবাদ বের হত—'চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর, সিলেট, গৌহাটি, কলকাতা, পাটনা, বেনারস, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে 'স্বাধীন ভারত' ও 'লিবারটি'—কাগজ স্কুলে, কলেজে, মেসে, রাস্তায়, দেওয়ালে গত রাত্রিতে বিলি করা হয়েছে।' তারপরই চলে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তারের হিড়িক। সারা ভারতের মানুষ বিপ্লবী দলের বিস্তার ও সংগঠন দেখে বিস্মিত ও উদ্দীপিত হয়; ভাবে সমিতির সংগঠন কত বড, কত নিপুণতার সহিত তারা কাজ করে। কিছুকাল পর অকস্মাৎ আবার একদিন ঐরূপ নূতন লেখা পুস্তিকা বিলি হয়। আবার ধর-পাকড়। এমনি ধারাই চলে। প্রকাশ্য রাজনীতিক আন্দোলনের নেতারা প্রায় কেউই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। অতি গোপনে কারো কারো সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া যেত। ভীতিই তার প্রধান কারণ। পশ্চিমবঙ্গের দু-একটি দল সে সময় দুর্বলভাবে বিপ্লবী দল গঠনকার্যে রত ছিল। আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতার কাজ সম্বন্ধে

খুব বড় ধারণা পোষণ করতাম। এখানে এসে দেখি, কলকাতার রাজনীতিক জীবন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। অনুশীলন সমিতির ঘাঁটি পূর্ববঙ্গে; উত্তর বঙ্গের সর্বত্র, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, খুলনাতেও সমিতির শাখা বিস্তার হচ্ছে, আসামের বিভিন্ন জেলায় এ দলের কাজ ছিল। ক্রমে ক্রমে কলকাতাই পার্টির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। কিন্তু অর্থসংগ্রহ দ্বারা সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য পূর্ববঙ্গের সুদখোর, কৃষকের রক্তচোষা ধনী মহাজন ও পাট ব্যবসায়ীদের টাকা লুঠ করাই তখনো ভরসা, বিভিন্ন জেলায় 'জেলা-সংগঠক' বা পরিচালক এবং বাংলার বাইরে বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে দলগঠনের জন্য পূর্ববাংলা থেকে বিশেষ করে ঢাকা থেকেই পরিচালক যোগাতে হত। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও অন্যস্থানের শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্তদের ভিতর থেকে অসংখ্য বুদ্ধিমান তেজস্বী দৃঢ় বিপ্লবী যুবক বেরিয়ে এসেছেন। ক্রমে ক্রমে পূর্ববঙ্গের অপর জেলা হতেও অনেক কর্মী-বিপ্লবী রিক্রুট হয়ে এসেছেন।

অনুশীলন পার্টি এককেন্দ্রিক পার্টি; এক কেন্দ্র হতেই সারা দেশের পার্টি পরিচালনা করার নিয়ম দাঁড়িয়ে যায় প্রথম থেকে। বিপ্লবীদলের প্রয়োজনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য এতেই বজায় থাকে। এখানে কোন উপদল হতে পারে না—পৃথক পৃথক পরিচালনাও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে না। সংগ্রামের দিনে তারা একযোগে শত্রুর বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারেন।

বরানগর থেকে রোজই কলিকাতায় যাই দেখাশুনা করার জন্য। একদিন রবি সেন ও আমি এক সঙ্গে স্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে চলেছি। একজন ভদ্রলোক রবিবাবুকে গলা জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললেন, কি রবিবাবু, কেমন আছেন। সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী জোয়ান। রবিবাবু চোখ ইসারা করতেই আমি বুঝে গেলাম এবং আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে অপর ফুটপাথে গেলাম। রবিবাবুকে আই, বি, ইনস্পেক্টার সুরেশ ব্যানার্জী গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বলিষ্ঠ কনেস্টবলটি বড়লোকের আর্দালীর মতো বড়বাবুর সঙ্গে চলছে। রবিবাবুর মতো স্ফূর্তিবাজ লোক খুব কমই দেখা যায়। খুব সরল মন, হাসি-গল্পে সকলকে মসগুল রাখতেন। কাজে কর্মে উৎসাহ যথেষ্ট, বুদ্ধি-কৌশলেও পটু। পার্টির সকলের প্রিয় তিনি। অন্যদলের লোকেরাও পারস্পরিক আলোচনায় রবি সেনকেই পছন্দ করতেন। বার বার জেলে গিয়েছেন, ফিরে এসে নূতন উদ্যমে কাজ করেছেন এবং পার্টির নেতাদের মাঝে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

বাদুড় বাগানের একটা বাসায় একদিন প্রত্যূষে দীর্ঘকায় এক বলিষ্ঠ পুরুষকে

দেখি। পরনে প্যান্ট কোট চোখ উজ্জ্বল। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। আমাদের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা সকলেই তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মনে হল তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন দূর দেশ থেকে চন্দননগর হয়ে এসেছেন। পার্টির অনেক খবর দিলেন এবং এদিকের খবর জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন। আকার-ইঙ্গিতেও কিছু কথা আদান-প্রদান হল যা আমার বোধগম্য নয়। আমি বুঝেছিলাম তিনি একজন বড় নেতা এবং পাঞ্জাব থেকে বাংলা দেশের পার্টির বড় বড় খবরগুলি সবই জানেন। হাসতে হাসতে নীতি নির্দেশক কথাও তিনি বললেন। আমাদের বন্ধুরাও হাসি মুখেই আগন্তুক বিপ্লবী বীরকে বাংলার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণা সংশোধন করে দিলেন। এক সঙ্গেই আমরা খাওয়া-দাওয়া করলাম। আমাকে তিনি বেশী করে খেতে ও বেশী করে কাজ করতে বললেন; হাসিমুখে আমাকে যেন আদেশ দিলেন আর আমি শ্রদ্ধার সহিত কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। এমন দীর্ঘ, ঋজু ও বলিষ্ঠ বাঙালী যুবক কমই দেখা যায়। তিনিও যে বাঙালী এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর আমাকে কথায় কথায় একজন জানালেন ইনিই রাসবিহারী বসু। দিল্লীতে লাট সাহেবের উপর বোমা পড়ার পর এর নামেই লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার সহ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। তিনি এখনো উত্তর ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে অনুশীলন দল পরিচালনা করছেন। শুনে খুব উৎসাহিত হলেম। এত বড় বিপ্লবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্য বই কি?

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে প্রধান আসামী করেছে। চেহারায়, কথাবার্তায়, বুদ্ধি কৌশলে ও চাতুর্যে তিনি বড় দলের বিপ্লবী নেতা হওয়ার যোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নাই। চন্দননগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি আমাদের যোগ স্থাপন করে গেলেন। বেনারসে অনুশীলনের ভারপ্রাপ্ত নেতা শচীন সান্যালের সঙ্গেও রাসবিহারী বসুর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তিনি নির্বিঘ্নে লাহোরের দিকে ফিরে গেলেন অথচ তাকে গ্রেপ্তারের পুরস্কার ঘোষণায় তাঁর ফটো শহরে, বাজারে, রেল-স্টেশনে ও প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

স্থির হয় কলকাতা থেকে ফিরে যাওয়ার পথে রাজসাহী নাটোর দীঘাপাতিয়া ঘুরে আমাকে দিনাজপুর যেতে হবে। লালগোলা থেকে স্টীমারে রামপুর বোয়ালিয়া যাই। রাজসাহী থেকে ঘোড়ায় টানা টমটম গাড়িতে তখন নাটোর যেতে হতো। রাজসাহী শহরে রেলপথ ছিল না।

দলের কাজের নির্দেশ নিয়ে এসেছিলাম কলকাতা কেন্দ্র থেকে। প্রত্যেক

স্থানেই একটি করে যুবক দল ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য কাজ করতো। "স্বাধীনতা" পুস্তিকা বিতরণের জন্য সকল কেন্দ্রেই দিতে হয়। রাজসাহী জিলা সংগঠনের ভার নিয়ে থাকার মতো কোন আশ্রয় স্থান ছিল না। কলেজ-হোস্টেলে ও মেসে 'গেস্ট' হয়ে ক'দিনই বা থাকা চলে। পুলিসের সন্দেহে পড়ার আশঙ্কাও আছে।

অবশেষে ছবি বাঁধার দোকান খোলার জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে একজন অভিজ্ঞ ছেলেকে আনা হয়। পার্টির টাকায় দোকান চলতো। দোকানদারীর আবরণে পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে থাকার উপায় বের করা হল এভাবে। আমি কিছুদিন এ-দোকানে রইলাম। প্রতি জেলাতেই জেলার কাজ পরিচালনার জন্য পরিচালকের থাকার একটা সুব্যবস্থা করে নেওয়ার প্রয়োজন হত। আমরা সকলেই তো ছিলাম পুলিসের শিকার। বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার মতো সাহসী লোক কমই ছিল। তবে কেউ কেউ বিপ্লবী জেনেও ছেলে পড়ানোর জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করে ফেরারী বিপ্লবীকে আশ্রয় দিতেন। বাড়িতে থেয়ে দলের কাজ করার মতো পরিচালক (অর্গানাইজার) কমই পাওয়া যেত। রাজসাহী কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য বন্ধুরা নিয়মিত অর্থ সাহায্য দিয়ে আমাদের দুজনের খোরাকী জোগাত। পূর্ব বাংলার ছাত্ররাই দলে ভারী ছিলেন, পরে রাজসাহী জেলার ছাত্র ও যুবকগণ দলে আসতে থাকেন। রাজাবাজার বোমার মামলায় আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হওয়ায় আমাকে নাম পরিবর্তন করে নিতে হয়। কিছুদিন পর দিনাজপুর গিয়ে সে-নামও বদলাতে হল। আমাকে দিনাজপুর জেলার কার্যভার অর্পণ করা হয়েছিল। রাজসাহী থেকে দিনাজপুর চললাম।

দিনাজপুরের বন্ধুরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তারা নাকি অনেকদিন থেকেই একজন লোক চাইছিলেন। তাই তারা আমাকে পেয়ে খুশী। দিনাজপুর জেলার পার্টি খুব দুর্বল ছিল। শহরে অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে দল। শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে রাজবংশী, পলিয়া ও সাঁওতালই সংখ্যায় বেশী।

শিক্ষিত ভদ্রলোকরা প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গ থেকে এসে এখানে বসবাস করছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষা দীক্ষা অতি সামান্য। স্ব স্ব কৃষি, বা গৃহ-শিল্প নিয়ে সামান্য আয়ে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করেন। রাজনীতিক চেতনাও নাই —চেতনা উদ্বুদ্ধ করার মতো কোন আন্দোলনেরও উদ্ভব হয় নাই দেশে। শিক্ষিতদেরও রাজনীতিক আন্দোলনের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। অনুশীলন

বিপ্লবী দলের কর্মীরাই এ অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলে স্বাদেশিকতার চেতনা বিস্তার করেন এবং ছোট হলেও এই জেলায় একটি বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন যার লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতির চিন্তা একই রকম। কৃষকদের গণ-আন্দোলনের চিন্তা কারও মাথায় ছিল না। জমিদার ও মহাজনেরাই শোষণ ও শাসন করতেন —পুলিস তাদের তাঁবেদার হয়ে অত্যাচার দ্বারা কৃষক সাধারণের শোষণের সহায়তা করতো। দিনাজপুর শহরের একজন উকিলের অর্থ সাহায্যে আমাদের দু'জনের খোরাকী চলে যেত। তিনি দলকে সমর্থন করতেন এবং গোপনে স্থানীয় কাজকর্মের পরামর্শ দিতেন। দু'জনের মাসে ২৫ টাকাতেই কোন-রকম চলে,—এই টাকাই তিনি দিতেন। নাটোরেও একজন বড় উকিল আমাদের থাকা-খাওয়ার সাহায্য করতেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। পূর্ববঙ্গে এ রকম সাহায্য ও আশ্রয় অনেক বেশী পাওয়া যেত। পূর্ববঙ্গের যোগ্য বিপ্লবী কর্মীরাই উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় দল গঠন করতে আসেন। পরে উত্তরবঙ্গ থেকেই পরিচালক নেতা দাঁড়িয়ে যান।

সংগ্রামী জীবন পথে

১৯১২-১৩ সালে আমাদের অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বাস করার আশাপ্রদ বৈপ্লবিক অবস্থা তেমন কিছুই ছিল না। তবু আমরা অনেক অভাব, দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে অম্লান চিত্তে কাজ করে যেতাম। অর্থাভাব, আশ্রয়ের অভাব তো ছিলই —দেশের লোকের চেতনা ও মনোবলেরও অভাব ছিল প্রচুর। লোকের কাছ থেকে সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যেত খুবই কম। বিপ্লবীরা সত্যি কিছু করে উঠতে পারবে, এরকম ধারণা অনেকেরই ছিল না, কাজেই তাদের কাছে ঘেঁষতে ভয়ও পেত তারা। বিপ্লবীদলের কাজের প্রতি শিক্ষিতদের প্রশংসাভাব ছিল কিন্তু তা সক্রিয় নয়। বলা বাহুল্য কিছু কিছু লোকের সাহায্য ছাড়া আমরা সমিতির কাজকর্ম চালাতেই পারতেম না, কিছু অর্থ সাহায্য, অস্ত্র ও বিদ্রোহাত্মক কাগজপত্র রাখা, আশ্রয় দেওয়া, সংগঠনের কাজে বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজে অনেক পার্টি সমর্থক ছিলেন। দলের কর্মীদের অসীম ত্যাগ ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা অবলম্বন করে চলতে হত। 'কিছু না'র মধ্যে কিছু গড়ে তোলার দৃঢ়তা তাদের ছিল। স্বাধীনতার সত্য ও ন্যায় আদর্শ কথনো বিফল হবে না

এ রকম একটা স্থির বিশ্বাস তাদের চালিত করত। কর্মাদর্শের প্রতি একান্ত অনুরাগ থাকায় স্বদেশের স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত কর্মীরা পরমানন্দে সমস্ত দুঃখ কষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে মনে করেন নাই।

প্রথমযুগে আমরা শুধু সেদ্ধ ভাত খেয়ে বা একটি রুটি কিনে খেয়ে কতদিন কাটিয়ে দিয়েছি। শুধু একটি কম্বল সম্বল করে শীতের রাতে রেল-স্টীমারে যাতায়াত করেছি। উত্তরবঙ্গের শীতে স্যাঁৎস্যাতে একতলা ঘরে কতকাল যাপন করেছি। শীতের গরম কাপড় বলে কোন বস্তু আমরা ব্যবহার করি নাই। অবশ্য বাঙালীর ব্যবহৃত মোটা চাদর (আলোয়ান) ফেরারী-ঘর-ছাড়া বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই ব্যবহার করত। এ-সব অভাবের পীড়ন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পীড়িত করেনি। নিজ বাড়িতে থাকা কালেও বেশী আরামে ছিলাম না; সম্মানীয় ব্রাহ্মণ বংশের মর্যাদাবোধটা ঠিক ছিল কিন্তু আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে আমরা ছিলাম নিঃস্ব। ব্যক্তিগত অবস্থার কথা বাদ দিলেও বিপ্লবের নামে, বিপ্লবী সংগ্রামের রোমান্টিক উদ্দীপনায় সকলে সব কিছু বাধা অসুবিধা তুচ্ছ বোধ করত। ইংরেজ রাজত্ব শেষ করতে হবে, ভারত স্বাধীন করতেই হবে—এই ছিল অন্তরের ঝোঁক।

আমরা ছোট বেলায় পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগ বড় একটা দেখি নাই। উত্তরবঙ্গ তখন ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। আমি এ-অঞ্চলে কাজ করতে এসে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। কাজের প্রয়োজনে রাজশাহী, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করি, জ্বরেও ভুগি, কুইনিন খেতে খেতে আমার সমস্ত কিছুই যেন তেতো হয়ে গিয়েছিল। নাটোর মহকুমায় পাটুল গ্রামের কর্মীদের সঙ্গে দেখাশুনা করে ফেরার সময় দুপুর রোদে পথ চলতে চলতে কাঁপিয়ে জ্বর এল—পথের ধারে একটা বাবলাগাছের তলায় জ্বর গায়ে শুয়ে পড়লাম। শীতে সর্বাঙ্গে কম্পন, কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বর খুব বেড়ে ওঠে—তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়ি। নিকটেই গর্তের মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া বর্ষায় জলের শেষটুকু উপভোগ্য হয়েছিল যত রাজ্যের ব্যাঙের, তৃষ্ণার জ্বালা সইতে না পেরে উঠে গিয়ে দু'হাতে অঞ্জলি পুরে সেই জলপান করে এসে আবার শুয়ে পড়লাম, বেলা শেষ হয়ে আসে; জ্বরও সেরে যায়। দুটো কুইনিন পীল গিলে আবার উঠে গন্তব্য স্থানাভিমুখে রওনা হলেম। কোনদিন হয়তো একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে একদিনের জন্য গিয়েছি, এমন সময় জ্বর এসে গেল,—একদিনের স্থানে সাতদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে। পকেট থেকে কুইনিন বার করে খেয়েছি। জ্বরে পড়ে

নিজেও যন্ত্রণা ভোগ করি, অপরকেও দুঃখ যন্ত্রণা দিই। কোন কোন বাড়িতে অসুখের সময় অপরিচিতা মা বোনদের কত আদর যত্ন ও শুশ্রূষা পেয়েছি, তা আজও আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। এমনি করেই কত মাস ও বৎসর চলে গিয়েছে। ম্যালেরিয়ায় দেহ ভেঙে দিয়েছে বটে—মন ভাঙতে পারেনি। মন ছিল স্বাধীনতা-সংকল্পের ইস্পাতে গড়া। আদর্শের উদ্দীপনায় মুষড়ে পড়ার মতো কোন দুর্বলতা মনে স্থান পায় নাই। ম্যালেরিয়া কিছুতেই সারছে না দেখে উত্তর বঙ্গের ভারপ্রাপ্ত বিপ্লবী নেতাকে লিখেছিলাম:

দাদা এ-অঞ্চলে স্বাস্থ্য আর টিকছে না, কি করি বলুন তো?

উত্তরে তিনি লিখলেন,—কিছুই করার নেই। অসুখের প্রতিকার চিকিৎসা ও কতকগুলি স্বাস্থ্যনীতি পালন করা ছাড়া আর কিছুই নেই। ইংরাজেরা কোন্ সুদূর দেশ থেকে এসে আসামের জঙ্গলে বাণিজ্য বিস্তার করছে, ধর্মপ্রচার করছে — কত দুর্গম স্থানে প্রবেশ করে লুঠের ব্যবসা চালাচ্ছে; কালাজ্বরে ম্যালেরিয়ায় ভোগেও তারা। মরে মরেও এশিয়া আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তার করতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি। তোমরা কিনা পূর্ববঙ্গের বাইরে বিপ্লবী দল করতে যেতে ভয় পাও, এখানকার স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে, তবু এখানে থাকতে হবে, কাজ করতে হবে, রোগের সঙ্গে লড়াই করে করেই দাঁড়াতে অভ্যাস করতে হবে। সকলেই এসে ম্যালেরিয়ায় ধরলেই পালাতে চায়, আসামেও কালাজ্বরের ভয়ে একজন যেতে চায় নাই, তবে এখানে থাকবে কে? বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা, বিস্তার করার দায়িত্ব নেবে কে? বাংলায় ও আসামে বিপ্লবী চেতনা জাগাবে কে? সকলরকম প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই এখানে থেকে বিপ্লবীদের ভিত্তি শক্ত করতে হবে। চিঠি পড়ে আমি বিস্মিত, কিন্তু উদ্দীপনাও পেলাম খুব।

জেদ করলাম—এখানে তো থাকবই স্বাস্থ্যও ভাল করে তুলতে হবে। এরপরও আমি উত্তরবঙ্গেও ছিলাম ম্যালেরিয়ায়ও ভুগেছি। কুইনিন সর্বদা পকেটে নিয়েই ঘুরতাম—ক্রমে ক্রমে ম্যালেরিয়া ছেড়ে গিয়েছিল; কিন্তু স্বাস্থ্য কাহিল করে দিয়ে যায়। বস্তুত পূর্ববঙ্গ থেকেই পরিচালনক্ষম কর্মী পাঠিয়ে প্রথম যুগে উত্তরবঙ্গে, আসামে, বিহারে, উত্তর প্রদেশে বিপ্লবী সংগঠন বিস্তার করা হত—ব্রহ্মদেশেও পূর্ববাংলার বিপ্লবীরাই দলের প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তী যুগে স্থানীয় কর্মীরাই স্ব স্ব এলাকায় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করতেন।

অনুশীলন দলের শ্রদ্ধেয় নেতা "মহারাজ-"এর গুরুতর অসুখ হওয়ায় ডাক্তার তাঁকে কিছুদিনের জন্য সাগর পারে হাওয়া পরিবর্তন নির্দেশ দেন। তাঁরই সঙ্গে

থাকার জন্য এবং নিজের স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য আমার প্রতি তার সঙ্গে থাকার নির্দেশ আসে। আমি মহারাজের সঙ্গে পুরীর 'স্বর্গদ্বারে' ও ভুবনেশ্বরে কিছুকাল ছিলাম। উড়িষ্যার ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে কথা বলেও "স্বদেশী" কাজের দিকে কিংবা গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির দিকে তখন তাদের আকৃষ্ট করা যায়নি।

ভুবনেশ্বরে থাকাকালে ১৯১৪ সনের ৪ঠা আগস্ট বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা হয়। আমরা বাংলায় ফিরে যাই। একদল রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর মতো আমাদের জীবন। অর্থাভাব লেগেই ছিল কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন খুবই সামান্য, অতি সাধারণ খাওয়া-পরাতেই আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। ডাল-ভাত বা সেদ্ধভাত হলেই খুশী, কখনো মাছের ঝোল। সকালে দু'এক পয়সার মুড়ি অথবা ছাতু দিয়ে জল খাওয়া। চা বিড়ি-সিগারেটের কোন বালাই ছিল না—পানও না।

কলকাতায় তিন চার পয়সার মুড়ি ও বেগুনী, কখনো বা মুড়ি-মুড়কি বিপ্লবীদের প্রাতরাশ। জল-খাবার খরচ জন প্রতি দু'পয়সা, হোটেলে ভাত খেতে খরচ মাত্র ছয়টি পয়সা। বিপ্লবী দলের কর্মীরাই নয় শুধু নিম্নবিত্ত লোকেদেরও খাওয়া খরচও প্রায় একই রূপ। টাকা হাতে থাকলেও দলের কর্মীরা সাধারণ প্রয়োজনাতিরিক্ত এক পয়সাও ব্যয় করতেন না এবং কোন রকম বিলাসিতার ধারেও যেতেন না। দিনাজপুরে থাকা কালে ওখানকার ভারপ্রাপ্ত দুজন কর্মী দু'তিন দিন দিনাজপুরের বিখ্যাত কাটারীভোগ চালের ভাত খাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারে নাই। যুক্তি ছিল, শুধু মোটা চালের ভাত খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে গেছে, তার জন্যে মাঝে মাঝে সরু চাল খাওয়া দরকার। টাকা খরচ হত সংগঠনের কাজে যাতায়াতে, তার চেয়েও বেশী খরচ হত অস্ত্র সংগ্রহে ও বোমা তৈরির সাজসরঞ্জাম কেনায়।

"আনন্দমঠ" ঐতিহাসিক উপন্যাসের "সন্তানদল" দেশোদ্ধার ব্রতে স্ত্রী-পুত্র বাড়িঘর সর্বস্ব ত্যাগ করার সংকল্প নিয়েছিল। সেদিন যখন এদেশে জাতীয় চেতনা তেমন উদ্বুদ্ধ হয় নাই—সাধারণ শিক্ষিত অশিক্ষিতরা স্বার্থপরতায় ও ভীরুতায় আচ্ছন্ন, সজ্জন ব্যক্তিরা আশ্রম জীবনের নিরাপদ আশ্রয়ে জনগণের শ্রদ্ধা সম্মান এবং বিত্ত সম্পদ লাভ করছেন তখন মুষ্টিমেয় বিপ্লবী দলের লোক সাধু সন্ন্যাসীর মতো সর্বত্যাগী না হলে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না। রাষ্ট্র বিপ্লবের মহান আদর্শে দেশের লোকের মন আকৃষ্ট করতে পারতেন না। প্রথম যুগের বিপ্লবী দলের কর্মীরা জনসেবার কাজেও সকলের আগে থাকতেন। রোগীর শুশ্রূষা, মৃতের সৎকার, মেলায়, স্নানযাত্রায় ও তীর্থস্থানের ভীড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা

বিধানের কাজও তারাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে করতেন। ক্লাব, পাঠাগার এবং ব্যায়ামের আখড়াতেও এ দলের লোকেদেরই প্রভাব।

এরূপ কাজের মাধ্যমে তারা দলের কর্মী সংগ্রহ করতেন (রিক্রুট)।

১৯১২-১৩ সালে বাঙলা দেশের অনেক বিপ্লবী যুবক বর্ধমানের বন্যায় রিলিফের কাজ করতে গিয়েছিলেন। বন্যায় ভাসমান লোকদের উদ্ধার করা, বন্যা অধিবাসীদের খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করা, রোগীদের ঔষধ দেওয়া, ইত্যাদি কাজে জলে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হত। শত শত নরনারী শিশু, গৃহহীন অন্নহীন বস্ত্রহীন ও জলে দাঁড়িয়ে যারা, তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করা বিপ্লবীরা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করতেন। এ দলের লোকই আবার বিভিন্ন জেলা থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে বন্যা পীড়িতদের সাহায্য পাঠাতেন। বর্ধমানের বন্যা সাহায্যের আন্দোলন বাংলাদেশে একটা জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। বিপ্লবী দল এরই মধ্যে সংগঠন বিস্তারের সুযোগ করে নেয়। বর্ধমানের বন্যায় রিলিফ কার্যে যাঁরা বিভিন্ন জেলা থেকে যোগদান করেন, সরকারী পুলিস পরে তাদের নাম-ধাম টুকে রাখে। কুড়িগ্রামের সংগঠন কার্য ছেড়ে আমার যাওয়ার নির্দেশ পেলাম না। রামকৃষ্ণ মিশনও সেবাকার্য-নিরত এই যুবকদের সঙ্গে সর্ব সংস্রব ত্যাগ করে।

পুলিসের উৎপাতে দলের লোকদের চালচলন পরিবর্তন করতে হয়।

পথ চলাকালে জামা-কাপড় দুরস্ত থাকা, চুল আঁচড়ানো ও জংশন স্টেশনে সিগারেট মুখে থাকলে টিকটিকি পুলিসের সন্দেহ পড়ত না। এর পূর্বে তাদের সাদাসিধা চলন দেখে পুলিস বুঝে নিত এরা স্বদেশী দলের লোক।

১৯১১ সালের মাঝামাঝি ২৬ জন পাকা অভিজ্ঞ বিপ্লবীকে নিয়ে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়। এর পূর্বে ঢাকায় এক ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্রের ঘর তল্লাশী করে পুলিস বহু কাগজপত্র এবং বন্দুক-রিভলভারের কার্তুজ পায়। ডাকাতিতে সংগৃহীত অলঙ্কারও পায়। ম্যাজিস্ট্রেট-নন্দনও ধরা পড়ে রাজসাক্ষী হয় এবং বরিশালের খবর কিছু কিছু বলে দেয়।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা মানে ইংরাজ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্র। ঢাকা অনুশীলন সমিতির বরিশাল শাখার সভ্যরা এই ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত। বিপ্লবী নেতা রমেশ আচার্য এ দলের নেতা। বিপ্লবী ও বিপ্লবী-দল সমর্থকদের প্রিয় এই নেতা গ্রেপ্তার হওয়ায় ঢাকা ও বরিশাল জিলায় চাপা বিক্ষোভ হয়।

কয়েক মাস অবধি এ-মামলা চলে, মামলার শেষে যথারীতি দীর্ঘ কারাদণ্ডের রায়। নেতা রমেশ আচার্যের বারো বৎসর কারাদণ্ড হয়। এক একটা ষড়যন্ত্র

মামলায় দেশে বেশ চাঞ্চল্য হত। ভয়ের চেয়েও বেশী হত ইংরাজ বিরোধী কার্যে উৎসাহ সঞ্চার। দণ্ডাদেশ হলে বিদ্রোহভাবোদ্দীপক শত শত পুস্তিকা বিতরণ করে বিপ্লবীর ত্যাগ ও বীরত্বের উল্লেখ করা হত। স্বাধীনতার জন্য অত্যাচারী ইংরাজ সরকারের কারাদণ্ড তো তুচ্ছ, মৃত্যুদণ্ডও মাথা পেতে নিতে হবে। বরিশাল জেলার কর্মী ও নেতারা জেলে গেলেন তার মধ্যেও কয়েকজন পুলিসের গ্রেপ্তার এড়িয়ে সরে পড়েন। তাদের ও আরো নতুনদের অক্লান্ত চেষ্টায় আবার দল গড়ে ওঠে, বিপ্লবী দল নিঃশেষ করা যায় না। স্বাধীনতার তাগিদে দল গড়ে, শক্তিশালী হয়—রাষ্ট্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলে।

১৯১১, ১২ ও ১৩ সালে বিপ্লবী সমিতিগুলি পূর্ববঙ্গের জিলায় জিলায় তাদের গোপন সংগঠন চালিয়ে যায়;—সংগঠন বিস্তারের জন্য টাকার প্রয়োজন। ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ দ্বারা টাকার চাহিদা মেটানো হত। আবার দল গঠন ও ডাকাতির জন্য পুলিসের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও গ্রেপ্তার চলত। গ্রেপ্তারের পর থানা হাজতে রাজবন্দীদের উপর অমানুষিক মারধর, লাঠি পেটা, জুতো পেটা, গায়ে স্থঁই বেঁধানো, হাত-কড়ি দিয়ে ২৪ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা, না খাইয়ে না ঘুমোতে দিয়ে দিনের পর দিন বসিয়ে রাখা এবং আরো নানাবিধ অত্যাচার চলিত। পুলিসের গুপ্তচর দলের লোকের সন্ধানে স্কুলে-কলেজে, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে, অফিসে ক্লাবে ও মেসে, যেখানে সেখানে হানা দিয়ে লোকের জীবন বিড়ম্বিত করে তুলত। বিপ্লবীরা ঐ সব পুলিস কর্মচারীদের বেছে বেছে এবং তাদের পশ্চাদনুসরণকারী গুপ্তচরদের গুলিতে হত্যা করত। বিপ্লবীদের কর্মকুশলতায় এবং জন সমর্থনের ফলে প্রায় কেহই হাতে হাতে ধরা পড়ত না। গভর্নমেণ্ট অনেক চেষ্টা করেও, দমন-মূলক আইন-কানুন বিধি বিধান জারী করেও বিপ্লবীদল নির্মূল করতে পারে নাই।

ইংরাজ গভর্নমেণ্ট মিণ্টো-মর্লি শাসন সংস্কার দিয়ে প্রথমে দেশের লোকের অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করে। কিছু লোক খুশী হয়। তারপর আবার বঙ্গভঙ্গ রহিত করে দ্বিধা বিভক্ত বাংলা দেশ এক করে দিয়ে বাংলার সশস্ত্র বিদ্রোহ আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করে, তাও ব্যর্থ হয়। যদিও ওপর তলার রাজনীতিক নেতারা ওতেই আন্দোলনের সাফল্য দেখে ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা আরম্ভ করেন। বিপ্লবী দল ইংরাজ শাসন উচ্ছেদ না করে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করে কিছুতেই তাদের সংগ্রামী আদর্শ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হবে না,—এমনই তাদের দৃঢ় সংকল্প।

বহু নেতা ও কর্মী জেলে দ্বীপান্তরে বন্দী হয়ে গেছেন, ফাঁসিতে মরেছেন। নতুন নতুন কর্মী এসে তাদের অসমাপ্ত কাজ স্বহস্তে করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দেশের সাধারণ লোক বিপ্লবী দলের সমর্থন করত, তাদের সাফল্য কামনা করত। যতই দিন যেতে লাগল, যতই সরকারী অত্যাচার চলতে লাগল, ততই জনসাধারণের ভিতর থেকেই দলের প্রতি সাহায্য ও সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কত লোক বিপ্লবীদের সাহায্য করা বা আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে কারাদণ্ড মাথায় পেতে নিয়েছেন।

নিজেদের নিক্ষিপ্ত বোমার টুকরায় নিজেরা আহত

১৯১৩।১৪ সালে দল গঠনের কাজে উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে যাতায়াত করি। বিশেষ করে প্রথমে রাজসাহী ও নাটোরেই আমার কাজ ছিল। রাজসাহীতে ছাত্ররাই দলের বড় শক্তি; নাটোর, পাটুল ও পুঠিয়াতে ছাত্র ছাড়াও দু'জন করে শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের দলের সঙ্গে যোগ রাখতেন এবং সাহায্য করতেন। পুঠিয়া রাজবাড়িতে এক যুবক তার কক্ষে আমাদের আশ্রয় দেয় ও ঘরে যুবকদের নিয়ে গোপন বৈঠকও হত। আমি রাজসাহী থেকে টমটম চড়ে পুঠিয়া রাজবাড়িতে বৈঠক করতে যেতাম। রাজবাড়ির কর্তাব্যক্তিরা তা জানতেন না। ইংরাজ রাজের অনুগত রাজপরিবারের ভিতরেই যে রাজবিদ্রোহের বীজ বোনা হচ্ছে তা কেহ অনুমান করতে পারে নাই। এখানেই মোহিত মৈত্র নামে এক যুবক বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নেয়, এখানে এই যুবক বিভিন্ন বুর্জোয়া দলের কাজে খ্যাতি অর্জন করে পরিণত বয়সে 'কমিউনিজম'-এর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এবং লেখায়, বক্তৃতায় ও কাজে বাংলাদেশে খ্যাতি অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা সাপ্তাহিক দেশহিতৈষীর সম্পাদক হন।

রাজসাহী কলেজের কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রগণ ব্যায়াম চর্চা করতেন; আবার ইংরাজের অধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র লড়াই করার সংকল্প নিতেন।

১৯১৪ সালের প্রথম ভাগে আই. বি. পুলিসের ইন্স্পেক্টার নৃপেন ঘোষকে চিৎপুর-শোভাবাজার মোড়ে ট্রাম থেকে নামা মাত্র দু'তিন জন ভদ্র যুবক রিভল-

বারের গুলিতে হত্যা করে। একজন পুলিশ গার্ড তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরে। উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে অসংখ্য লোক অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখে। গোরগোলের মধ্যে এক যুবককে দৌড়তে দেখে রাস্তায় পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। রিভলভার ছিল তার হাতে। হাইকোর্ট সেসনে তার বিচার হয়। কলেজের ছাত্র নির্মল রায় জুরীদের মতে নির্দোষ সাব্যস্ত হয়। জজ সাহেব জুরীদের সঙ্গে একমত হতে না পেরে নির্মলের পুনর্বিচারের আদেশ দেন। এবারও জুরীরা আসামীকে নির্দোষ বলেন। তৃতীয় বার বিচারের কথা হয়। দেশশুদ্ধ লোক চঞ্চল ও অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলো— ছেলেটাকে ফাঁসিতে লটকাবার জন্য ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ও তাদের জজ সাহেব খুবই ব্যগ্র। এ মামলায় দেশে খুব সাড়া পড়ে এবং ইংরাজ বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখে ইংরাজ সরকার নির্মলের বিরুদ্ধে মামলা উঠিয়ে নেয়। ব্যারিস্টার নর্টন সাহেবের জেরায় নির্মল নির্দোষ প্রতিপন্ন হয় বলে দেশে নর্টন সাহেবের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। নির্মল রায়ের মামলা সমগ্র বাংলার চিত্ত আকৃষ্ট করেছিল। এই বৎসরের মধ্যভাগে চট্টগ্রামের রাজপথে পুলিসের গুপ্তচর সত্যেন সেনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিপ্লবী দলের প্রাক্তন সভ্য রাম দাস পরে পুলিসের গুপ্তচর হয়। বিপ্লবীরা তাঁকে ঢাকা নদীর তীরে অসংখ্য লোকের মাঝে গুলি করে হত্যা করে।

এ-ছাড়া আরো অসৎ লোককে হত্যা করে দেশদ্রোহিতা যে গুরুতর অপরাধ-জনক কাজ সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে দেওয়া হয়। ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে দলের লোকের বিরুদ্ধে সকল কথা কোর্টে বলে দেওয়া, দল ছেড়ে টাকা খেয়ে পুলিসকে নিয়মিত খবর দেওয়া, দলের কর্মীদের পিছনে পিছনে অনুসরণ করে গুপ্তচর বৃত্তি করা, গুপ্তচরদের পরিচালক ও বুদ্ধিদাতা পুলিস কর্মচারী এরা সকলেই দেশদ্রোহী, ইংরাজের অনুচর। বিপ্লবী দলের বিরুদ্ধে ইংরাজ অফিসারগণ এই সব ভীরু অর্থলোভী নিকৃষ্ট ধরনের লোকদের নিযুক্ত করতো। বিপ্লবীরা এই সব দুষ্কৃতকারীদের বেছে বেছে গুলি করে হত্যা করত। দেশের লোক এতে অখুশী হত না; নিহত হলে বলত 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'। শহরের প্রকাশ্য স্থানে এই সব হত্যাকাণ্ড ঘটলেও কোথাও কেহ ধরা পড়ে নাই। সরকারী অভিযোগ ছিল জনসাধারণ পুলিসের সঙ্গে সহায়তা করে না। এ অভিযোগ সত্য, বিপ্লবীদের কার্যকলাপের প্রতি লোকের সমর্থন ছিল।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট ইউরোপে ক্ষমতালোভী বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বে যুদ্ধ বেধে যায়। ইহাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংল্যাণ্ড ও জার্মানী

দুই বিরোধী পক্ষের দুই প্রধান শক্তি রণক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হল। তখন ভারতের বিপ্লবীরা যে বিদ্রোহের আয়োজন করে সে কথা পরে লেখা হবে।

যুদ্ধ ঘোষণার সময় আমরা কয়েকজন পুরী-ভুবনেশ্বরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বাস করছিলাম।

আমি উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে ফিরে যাই। মহারাজ অনেকটা ভাল হয়ে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। তিনি পার্টির নেতা; যুদ্ধের পটভূমিকায় অনুশীলন বিপ্লবী সমিতির যা করণীয় তিনি সেই কাজেই উদ্যোগী হলেন। দিনাজপুর জেলা থেকে আমাকে মালদহ জেলার ভার গ্রহণের নির্দেশ আসে। মালদহে আমাদের সংগঠন তখন ভাল ছিল।

একজন বিচক্ষণ পরিচালকেরও নাকি দরকার ছিল। মহানন্দা নদীর তীরে বসে ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করি। প্রতিদিন যুবকদের কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদ্দীপনা যোগাতেম। প্রতিদিনের যুদ্ধের খবর চাঞ্চল্য নিয়ে আসে। খবরের কাগজ পড়ার ধুম পড়ে গেছে মালদহের সর্বত্র। মালদহ জাতীয় বিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছেলেগুলিই আমাদের দলে ছিল। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বিরোধী ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টাই ওঁরা প্রকৃত দেশের কাজ মনে করতেন।

জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম তাদের কাছে গৌণ। ছাত্রদের কিন্তু সংগ্রামেই ঔৎসুক্য ছিল। রাজসাহী কলেজে পড়ার সময় দেখেছি অধিকাংশ ছাত্রই মুক্তি-সংগ্রাম ব্যতীত জাতীয় উন্নতির অন্য কোন সংজ্ঞা মানতে বা গ্রহণ করতে চাইতেন না। সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের তারা সমর্থন করতেন।

তবে সক্রিয় কর্মীর সংখ্যা খুব কমই ছিল। দু'একদিনের জন্য রিভলভার রেখে দেওয়া কিংবা কোন পলাতক বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করতেন না। রাষ্ট্র ও সমাজের ধারণা ছিল অনেকটা মধ্যযুগীয়; প্রগতিশীল বুর্জোয়া চেতনাও তখন এখানে আসে নাই। অধ্যাপকগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন মাত্র। মালদহে কাজ করার সময় শহরে ও গ্রামে অনেক যুবককে দলে ভিড়ানো সম্ভব হয়।

কাজ ভালই চলছিল এমন সময় এল কলকাতায় যাওয়ার আহ্বান।

মালদহেও অন্যান্য জেলার মতো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে ইংরাজ অধীনতা

বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল। এই পেটিবুর্জোয়ার ছেলেরাই বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের উৎসস্বরূপ।

কলকাতা মুসলমান পাড়া লেনে একটি কাজে ('এ্যাকশন') অংশগ্রহণের জন্য এখানে আসি ১৯১৪ সনের নভেম্বর মাসে।

এক জবরদস্ত শত্রুকে নিধন করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই আহত হই। আই বি পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার বৈঠকখানায় দুটি বোমা নিক্ষেপ করা হয় ২৫শে নভেম্বর। দেহরক্ষী হেড কনেস্টেবল গুলিভরা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়েছিল দুয়ারের সম্মুখে মরল কিন্তু সে-ই আগে। বিপুল শব্দে বোমা দুটি পর পর ফাটল - ঘর অন্ধকার হয়ে গেল, আসবাবপত্র সব টুকরা টুকরা হয়ে গেল। সমস্ত বাড়ি কেঁপে উঠল। তিনজন গুপ্তচর বৈঠকখানা ঘরে আহত হয়ে অজ্ঞান—উপরতলা থেকে মরণের আর্তনাদ উঠল। যাকে উদ্দেশ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত হল তিনি মুহূর্তপূর্বে চেয়ার ছেড়ে উপরে উঠেছিলেন। দোতালায় উঠবার পথে সিঁড়িতে জ্যান্ত অবস্থায় স্বামীকে দেখেই স্ত্রী নাকি কেঁদে বললেন 'ওগো এবার চাকরী ছাড়। কাজ নেই আমাদের বড় চাকরীর গৌরবে।' আমরা আহত দেহে ছুটে যাই।

আমাদের নিক্ষিপ্ত বোমার টুকরা প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে আমাদেরই দেহে বিদ্ধ হয়।

বোমার বিকট শব্দে বহু লোক রাস্তায় ভীড় করেছে। তাদের জিজ্ঞাসা,—'হ্যাঁ গা, এ কিসের শব্দ? তোমরা দৌড়াচ্ছ কেন?' দ্রুতপদে চলতে চলতে বলি, 'দেখতে যাই কোথায় কি হল', হ্যারিসন রোডের উপর উঠতেই, কে বলে উঠল, জার্মানী বোমা মেরেছে নিশ্চয়, এ তারই আওয়াজ, কেউ কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে। কিছু না দেখে বলছে ডায়মণ্ডহারবারে জার্মান জাহাজ থেকে বোমা মেরেছে - এ তারই শব্দ।

দুর্দান্ত কুখ্যাত বসন্ত চাটার্জি এবারও বেঁচে গেলেন, এর পূর্বে ঢাকায় তাকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল—এবারও তাই। তৃতীয় বারের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। সে কথা পরে।

বোমা মেরে ছুটে যাওয়ার পথে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলের নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন।

আমার হাতে পায়ে ও বুকে ছিটকে আসা বোমার টুকরার রক্তাক্ত ক্ষত জামাকাপড়েও রক্তের চিহ্ন।

হ্যারিসন রোডের উজ্জল আলোতে রাস্তা পার হতে পারছি না। বা

লোকের কৌতূহল দৃষ্টি এড়িয়ে যাই কেমন করে। হাতে আছে রিভলভার। তাড়াতাড়ি সরে পড়া দরকার। বোমার বিপুল আওয়াজে রাস্তায় বহুলোক দাঁড়িয়ে গেছে। লোক যত বাড়তে লাগল ততই বেশী সুযোগ বুঝা গেল। ভীড়ের মধ্যে রাস্তা পার হয়ে গলির মুখে গিয়ে পড়লাম। পা থেকে রক্ত ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা। লোকে আলো নিয়ে তা দেখছে আর বলছে, না-এপথ দিয়েই তো তাজা রক্তের চিহ্ন দেখছি। লোকগুলি মাথা নুয়ে রক্তের ফোঁটাগুলি অনুসরণ করছে বিস্মিত-কৌতূহলে, আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ফোঁটাগুলি দেখছি। এ যে আমারই পায়ের রক্ত ঝরে পড়ছে, বহুলোকের মধ্যে পাগুলির দিকে কারো দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি ওই তাজা রক্তের ফোঁটাগুলির দিকে।

আমি প্রমাদ গুণছিলাম। কয়েকজন পুলিস অফিসার গাড়ি থেকে নেমে আসছেন দেখে সকলের দৃষ্টি সেদিকে গেল। সেই সুযোগে আমি কিছুটা দ্রুত পদক্ষেপে গলির ভিতরের দিকে চলে যাই; রক্তের ফোঁটা পড়তেই থাকে। খানিকক্ষণ হেঁটে পায়ের যন্ত্রণায় একটা বাড়ির অন্ধকার বারান্দায় বসে পড়লাম। পায়ে হাত দিয়েই অকস্মাৎ শিউরে উঠলাম। হাত পা যেন অবশ হয়ে গেল। যেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখানে আঙুল ঢুকিয়ে দেখি প্রায় সমস্ত আঙুল দুটোই ভিতরে চলে গেল আর একটা কঠিন বেদনা ও জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এতক্ষণ উত্তেজনায় বুঝতেও পারিনি যে, এত গভীর আঘাত। অবসন্ন দেহে এলিয়ে পড়লাম। গায়ের গরম চাদর ছিঁড়ে পায়ে চেপে ধরলাম, চাদর ভিজে গেল কিন্তু রক্ত বন্ধ হয় না। পাশ দিয়ে একটা রিক্সা যাচ্ছিল, ডেকে বল্লেম, 'ভাই আমাকে নিয়ে যাও, টাকার জন্য ভেবো না, তোমাকে খুশি করে দেবো।' জনবিরল পথে আমার কথা শুনে রিক্সাওয়ালা কি একটু ভেবে নিল। বল্লে, 'আপকা ক্যায়া হুয়া বাবু'। উত্তর দিই, 'রাস্তায় একটা জোর হোঁচট খেয়েছি, তাই চলতে পারছি না।' গায়ের চাদর ছিঁড়ে ক্ষতস্থান চাপা দিয়ে ধরে রিক্সায় উঠলাম। নিকটবর্তী আড্ডায় যেয়ে পৌছে দেখি অন্য বন্ধুরাও পৌছে গেছেন। রাজসাহী পার্টির কালি মৈত্রও বোমার টুকরোয় বেশী আহত হন, নগেন সেন তো ধরা পড়ে গেছেন। আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। রক্ত বন্ধ করে ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুইয়ে দিলেন। সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করি।

নগেন্দ্র সেনগুপ্ত হাইকোর্টের বিচারে খালাস পেলেন। তিনি ধনী পরিবারের ছেলে, মিশনারী সাহেব তাকে বিলাতে পাঠিয়ে দেয়; বাংলার

গভর্নরের কাছে নাকি স্বীকার করেন যে বসন্ত চাটার্জীর হত্যা-চেষ্টায় তিনি ছিলেন।

পরদিন আমাকে বেশ পরিপাটি ভদ্র পোশাকে সজ্জিত করে ব্যাণ্ডেজের উপর গরম মোজা পরিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির মতো ধরাধরি করে উচ্চশ্রেণীর গাড়ির কামরায় উঠিয়ে বিপ্লবী বন্ধুরা আমাকে রাজসাহী নিয়ে যায়। শিয়ালদ স্টেশনে ডিটেকটিভ পুলিসের চোখের উপর দিয়েই গাড়িতে উঠি। রাজসাহী সাইন্স (কলেজ) হোস্টেলে এক ছাত্রের ভাই হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম? ব্যথার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ি। বোমার টুকরা বুঝি পায়ের ভিতর ছিল। সরকারী এসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন এসে দেখেই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। বিশ্বাসযোগ্য গল্প তৈরী করে ডাক্তারকে বুঝানো হয়েছিল। নিজের তাড়াতাড়ির গরজে চলতি ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে খোয়াভরা রাস্তায় পড়ে পা কেটে যায়। বন্ধুরা আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে নারাজ—যদি সমস্ত ফাঁস হয়ে যায়। ডাক্তারও হাসপাতালে না নিয়ে কিছু করতে অ িচ্ছুক।

অবশেষে ঠিক হল, সকালে ডাক্তার আসার সময় হাসপাতালে নিয়ে যাবে, ডাক্তার দেখার পরেই রোগীকে নিয়ে আসবে। ডাক্তার কিছু সন্দেহ করে পুলিসে খবর দেওয়ার যাতে সুযোগ না পায় তার জন্য এই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। টেবিলে শুইয়ে ক্ষতস্থান দেখে এসিস্টাণ্ট সার্জন বলেন, এতো খোয়ার আঘাত মনে হয় না। পোড়া লোহার টুকরা ও পোড়া ছাইয়ের মতো কি যেন বেরুচ্ছে। আমি তখন জ্ঞান হারিয়েছিলাম? ডাক্তার করসেপ দিয়ে কি সব বার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তিনি আমাকে হাসপাতালে রেখে দিতে চেয়েছিলেন; কলেজের ছাত্রগণ অনুরোধ করে আমাকে মেসে নিয়ে এলেন। এক মাসেরও অধিককাল অচল হয়ে ছিলাম। আঘাত সেরে ওঠার পর আবার মালদহে ফিরে গিয়ে কাজে লেগে গেলাম। অন্যান্য আহত বন্ধুরাও তখন সেরে উঠেছেন।

এর পূর্বে ময়মনসিং জেলায় একটি বড় রকমের "এ্যাকশন"এর জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মী আনা হয়। নির্দেশের গোলমালে আমার শহরে পৌছতে দেরি হয়ে যায়। তখন কর্মীরা সকলে রওনা হয়ে গেছেন। তখন আর কিছু করার ছিল না। আমি ক্ষুণ্ণ মনে ঢাকা হয়ে ফিরে যাই। আমার ঠাকুরদা আনন্দ চক্রবর্তী (পাকড়াশী) ঢাকার বড় উকিল এবং বামপন্থী জাতীয়তাবাদী। তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি সানন্দে আমাকে গ্রহণ করেন। আমার নামে

গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট আছে জেনেও তিনি আমাকে একদিন থাকতে বলেন। রাত্রিতে নির্জনে বসে আমাকে বলেন, এখন যুদ্ধ চলছে। ইংরাজ জার্মানদের কাছে হারছে; এ-সময় তোমরা সশস্ত্র বিপ্লবীরা কিছু করলে ভাল হত। এমন সুযোগ তো আর সব সময় আসে না। আমি বলি, কিছু চেষ্টা হচ্ছে। পরে জানা যাবে। আমার ঠাকুরদা অনুশীলন পার্টির সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনুশীলনের পুরানো নেতারা তখন জেলে—পুলিন দাস, নরেন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ পার্টির দক্ষ পরিচলকগণ দ্বীপান্তরে। তাতে তিনি খুবই দুঃখিত। গিরিজা বাবু প্রভৃতি নতুন পরিচালকগণ দেশব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করছেন কিনা তা তিনি জানেন না। আমার ঠাকুরদার ইচ্ছা যে এ মহেন্দ্রক্ষণে বিদ্রোহের মতো একটা কিছু করা একান্তই দরকার। বৃদ্ধ দাদার সদিচ্ছা শুনে আমি খুশী মনে উত্তরবঙ্গে ফিরে গেলাম এবং ঠাকুরদার মনোভাব নেতাদের বললেম।

বিপ্লবী দলের বিস্তার—
বোমা তৈরি—বড়লাট হার্ডিঞ্জ-এর উপর বোমা

১৯১৩-১৪ সালে ইউরোপে যুদ্ধায়োজন চলছে। জার্মানীর ভারতীয় বিপ্লবীরা এবং আমেরিকায় 'গদর পার্টি' (ভারতীয় বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের 'বিদ্রোহী'দের পার্টি) এই যুদ্ধায়োজনের আঁচ পেয়ে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছেন ও ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছেন।

এ-সময় এ-দেশের বিপ্লববাদী দলগুলি যথারীতি দলগঠন ও সংগ্রামী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কলকাতা রাজাবাজারে শশাঙ্ক হাজরা এক বিশেষ ধরনের বোমা প্রস্তুত করছিলেন। শশাঙ্ক বা অমৃত হাজরা চন্দননগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঢাকার অনুশীলন দলের সঙ্গে চন্দননগর দলের মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপনের কাজে প্রচুর সহায়তা করেন।

চন্দননগর দলের সঙ্গে রাসবিহারী বসুর সংযোগ ছিল। কাজেই ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর দলও রাসবিহারী বসুর সঙ্গে একত্র হওয়ায় অনুশীলন দলের বিস্তৃতি সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবে ও উত্তর-

প্রদেশে বিপ্লবী দল গঠন করছিলেন। অনুশীলনের উৎসাহী কর্মী শচীন সান্যাল বেনারসে ভাল দল সংগঠিত করে উত্তর ভারতের অন্যান্য জিলায় দলের প্রসারতা বৃদ্ধি করেন। শচীন সান্যাল ও রাসবিহারী বসুর মিলনে অনুশীলন দলের সংগঠন চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অমৃত লাল হাজরার বোমার কারখানায় পুলিস হানা দেয়। আমি এ-দিন রংপুর জিলা থেকে শিয়ালদ স্টেশনে নেমে অতি প্রত্যূষে রাজাবাজারে অমৃত হাজরার বাসায় পৌছি। পৌছেই দেখি পুলিস এ-দিক-ওদিক দাঁড়িয়ে। আমি গেটে ঢুকতেই পুলিস আমাকে চ্যালেঞ্জ করে। আমি ব্যাপার বুঝে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে অপর এক আড্ডায় গিয়ে এ ঘটনা জানাই। বোমা তৈরির সরঞ্জাম সহ ধরা পড়ায় অমৃত হাজরা পনেরো বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। অপর চারজন হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি লাভ করেন।

১৯১৩-১৪ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় অনুশীলন দলের সেরা বিপ্লবী নেতারা ধরা পড়ে যান। নরেন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য, মদন ভৌমিক এবং আরো অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ ছিল তাঁদের নামে।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্দীপনা জাগানোর জন্য এবং সশস্ত্র সংগ্রামই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়; অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা লাভের দৃষ্টান্ত সহ তা প্রতিপন্ন করে স্বাধীনতা ও Liberty নামক বাংলা ও ইংরাজী দু'খানা পুস্তক ছাপিয়ে হাজারে হাজারে বিক্রি করা হতো। একই তারিখে বাংলা হতে পাঞ্জাব পর্যন্ত সর্বত্র স্কুল-কলেজ-বোর্ডিং, মেসে-হোস্টেলে, দেয়ালে, ল্যাম্প-পোস্টে, হাটেবাজারে ও স্টেশনে লাগিয়ে দেওয়া হতো। দলের ছাত্ররা বিপদের ঝুঁকি নিয়েই উৎসাহভরে এ-কাজ করতেন। ধরা পড়ে কারাদণ্ড ভোগের ঘটনাও আছে। এই পুস্তিকা সারা দেশের যুবক চিত্তে সংগ্রামের সাহস ও কর্ম প্রেরণা যোগাত। বিপ্লবী সংগঠন শক্তিও লোককে অনুপ্রাণিত করত। সরকারী কর্মচারীরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজকীয় শোভাযাত্রায় হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করে দিল্লী প্রবেশকালে বোমা নিক্ষেপ করে তাকে হত্যার চেষ্টা হয়, লাটসাহেব বোমার আঘাতে আহত হন। জনতার ভীড়ের মধ্যে বোমা নিক্ষেপকারী সরে পড়েন। পুলিস জনসাধারণের উপর অত্যাচার করেও কাহাকেও ধরতে পারে নাই। এর পর সারা দেশব্যাপী সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের খোঁজ খবর করতে থাকে। তার ধাক্কা আমাদের পল্লী অঞ্চলেও লাগে।

আমার বাড়িতে গিয়ে পুলিস আমার খোঁজ খবর করে। আমি বাড়ি নাই কেন —কখন বাড়ি ছেড়ে গিয়েছি, কোথায় গিয়েছি ইত্যাদি প্রশ্ন করে আমার বাবাকে উত্যক্ত করে। বাবা আমার খবর কিছুই জানেন না বলায় তাকে যথেষ্ট অপমান করে যায়।

লাট সাহেবেরও উপর বোমা নিক্ষেপের হদিশ পাওয়ার জন্য পুলিস হন্যে হয়ে ঘুরছে।

বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুকে ধরার জন্য ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। দেশীয় রাজ্যের রাজারাও পুরস্কার ঘোষণা করায় মোট একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। রাসবিহারী বসুকে পুলিস গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হল না। ধরপাকড় ও পুলিশী অত্যাচার চলতে থাকে চারদিকে। পুলিস বুঝতে পারে যে রাসবিহারী বসুই বড়লাটের ওপর বোমা-নিক্ষেপের নায়ক। শেষ পর্যন্ত পুলিস কয়েকজন বিপ্লবীকে ধরে দিল্লীতে 'রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র' মামলা দায়ের করে। তাঁদের অতি নিষ্ঠুর দণ্ড দেওয়া হয়—বসন্ত বিশ্বাস, আমীর চাঁদ, অবাধ বিহারী ও বালমুকুন্দ এই চারজনের ফাঁসি হয়। বালরাজের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। এঁরা সকলেই শিক্ষিত যুবক এবং জনপ্রিয় কর্মী ছিলেন। এ ছাড়া আর দুজন পুলিসের অত্যাচারে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন।

বালমুকুন্দের পূর্বপুরুষ 'মতিদাস'কে আরঙজেব যেখানে করাত দিয়ে কাটেন সেই স্থানেই বালমুকুন্দ হাসতে হাসতে ফাঁসি গেলেন।

অস্ত্র সংগ্রহের কথা ও মসার পিস্তল

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব অবধি বাংলার বিপ্লবী দলগুলি লক্ষ্যে অবিচল থেকে ধীর গতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। অস্ত্রের অভাব তাদের সকল প্ল্যান ও কর্মোদ্যোগ ম্লান করে দিত। প্রথম যুগে ফরাসী চন্দননগর থেকে কিছু পিস্তল-রিভলভার পাওয়ার সুযোগ ছিল। বিদেশী চোরাকারবারীদের নিকট থেকে ডবল দামে পিস্তল রিভলভার কিনতে হত। সরকারী কর্মচারীদের বাড়ি থেকেও মাঝে মাঝে অস্ত্র চুরি করার সুযোগ এসে যেত। কলকাতার ফিরিঙ্গিরা অভাবে পড়লে রিভলভার বিক্রী করে দিত—সন্ধান রাখলে তাও 'দু'একটা হস্তগত করা যেত।

গোপনে কেনা, চুরি করে সংগ্রহ করা অথবা ডাকাতির সময় ধনী মালিকের

বন্দুক বা পিস্তল কেড়ে আনা ছাড়া অস্ত্র পাওয়ার অন্য উপায় ছিল না। দেশী মিস্ত্রীরা নমুনা দেখে তৈরী করতেও পারত বটে তবে তা বেশী কাজের হয়নি।

১৯১৪ সালের শেষ ভাগে শক্তিশালী কতকগুলি পিস্তল একযোগে পেয়ে গেল একটি বিপ্লবী দল, সে-কথা পরে।

সংগৃহীত অল্প সংখ্যক অস্ত্রই বিভিন্ন জিলায় পাঠিয়ে কাজ (action) করা হত। সাহস, আক্রমণ কৌশল ও প্রচুর কর্মী থাকা সত্ত্বেও কোন বিপ্লবীদলই সামান্য মাত্র অস্ত্র সম্বল করে বড়রকম প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারেনি। প্রচুর অস্ত্র পাওয়া গেলে ছোট ছোট ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিসের ঘাঁটি আক্রমণ করা ও খণ্ড যুদ্ধ করা সম্ভব হতো। বিপ্লবীদের অস্ত্রাভাববোধ পীড়াদায়ক মনে হত। রাউলাট কমিটির রিপোর্টে লেখা হয়েছে "যথেষ্ট অস্ত্র সরবরাহ হলে বাংলা দেশে ভয়াবহ কাণ্ড সংগঠিত হত।" বোমা দিয়ে দেশে খুবই সন্ত্রাসবাদী আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে—ডিনামাইট বসিয়ে লাট সাহেবের গাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। বোমা মারা হত বলে বিপ্লবীদলকে তখন বোমার দলও বলত। ক্ষুদিরাম প্রথম বোমা ফাটিয়ে রাজকর্মচারী ও পুলিসের মনে বোমাতঙ্ক সৃষ্টি করেন ও দেশবাসীর মনে শক্তি, সাহস ও উৎসাহ যোগান।

বিপ্লবীরা বোমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল প্রথম থেকেই। বিদেশ থেকে বোমা তৈরি শিক্ষার জন্য এদেশের বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস ফ্রান্সে যান। পরে এ দেশেই নানা ধরনের শক্তিশালী বোমা তৈরীর চেষ্টা সফল হয়।

১৯১৩ সালে কলকাতায় অমৃত হাজরা বোমা তৈরির সরঞ্জাম সহ ধরা পড়েন। তিনি নিজে এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। 'রাজাবাজার টাইপ' বোমা ও 'আলিপুর টাইপ' বোমার কথা রাউলাট-সিডিসন কমিটির রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে। রাজাবাজার টাইপ বোমা বড়লাটের উপর নিক্ষেপ করা হয়। চন্দন-নগরেও বোমা তৈরীর কারখানা ছিল। রাজাবাজারে অমৃত হাজরার তৈরী বোমা কলকাতা, লাহোর, দিল্লী, সিলেট, ময়মনসিং ও অন্য জিলায় বিদীর্ণ হয়— অমৃত হাজরার মামলায় কোর্ট এই মন্তব্য করেন। শ্রীহাজরার ১৫-বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। বিভিন্ন দল পিক্রিক এসিড দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বোমা তৈরী করত। কোনো কোনো গুপ্ত কারখানায় Nitro Explosives, Hand book of Modern Explosives বিস্ফোরক প্রস্তুত প্রণালীর বই পাওয়া গেছে। (Sedition commitsee Report.)

মসার পিস্তল

কলকাতার বন্দুক ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর আমদানী শক্তিশালী মসার পিস্তলগুলি হাওড়া স্টেশন থেকে অপূর্ব কৌশলে হস্তগত করা বাঙ্গলায় বিপ্লব ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রডা কোম্পানী জার্মানী থেকে মসার পিস্তল আমদানী করে এদেশের বড়লোক ও রাজা-রাজড়াদের কাছে বিক্রি করে মোটা মুনাফা লুঠ করে। কোম্পানীর একটি বাঙালী কর্মচারীকে মাল খালাস করে আনার জন্য স্টেশনে পাঠানো হয়—সে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের কথা। বিশ্বযুদ্ধ তখন আসন্ন। বাঙালী বাবুটি এক চালান অস্ত্র ডেলিভারী নিয়ে বের হয়ে আসেন—তাতে ৫০টা মসার পিস্তল ও ৪৬ হাজার বুলেট ছিল। ভদ্রলোক কিন্তু মালগুলি নিয়ে কোম্পানীর অফিসে ফিরে গেলেন না। খোঁজ খবর করে বুঝা গেল বিশ্বস্ত কর্মচারীটি অস্ত্র বোঝাই মাল সহ উধাও।

পুলিস বহু গরুর গাড়ির পিছনে লেগে বউবাজার মলঙ্গা লেনে হাজার হাজার পিস্তলের বুলেট পেয়ে গেল। কিন্তু অনেক ধরপাকড় ও খানাতল্লাস করে একটি মসার পিস্তলও বের করতে পারল না। জার্মানীর তৈরি 'মসার (Mouser Pistol) অতি শক্তিশালী পিস্তল। এগুলি পেয়ে বিপ্লবীরা দুর্ধর্ষ সাহসী হয়ে উঠেছিল। সুন্দর কারুকার্য-খচিত মসৃণ যন্ত্রটির যে এত বিধ্বংসী ক্ষমতা, না-জানলে তা বুঝার উপায় নাই। সহজেই এ পিস্তলের ট্রিগার টানা যায়। '৪৫০ বোর ('450 bore) এর রিভলভারের ট্রিগার টানতে হাতের কব্জির জোর চাই। যে কাঠের ফ্রেমে পুরে 'মসার' কোমরে বেঁধে চলা যায়, দরকার মতো সেই ফ্রেম খুলে পিস্তলের বাটে লাগিয়ে আবার একে মসার-রাইফেল বন্দুক রূপে কাঁধে তুলে ধরা যায়। বিপিন গাঙ্গুলির দল এ-অস্ত্র সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন দলের মধ্যে ৫০-টি মসার পিস্তল ভাগ করে দেওয়া হয়। এর পর প্রায় প্রতিটি আক্রমণে এই পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছিল। মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয় যে, '৫০-টা মসার পিস্তল বাঙ্গলা গভর্নমেন্টকে প্রায় অচল করে তুলেছিল।'

বজবজ জাহাজে বিদ্রোহী শিখদের উপর ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণ

১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় শোনা গেল যে শিখের রক্তে বজবজের গঙ্গাজল রঞ্জিত হয়ে গেছে। 'কোমাগাটামারু' জাহাজে শতশত পাঞ্জাবী কেনাডায় যায়। সেখানে তারা অবতরণ করার অধিকার না-পেয়ে বিক্ষুব্ধচিত্তে ভারতে ফিরে আসছিলেন। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট তাদের কোন সাহায্য না করায় শিখ যাত্রীরা ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এ-সময় আমেরিকায় 'গদর' পার্টির লোকেরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণ করে ভারতে গিয়ে বিদ্রোহ আরম্ভ করার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করেন। শিখরাও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ফিরে আসলেন ভারতে। বজবজ সমুদ্রের মোহানায় 'কোমাগাটামারু' জাহাজ ভিড়ল উত্তপ্ত মানসিক অবস্থার মধ্যে। বিদ্রোহের উদ্দীপনায় ভরপুর শিখযাত্রীরা শুনলেন তাদের বন্দী করে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বন্দুক কাঁধে সৈন্যও দাঁড়িয়ে—স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত—শিখরা পদব্রজে হেঁটে যাওয়ার জন্য আগুয়ান হতেই ব্রিটিশ সৈন্য গুলি চালায়। শিখরাও নামার পথে পিস্তল চালালেন জাহাজ থেকে ও নীচে থেকে। স্বাধীনতাকামী বীর শিখদের অনেকেই হতাহত হলেন—যাঁরা রক্তাক্ত দেহে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওখানেই ব্রিটিশ সৈন্যের বন্দুকের গুলিতে তারা নিহত হন। শিখ নেতা গুরুজিৎসিং ও অনেক শিখ পালিয়ে যায়। পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব আহত হয়, অন্য দুজন সেনানায়ক নিহত হয়।

বাকী অনেককে তালাবন্ধ ট্রেনে পাঞ্জাব পাঠিয়ে দেয়। 'ওয়াগুরুজী কি ফতে' 'হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে বন্দীরা কলকাতা থেকে লাহোরে যায়। সেখানে সশস্ত্র সেনাদল তাদের অভ্যর্থনা করেন পুলিসের হাতে দিয়ে।

যুদ্ধ—ভারতে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রচেষ্টা

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বাজার দখলের দ্বন্দ্বে পূর্ব থেকেই যুদ্ধ বাধার উপক্রম বুঝা গিয়েছিল। বিদেশে ভারতের বিপ্লবীরা ঝড়ের লক্ষণ দেখে আগে থেকেই ইংরাজের শত্রু জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্যে অস্ত্র সাহায্যের চেষ্টা করছিলেন। জার্মান সরকার প্রথমে

ভারতের বিপ্লবীদের অযোগ্য মনে করে আমল দেয় নাই। পরে তাদের আগ্রহ, বিদ্রোহ করার শক্তি ও সংগঠনের কথা জ্ঞাত হয়ে, কি ভাবে সাহায্য দেওয়া যায় তা বিবেচনা করতে থাকেন। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথমেই ইউরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। জার্মানী, অস্ট্রীয়া হাঙ্গারী ও ইটালী একদিকে, ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়া অপরদিকে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কেউ এপক্ষে কেউ ও-পক্ষে যোগ দিল। পরে পৃথিবীর সকল বড়বড় রাষ্ট্রশক্তিগুলিই যুদ্ধে নেমে পড়ে। ইউরোপের যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

জার্মানী পরাধীন ভারতের শত্রু ইংলণ্ড আক্রমণ করাতে ভারতবাসী উল্লসিত হয়। যুদ্ধে ইংলণ্ড মার খেলে ভারতের ভাগ্য ফিরবে, লোকের মনে এরূপ আশার উদ্রেক হয়। জার্মানী আগে থেকেই শক্তিমান হয়ে ব্রিটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল, সম্প্রতি ইংলণ্ড-ফ্রান্স মিত্রপক্ষের পশ্চাদপসরণ করার খবরও আসছিল। কাজেই আমাদের দেশের সকলেই ইংলণ্ডের পরাজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে।

দিনের পর দিন জার্মান আক্রমণে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়া নাজেহাল। বড় বড় মেল জাহাজগুলি বিলাত থেকে ভারতে আসার পথে ভূমধ্যসাগরে জার্মান টর্পেডোর আঘাতে ডুবে যেত। ভারত মহাসাগরে জার্মান ডুবো জাহাজের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলে—ডায়মণ্ডহারবার, পুরী, মাদ্রাজ ও অন্যান্য সমুদ্র তীরবর্তী বন্দরগুলিতেও টর্পেডোর আঘাত। কলকাতায় পুলিস কর্মচারীর উপর সন্ত্রাসবাদীর নিক্ষিপ্ত বোমার আওয়াজও কলকাতায় লোকের মনে জার্মান আক্রমণের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডের সাগরোপকূলেও জার্মানী আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপ করে নির্বিঘ্নে চলে যায়। এই প্রথম এক দেশের বোমারু বিমান অন্য দেশে গিয়ে বোমা ফেলে এল। সর্বশক্তিমান ইংলণ্ডেশ্বরের অধীন ভারতে শত্রুর সাবমেরিন আক্রমণ, ভারতে আসার পথে বিলাতের জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া—এসব অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে দেখে দেশজোড়া চাঞ্চল্য—কানাকানি। এবার আর ইংরাজ রাজত্ব থাকবে না ; এমনি আশা ও বিশ্বাস জনমনে বদ্ধমূল হয়ে উঠল।

আমরাও ব্যস্ত। এক কুখ্যাত ধনীর বাড়িতে অর্থ লুঠের সম্পর্কে আমাকে অনতিবিলম্বে ময়মনসিংহে যেতে হয়। তখন প্রচুর অর্থের দরকার। ঢাকা ও কলকাতা হয়ে রাজসাহী ফিরে যাই। দেশের সর্বত্র লোকের এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেছে যে, ইংরাজ আর এদেশে রাজত্ব করতে পারবে না। আমার ঠাকুরদা ঢাকার জাতীয়তাবাদী প্রবীণ উকিল আনন্দ পাকড়াশীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে

তিনি বলেছিলেন, ইংরাজ দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে—এবার তোমরা কিছু চেষ্টা করলে সহজেই সাফল্য লাভ করতে পার। এ সুযোগ তোমরা ছাড়বে না আশা করি। অন্য একজন আমাদের সমর্থক উকিল বলেছিলেন, মাহেন্দ্রক্ষণ বয়ে যাচ্ছে, এ-সময় আপনারা কি নীরব থাকবেন?—আমরা যে ভিতরে ভিতরে কিছু করার চেষ্টায় আছি তা তখন প্রকাশ করা যায় না। হাসিমুখে বিদায় নিলাম। সাবধানে চলা-ফেরার কথা বলে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন। আমাকে মালদা জেলায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে যেতে হল। রাজসাহী কলেজ ছেড়ে মালদহে এলাম। মহানন্দার তীরে বসে ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে বিপ্লবীদলের কাজ কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হতো। মালদহ জাতীয় বিদ্যালয়ের ভাল ছেলেরা সকলেই আমাদের দলের সঙ্গে ছিল। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় শিল্প উন্নতির প্রচেষ্টাকেই প্রকৃত দেশের কাজ মনে করতেন। বিনয় সরকারের চিন্তাধারায় তারা পুষ্ট। সন্ত্রাসবাদীদের বিরোধী ছিলেন। মালদহ জিলায় কাজ ভালই চলছিল।

এমন সময় এল কলকাতা যাওয়ার নির্দেশ। চঞ্চল ও উৎসুক মনে রওনা হলাম কলকাতা অভিমুখে। আমাকে দুজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী বলে দিলেন, শীঘ্রই ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে—প্রস্তুত হয়ে থাকুন, কতকগুলি গুরুতর বিষয় জেনে আমাদের সত্বর জানান থানা কয়টি—কোন থানায় কটি বন্দুক? কটি লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক-পিস্তল আছে। কটি বন্দুক-রিভলভার এ মাসেই ছিনিয়ে আনা সম্ভব, কত টাকা এখনই সংগ্রহ করতে পারেন, কতজন লোক নিয়ে এক এক জেলার পুলিস লাইন, অস্ত্রাগার ও ট্রেজারী দখল করা সম্ভব, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সবল সাহসী কর্মী আছে কিনা প্রতি এলাকায়।

সমগ্র উত্তরবঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতির জন্য রেল-লাইনগুলি ওপড়ানো, টেলিগ্রামের তার কাটা, স্থলপথ ও জলপথ অবরোধ করার কার্যকরী প্লান দিতে হবে। বিপ্লব কেন্দ্রের কাজে সাহায্য করার জন্য কত জন সাহসী কর্ম-কুশল সুস্থ সবল স্থিরচিত্ত কর্মী কেন্দ্রে পাঠানো সম্ভব তাও ঠিক করে রাখতে হবে, যাতে খবর পাওয়া মাত্র চলে যেতে পারে যার যার নির্দিষ্ট স্থানে। বিদ্রোহের সংগ্রাম কি ভাবে চলবে তার কোন প্রকৃষ্ট পন্থা বুঝা গেল না। বিদ্রোহে সাঁওতালদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় কোন উত্তর দিতে পারি নাই। সাঁওতালদের মধ্যে আমরা কোন কাজ করি নাই, পরিচিত যা আছে তা অতি

সাধারণ। ওরা এক সময় বিদ্রোহ করেছিল, অনেক লোক গুলিতে ও ফাঁসিতে মরেছিল। এখন ইংরাজ সরকারের কঠোর জলুম অত্যাচার, জমিদার-মহাজনের শোষণ-পীড়ন তাদের একেবারে পিষ্ট ও দলিত করে রেখেছে।

বিভিন্ন জিলার চিঠিপত্র নিয়ে উদ্দীপ্ত মনে কলকাতা থেকে রওনা হলেম—রাজসাহী, কুচবিহার, দিনাজপুর, রংপুর ও কাটিহার হয়ে মালদহে ফিরে এলাম; সত্বর প্রস্তুত হয়ে থাকার কথা বলে দিয়েছিলেন বিশেষ করে।

আমাদের কর্মতৎপরতা বেড়ে গেল। উৎসাহ উদ্দীপনায় সকলের মন ভরপুর, রক্তের হোলির রাঙা উৎসবের প্রতীক্ষায় আছেন বিপ্লবী কর্মীরা। রাজসাহী শহরের নিকটবর্তী সুরুলের নিবিড় জঙ্গলে যুবকগণ সন্ধ্যার অন্ধকারে কুচকাওয়াজ অভ্যাস করতে, গুলিচালনা ও নিশানা ঠিক করতে অভ্যাস করেন। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার রণকৌশল শেখার জন্য 'বর্তমান রণনীতি' ও 'গেরিলা যুদ্ধ প্রণালী' 'Quick training for war' ইত্যাদি পুস্তক পড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। বন্দুক চুরির হিড়িক পড়ে যায় জেলায় জেলায়। পাছে গভর্নমেণ্ট সব বন্দুক হস্তগত করে ফেলে এ আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি কাজ সারার নির্দেশ এসেছিল।

অনুশীলন দল পাঞ্জাবের দলের সঙ্গে বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর মাধ্যমে যোগ স্থাপন করে বিদ্রোহের আয়োজনে কাজ করছিলো। বাংলার নেতৃদ্বয় নগেন্দ্র দত্ত (গিরিজা বাবু) ও অনুকূল চক্রবর্তী—বাংলা, বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলের বেনারস-এলাহাবাদ অবধি যাতায়াত করছেন। তারা দুজন ও বেনারসের নেতা শচীন সান্যাল প্রস্তুতিকার্যে ব্যস্ত। তাদের গতিবিধি জানা দুষ্কর, দেখা পাওয়া সাধারণ বিপ্লবী কর্মীদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। প্রধান নেতা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে ফরাসী চন্দননগরে মিলিত হয়ে তারা বিদ্রোহ আরম্ভ করা সম্পর্কে সাংগঠনিক ও গেরিলা সংগ্রাম বিষয়ক কর্তব্য স্থির করেন। তারপর স্ব স্ব এলাকায় চলে যান। শচীন সান্যাল খুব কর্মতৎপর। তিনি কথাবার্তা শেষ করেই কলকাতা হয়ে পাটনা ও বেনারস অভিমুখে ছুটে চলে যান।

বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ পেয়ে বিপ্লবীদলের কর্মীদের উৎসাহ আর ধরে না। লোকচক্ষুর অন্তরালে কর্মীদের চাঞ্চল্য আর কর্মব্যস্ততা।

রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সমগ্র উত্তরব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। নগেন্দ্র দত্ত ও অনুকূল চক্রবর্তী বাংলা, বিহার ও আসামের কার্যভার গ্রহণ করেন। রাসবিহারী এই সশস্ত্র বিদ্রোহ-অভিযানের সর্বাধিনায়ক। শচীন সান্যাল ছিলেন

উত্তর ভারতে তার সহকারী। চন্দননগরের মতিলাল রায় পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ঢাকা সশস্ত্র সেনাবাহিনীতে তখন শিখ সৈন্যরা ছিলেন। লাহোরের শিখ সৈনিক নেতা ঢাকার সেনা শিবিরে সংযোগ স্থাপনের পরিচয়-পত্র পাঠিয়ে দেন। ঢাকায় বিপ্লবী নেতা ঐ চিঠি নিয়ে শিখ সেনার সঙ্গে দেখা করেন। ওদের নেতৃস্থানীয় দুজন নাকি সমস্ত খবর জেনে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য ঔৎসুক্য দেখায়।

জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের বার্লিন কমিটির খবর নিয়ে সত্যেন সেন ও আমেরিকায় 'গদর পার্টি'র নেতা বিষ্ণুগণেশ পিংলে কলকাতায় আসেন। তারা জার্মানীর অস্ত্র সাহায্যের খবর নিয়ে আসেন। পিংলে ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ বিপ্লবী বুদ্ধিসম্পন্ন সুন্দর, সবল, বিপ্লবীনায়ক। পিংলে কাশীতে গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিদ্রোহের নানা তথ্য জেনে নিয়ে কাজে লেগে পড়েন। জার্মানী থেকে অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ আসার খবর রাসবিহারীকে জানান। তাঁরা উভয়ে কাশীতে বিপ্লবী নেতাদের এক গোপন বৈঠক আহ্বান করেন। বাংলা, মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বাছা বাছা বিপ্লবী নেতারা কাশীতে শচীন সান্যালের সতর্ক ব্যবস্থায় একত্র মিলিত হয়ে আলোচনা করেন, বিদ্রোহের কার্যসূচী স্থির হয় এবং ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের (armed rising) তারিখও স্থির হয়।

আর লাহোর কেন্দ্র হতেই বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্কেত সকল স্থানে জানিয়ে দেওয়া হবে। বিভিন্ন সেনা-শিবিরে সৈন্যদের বিদ্রোহের অনুকূলে আনার প্ল্যান হয়। তখন ভারতে ইংরাজ সৈন্য ছিল মুষ্টিমেয়। দেশীয় সৈন্য সংখ্যাও কম ছিল, বহু সৈন্য বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়। যারা ছিল তারা অফিসারদের অসদ্ব্যবহারের জন্য খুব অসন্তুষ্ট। সুতরাং বিভিন্ন সেনা-ব্যারাকে গিয়ে সহজেই সৈন্যদের বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়েছিল। অস্ত্র সংগ্রহ, সরকারী ট্রেজারী লুঠ ও বোমা তৈরির ব্যবস্থা; রেললাইন ও তার কাটার ব্যবস্থা; এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থির হয়। রাসবিহারী বসু ও পিংলে—বিপ্লবী নেতৃদ্বয়—বাংলায় ও পাঞ্জাবে বোমা তৈরির ব্যবস্থা করেন। পাঞ্জাবের ও উত্তর ভারতের সকল সেনানিবাসে গুপ্ত সমিতির কর্মীরা সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একযোগে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালাতে থাকেন। পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলেও বিদ্রোহের প্রচার

ব্যবস্থা করা হয়। সেনানিবাসে, ছাত্রাবাসে ও গ্রামে বিপ্লবাত্মক প্রচার-পত্র বিলি করা হয়।

স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ভারত (Independent Republic of India) ঘোষণা করে এবং স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উদ্ভাবন করে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ঘোষণা-পত্র রচিত হয়।

বাংলাদেশেও আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম। মধ্যবিত্ত ছাত্র ও যুবকগণও উত্তেজিত। কিভাবে কি করা,—তা কেউ জানে না। গ্রামের লোক, কৃষক, শহরের সর্বসাধারণ ও কলের শ্রমিক সকলেই আবেগ উচ্ছ্বাসে উদ্বেল কিন্তু কারো কোন সংগঠন নাই, দিনের পর দিন জার্মানীর আক্রমণে ইংরাজ সৈন্যের পরাজয়ের খবর এসে ভারতের শোষিত নিপীড়িত জনকে পুলকিত ও উল্লসিত করে তুলছে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে বিপ্লবী দলের লোকেরা প্রচার করে দিলেন এবার আর মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাই হবে না। যুদ্ধের সময় এ গুজব চাঞ্চল্য সৃষ্টির পক্ষে খুব সহায়ক হল।

ঝড়ের পূর্ব লক্ষণের মতোই রাষ্ট্রীয় ঝড়ের লক্ষণগুলি ভারতের অধিবাসীদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দ্রুত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছিল, ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে 'লোকে সন্দিহান' হয়ে উঠেছিল, সকল বিষয়ে একটা অনিশ্চয়তা বোধ প্রকট হয়ে উঠছিল।

সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দুঃসময়েই ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করার সুসময় বুঝে ভারতের বিপ্লবী নেতারা প্রস্তুত হচ্ছিলেন। জার্মানরা ব্রিটিশ শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য সর্বত্রই বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাচ্ছিল। ভারতের বিপ্লবী নেতারা চেষ্টা-উদ্যোগ করে জার্মানীর সাহায্য দানের স্বীকৃতি আদায় করেন।

পাঞ্জাবের সুশিক্ষিত নেতা হরদয়াল ও শিখ বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার 'গদর পার্টি' মহারাষ্ট্রীয় কর্মবীর পিংলে ও সত্যেন সেনকে পাঠিয়ে বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগস্থাপন করেন। জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের বার্লিন কমিটিতে ডঃ ভূপেন দত্ত, প্রফেসার বব তুল্লা, ডাঃ মনসুর, ওবেদুল্লা সিন্ধী, বীরেন চ্যাটার্জী প্রভৃতি অনেকেই তখন ব্রিটিশের শত্রু জার্মানীর সাহায্য নিয়ে ভারত স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ রাশিয়া আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ ঘুরে ঐ একই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেন। এদেশের

রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন শিক্ষিতেরা যুদ্ধের সময় বিপ্লবীদলের উপর অনেকখানি ভরসা করেছিলেন। কংগ্রেসী নেতারা এ বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। বিধি সঙ্গত পথ ছেড়ে সংগ্রামাত্মক পথের উচু পর্যায়ে তারা উঠতে সাহস পান নাই। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন নেতা আমাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন।

বিদ্রোহ প্রচেষ্টার আসল খবর আমরা তখন বেশী জানতাম না। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশই বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলার বিপ্লবীরাই বাংলার বিদ্রোহের দায়িত্ব নেবে, বাংলায় পশ্চিমের মতো সেনা বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল খুব কম।

রাসবিহারী বসু ও অন্যান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল।

আমেরিকার পাঞ্জাবী ও ভারতীয়েরা যুদ্ধের আগে থেকেই ভারতে বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে গদর পার্টি গড়ে কাজ করতে থাকেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় জার্মানী ও সুইডেনে ভারতীয় বিপ্লব কমিটি স্থাপিত হয়। 'গদর পার্টি'র সঙ্গে জার্মানীর ভারতীয় বিপ্লব কমিটির যোগাযোগে জার্মানীর অস্ত্র সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভারতে অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিদ্রোহের অস্ত্র সাহায্য আসার খবর নিয়ে আমেরিকা থেকে ভারতে খবর পাঠানো হয়। আমেরিকা, সাংহাই, হংকং ও সিঙ্গাপুর থেকে হাজার হাজার শিখ প্রবাসী ভারতীয়রা বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে ফিরে এসেছিলেন।

বিশ হাজার রাইফেল ও হাউইটস্যার কামান, দু হাজার পিস্তল হাত-বোমা (granade) ও বিস্ফোরক পদার্থ, লক্ষ লক্ষ কার্তুজ ও বুলেট ইত্যাদি জাহাজে প্রেরিত হবে এরূপ খবর এসেছিল। লক্ষাধিক টাকাও জার্মান থেকে আসার কথা। পর পর ৪।৫ খানা অস্ত্র বোঝাই জাহাজ বঙ্গোপসাগরের তীরে বিশেষ বিশেষ স্থানে নামিয়ে দেওয়ার জন্য আমেরিকা থেকে পাঠানো হয়েছিল। জার্মানীর প্রেরিত ঐ অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ কিন্তু ভারতে এসে পৌঁছায়নি। পথেই ইংরাজ শত্রুর হাতে পড়ে যায়। কোন কোন জাহাজের ভারতীয় আরোহীদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী উত্তর ভারতে পাঞ্জাবে ও বাংলায় বিদ্রোহ আরম্ভ করার নির্ধারিত তারিখ সমাগত প্রায়। পশ্চিমাঞ্চলে রাসবিহারী ও

পিংলে, উত্তর প্রদেশে শচীন সান্যাল প্রভৃতি কয়েকজন, বাংলায় গিরিজা বাবু (নগেন দত্ত) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের এঁরা আসন্ন বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলকে মৃত্যুপণ করে সংগ্রাম করতে বলেন।

বাংলার বিপ্লবীরা সুসংবাদের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল কিন্তু বিদ্রোহের সংবাদ এসে পৌছাল না। প্রত্যাশিত আগুন জ্বলল না।

লাহোরে বিদ্রোহ ঘোষণার খবর পুলিসের নিকট প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল একজন সেনাবাহিনীর কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিস লাহোরে খুব তৎপর হয়ে দ্রুতগতিতে খানাতল্লাশ ও ধরপাকড় শুরু করে। অনেক লোক বহু অস্ত্র ও বোমা সহ গ্রেপ্তার হয়। কোথাও কোথাও গুলি চলে, উভয় পক্ষেই হতাহত হয়। সারা উত্তর ভারতে পুলিসী সন্ত্রাস চলতে থাকে।

যুদ্ধ—ভারতে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রচেষ্টা (২য়)

বিপ্লবী নেতা যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অন্যান্য মিলিত দলগুলিও বিদ্রোহ করার জন্য বিদেশ হতে অস্ত্র আমদানীর বিশেষ চেষ্টা করেন। নরেন ভট্টাচার্য ও অন্য দু'একজন অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করতে বিদেশে প্রেরিত হন। হাজার হাজার রাইফেল, বন্দুক, অন্যান্য অস্ত্র ও লাখ খানেক টাকা নিয়ে জার্মান সাহায্যে 'মাভেরিক' জাহাজ আসছিল ভারতে। একদল বিপ্লবী ১৯১৫ সালের জুন মাসে সুন্দরবনের 'মঙ্গলদৈ' সমুদ্র খাঁড়ীতে নৌকা নিয়ে দিনের পর দিন জাহাজের প্রতীক্ষায় বঙ্গোপসাগরের পানে তাকিয়ে ছিল। তারা জানতেন না যে, তাদেরই প্রত্যাশিত অস্ত্র-জাহাজ দোভার ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে গেছে। বিদ্রোহের প্ল্যান ছিল :—কলকাতার দল নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবে। যতীন মুখার্জী মাদ্রাজ রেলপথ ও ভোলানাথ চাটার্জী বি. এন. রেলওয়ে ধ্বংস করে দেবে। সতীশ চক্রবর্তী ই. আই. রেলওয়ের অজয় সেতু উড়িয়ে দেবে। যদু গোপাল মুখার্জী ও অতুল ঘোষ সুন্দরবনে জাহাজ থেকে অস্ত্র ডেলিভারী নেবে। এ-বিদ্রোহ প্রচেষ্টা চলেছিল যতীন মুখার্জীর

অধিনায়কত্বে। সেদিনে রেলরাস্তা না-থাকলে সৈন্য চলাচল কঠিন ছিল। এরোপ্লেন তখনো তেমন চালু হয় নাই।

বিদ্রোহের পরিকল্পিত কর্মসূচী কল্পনাতেই রয়ে গেল। সুযোগ ছিল যথেষ্ট। ভারতে ইংরাজ সৈন্য তখন প্রায় সকলেই যুদ্ধে চলে গিয়েছিল। এ সময়ে বিদ্রোহ শুরু হলে কোথায় যে এর শেষ হ'ত বলা কঠিন হলেও মনে রাখা দরকার অভাব, দারিদ্র্য ও হতাশায় নিমজ্জিত জনসাধারণ একটা বিরাট ঝড়ের জন্য উন্মুখ হয়েছিল —পরিবর্তন আসছে, বিরাট পরিবর্তন। এ-মানসিক অবস্থার মধ্যেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সাধারণ জনগণের বিদ্রোহ প্রশমিত করা সহজসাধ্য হয় না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Federal Republic of India) ঘোষণা দ্বারা স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করার কথা ছিল।

সব চেষ্টা ব্যর্থ -লাহোর বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশ করে দেয় একজন সৈনিক। অনেক বৎসর পর তাকে হত্যা করা হয়। বোমা, অস্ত্র, ঘোষণাপত্র, পতাকা ও বহু সাজসরঞ্জাম সহ অনেক বিপ্লবী ধরা পড়ে যায়। লাহোর ও নিকটবর্তী বিপ্লবী ঘাঁটিতে, বাড়িতে ও সেনানিবাসে চলল তল্লাসী, গ্রেপ্তার,—কোথাও বা পুলিসের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে উভয় পক্ষেই হতাহত হয়।

সারা উত্তর ভারতে সংবাদ চলে গেল। সর্বত্র পুলিস তৎপর - বন্দুক, মেশিনগান সজ্জিত স্টেশন, রাস্তা ও সেনাব্যারাক। অস্ত্রাগারের চাবি সব গোরা সৈন্যের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়।

লাহোরে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনের মামলায় অনেক শিখের ফাঁসি হয়। বিপ্লবী নেতা পিংলে মীরাট সেনা ব্যারাকে ধরা পড়েন। তার সঙ্গে যে শক্তিশালী বোমা ছিল ভারত গভর্নমেণ্টের মতে উহা 'অর্ধেক রেজিমেণ্ট নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে'। এই নেতা পিংলে ও কর্তার সিং-এর ফাঁসি হয়। তাছাড়া বিভিন্ন লাহোর বিশেষ বিচারে শতাধিক সংগ্রামী বীরের ফাঁসি হয়। বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্টেও সামরিক বিচারে অনেক সৈনিককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

ফাঁসি, গুলি, দ্বীপান্তর দণ্ডে শত শত লোক দণ্ডিত হয়। হাজার হাজার পাঞ্জাবীদের জেলে ও গ্রামে আটক করা হয়।

কল্পিত আশা ও বিশ্বাস নিয়েই আমরা দাসত্বের বিরুদ্ধে পরাধীনতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য মেতে উঠেছিলাম। মৃত্যুভয়ে বিপ্লবীরা ভীত ছিলেন না।

সশস্ত্র সংগ্রামে মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তেই আনন্দ। কিন্তু উদ্যোগ, আয়োজন সব ব্যর্থ হয়।

রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিদেশে চলে গেলেন। অনেকে দেশেই আত্মগোপন করে রইলেন। নেতা যতীন মুখোপাধ্যায় বালেশ্বর বুড়ী বালামের তীরে ইংরাজ সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করে বীরের মতো জীবন বিসর্জন দিলেন।

সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলেও, একটা ব্যর্থ সংগ্রামেরও প্রয়োজন ছিল: আমাদের আত্মদানে জাতি আরো বেশী সচেতন হত, আত্মবিশ্বাসী হত। প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকে সহজ, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করত। জাতির কাছে আমরা মরণের কারণকে বড় করে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারতাম, দেশের জন্য রক্তদানের জীবন্ত এক আদর্শ রেখে যেতে পারতাম। আজ অতীত স্মৃতি-কথা লিখতে বসে এ-কথা বলছি না, তখনই আমরা এই ধরনের আলোচনা করেছি। এই ছিল আমাদের সেদিনের দুরন্ত আশা, বুকভরা সান্ত্বনা। কেবল জল্পনা-কল্পনা, আলোচনা ও উদ্যোগ-আয়োজনেই বিদ্রোহের অবসান হয়ে গেল। সংগ্রামের উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য যেমন নবজীবনের সাড়া এনেছিল, কিছু না হওয়ায় তেমনি নৈরাশ্য ও অবসাদে ডুবিয়ে দিল আমাদের সকলকে। সত্যিই সেদিন মহান মৃত্যুর রঙীন এক নেশা আমাদের পাগল করে তুলেছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই গোপনে বিতরিত "স্বাধীনতা" পুস্তিকায় কয়েক লাইন পৌরাণিক কবিতা উদ্ধৃত করে যুবকদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা হয়:

"না হইতে মাগো বোধন তোমার,
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট।
জাগো মা রণচণ্ডী জাগো মা আমার,
আবার পূজিব তব চরণতট।"

সকল কাজেই মহড়া দরকার হয়। আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধেরও এই হল মহড়া। আমাদের এবারকার ব্যর্থতা একটা মহড়া মাত্র; আবার এতে ভবিষ্যৎ সাফল্যও সূচনা করে। সেদিন আমাদের আশা ও উৎসাহভঙ্গের এইটুকু ছিল সামান্য সান্ত্বনা।

আঘাত দেওয়ার পূর্বে শত্রুর আঘাতে আমরা কাবু হয়ে পড়ি। এর পর কয়েক মাসের মধ্যেই আয়র্লণ্ডে ঈস্টার বিদ্রোহ হয়। আয়রিশ বিদ্রোহীরা ডাবলিনে বিদ্রোহ ক'রে ব্রিটিশ শত্রুকে আঘাত দিতে সক্ষম হয়।

বিদ্রোহ আয়োজনে টাকা চাই

টাকা না হলে সব প্ল্যান অচল। স্বাধীনতা সংগ্রামের আয়োজনের জন্য প্রাথমিক খরচের টাকা চাই। অস্ত্র সংগ্রহ ও বিপ্লবী সংগঠন গড়ায় খরচ প্রধান খরচ। কে দেবে টাকা? যাদের ধন আছে ব্যয় করে না অথবা সৎ কাজে ব্যয় করে না তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে দেশের কল্যাণে সে-ধন ব্যয়িত হবে। আয়র্লণ্ডের বিপ্লবীরাও তা করেছে; রুশিয়ার বিপ্লবীরাও তা করেছে। অতীত ইতিহাস থেকে এসব নজির বার করা হয়েছিল দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সন্দেহ অপনোদনের জন্য। কেউ কেউ গোপনে অর্থ সাহায্য করত কিন্তু তা অতি সামান্য। ফেব্রুয়ারী মাসে গার্ডেন রীচ বার্ড এণ্ড কোং-এর মিলের টাকা নিয়ে যাচ্ছিল; এ দল যুবক ট্যাক্সি গাড়ি থেকে পিস্তল উঁচিয়ে আঠারো হাজার টাকা নিয়ে কলকাতা চলে আসে। কয়েকদিন পর বেলেঘাটায় এক চালের মহাজনের ২০,০০০ টাকা নিয়ে যুবকেরা ট্যাক্সি গাড়িতেই সরে পড়ে। যুদ্ধের সময় ট্যাক্সি ডাকাতি নূতন উপদ্রব হয়ে দেখা দিল কলকাতায়, পুলিস তো শিশু। রাজসাহী জিলায় একটি বড় ডাকাতি হয়। ব্যাপারটি ঘটে নাটোর মহকুমার ধারাইল গ্রামে এক ধনী মহাজনের বাড়িতে। লগ্নী কারবারে মহাজনের বিপুল ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয়েছিল, গরিবদের সর্বস্বান্ত করে সুদ আদায় করে বলে অখ্যাতিও তার অনেক। স্বদেশী-ডাকাতদল খোঁজ-খবর নিয়ে বুঝল এ-বাড়ির টাকা লুটে নিলে গ্রামের লোক সুখীই হবে। এমন কুলোকের সাহায্যে কেউ আসবে না। কিন্তু সাবধানের মার নাই; যদি পল্লীবাসীরা এসে বাড়ি ঘেরাও করে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৩৫ জন যুবককে একত্র করে হাফ-প্যান্ট ও কোর্তা পরিয়ে মসার পিস্তল-রিভলভারে সজ্জিত করে নিয়ে যাওয়া হয়। এ-আক্রমণেরও পন্থা এবং কৌশল আছে। জনবহুল পল্লীতে গ্রামের মাঝখানে মহাজনের বাড়ির আশেপাশে অসংখ্য মুসলমান কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাসিন্দা আছে। প্রবেশ করার কৌশল বিবেচনা করে নিতে হবে পূর্বেই। গ্রামের ম্যাপ, বাড়িতে ঢুকবার অলিগলি, ঝোপ-জঙ্গল, খাল, রাস্তা ইত্যাদির ঠিক ঠিক তথ্য জানা চাই। থানা, টেলিগ্রাফ অফিস, রেল-স্টেশন কতদূর, কখন গাড়ি পাওয়া যায় ইত্যাদি। আক্রমণের নিয়ম হল, যারা আক্রমণ করে ফিরে যাবে, তারা একেবারে খালি হাতে যাবে; টাকা, অস্ত্র কিছুই সঙ্গে নেবে না। পূর্বেই অস্ত্রাদি ও টাকা বিভিন্ন বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে রেখে যেতে হবে। মাল ডেলিভারী নেওয়ার জন্য এই কাজেই পরক্ষণেই নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে

লোক অপেক্ষা করবে। টেলিগ্রাফ তার কাটার দরকার হলে তার কাটতে যাবে কয়েকজন। নৌকায় যাতায়াত করার প্রয়োজন হলে নদীপথের রাস্তা জানা দরকার। শুধু একটি রাস্তা নয়; নদী, খাল বিল দিয়ে যত দিকে বেরিয়ে যাওয়ার যত রাস্তা আছে সব জানা চাই। নৌকো বেয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো দলের লোক বাছাই করে আনতে হয়। আক্রমণের ক্ষেত্রে অনেক রকম কাজ আছে; প্রত্যেকটি কর্মীর ঝোঁক, আগ্রহ ও যোগ্যতা বুঝে তাকে সেই কাজে লাগাতে হবে। এমনি ধারা আরো বহুদিক আছে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর যার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়। শান্ত, স্থির, ধীর লোকের দ্বারা কাজ ভাল হয়। সাহসী কিন্তু চঞ্চল লোক সব ভণ্ডুল করে দেয়। সকল দিক বিবেচনা করে কাজ করে বলেই পুলিস অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক-হত্যা ও ডাকাতির কোনো কিনারা করতে পারেনি। বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে তালে তালে কুচকাওয়াজ করে যুবকগণ ঐ ধনী-মহাজনের বাড়িতে যায়। মহাজনের পেয়াদা-পাইকরা গ্রামের একদল লোককে উত্তেজিত করে ডাকাত ধরতে আসে।

একজন একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে উত্তেজিত গ্রামের জনসাধারণকে শান্ত করে দিল। স্বদেশীওয়ালাদের কাণ্ড বুঝে অনেকে নিঃশব্দে সরে পড়ল। যারা তারপরও লাঠি, ইট, শড়কী ছুঁড়ে মারছিল তাদের মধ্যে দু'জন সামান্য জখম হতেই বাকী সকলে সরে পড়ল। বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে জাতীয় ধ্বনি দিয়ে আমরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। এখানে ২৫,০০০ টাকা পাওয়া যায়। মহাজনের দরোয়ান প্রবেশ পথে রুখে দাঁড়ালে তাকে গুলি করে মারা হয়। সংগৃহীত টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র সহ ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আমাদের রাজশাহী শহরে পৌঁছতে হয়। ট্যাক্সি বা মোটর গাড়ি সেদিনে দুর্ঘট ছিল। সাধারণত টাকা ও অস্ত্র ইত্যাদি পৃথকভাবে পাঠানোর নিয়ম। এক্ষেত্রে উপযুক্ত রাখার স্থান না হওয়ায় সঙ্গে করে নিতে হয়েছিল।

ব্যর্থতার পর

যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের আয়োজনে কর্মতৎপরতা দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহ-চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তারপর বাঙলার বিপ্লবী-সমিতিগুলি বে-পরোয়া সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আরম্ভ করে দেয়। একদিকে সরকারী

দমননীতি, অন্যদিকে মুক্তিপ্রয়াসীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে। কংগ্রেস তখন নিষ্ক্রিয়। প্রেসিডেন্ট কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন: এখনো আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করার সময় আসেনি। কোনো কোনো নেতা সৈন্য-সংগ্রহ করার কাজে গভর্নমেন্টকে তখন সাহায্যও করছেন।

১৯১৫ সনের মার্চ মাসে ভারতরক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনে রক্ষণের নামে ভক্ষণের বিধান দেওয়া হল। কত খানাতল্লাস, গ্রেপ্তার, অত্যাচার, নির্যাতন, বিশেষ দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ ঘটেছে এই ভারতরক্ষা আইনের বলে।

আই. বি. পুলিস ইন্সপেক্টার সুরেশ ব্যানার্জী একদিন সকালবেলা হেদুয়ার মোড়ে ট্রামে উঠবার সময় বিপ্লবীর গুলিতে প্রাণ হারায়। মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে এক বাড়িতে পুলিস কর্মচারীদের বৈঠকে গুলি চলে। পুলিস কর্মচারীরা দৌড়িয়ে উপরতলায় যাওয়ার সময় যুবকগণ পিছু ধাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজন হত ও ২।৩ জন আহত হয়। ময়মনসিংহে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট যতীন ঘোষ মসার পিস্তলের গুলিতে নিহত হন। কলেজ স্ট্রীটে মেডিক্যাল কলেজের সামনে টিক্‌টিকি (ডিটেক্‌টিভ) পুলিসের দারোগা মধুসূদন ভট্টাচার্যকে বেলা ১০টার সময় যুবকগণ হত্যা করে। ফুটপাথের চল্‌তি পথিকদের চোখের ওপর তারা নির্বিঘ্নে কাজ সেরে চলে গেল।

বাংলার আই. বি. বিভাগের বড়কর্তা বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যা করার চেষ্টা হয় প্রথমবার ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে, দ্বিতীয়বার কলকাতা মুসলমান পাড়া লেনে, তৃতীয়বার ভবানীপুরে। তৃতীয়বারে নামজাদা ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব সত্যি সত্যিই সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। আগে পাছে সশস্ত্র, সতর্ক প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়েও শেষ পর্যন্ত জীবনরক্ষা হল না। লোকে বলত বিপ্লবী-দলের ছেলেগুলি কি যাদু জানে? কেউ তাদের রোষ থেকে রক্ষা পায় না। বিকাল বেলা কলকাতার রাস্তায় কত লোক,—পাশেই একটা ফাঁকা জায়গায় ছেলেরা ফুটবল খেলছে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট স্বয়ং পিস্তল হাতে সতর্ক,—তাঁর রক্ষীদের হাতেও অস্ত্র। তবু দুজনই বিপ্লবীর গুলিতে প্রাণ হারাল। একজন পালিয়ে গেল। পূর্বে তাঁকে লক্ষ্য করে দুটো বোমা ছোঁড়া হয়। তাতে তাঁর দেহরক্ষী ও আত্মীয় ১জন মারা যায়। তারও পূর্বে ঢাকায় গুলি করার ফলে তাঁর অনুচর মারা পড়ে, তিনি নিজে রক্ষা পান। এবার আর রেহাই পেলেন না। এই সম্পর্কে বাংলার লাট বলেছিলেন, তিন-তিনবার চেষ্টা করে দুর্ধর্ষ এনার্কিস্টরা একজন রাজকর্মচারীকে

হত্যা করে যে একরোখামীর পরিচয় দিল তার যথোপযুক্ত প্রতিবিধান আবশ্যক। এরপর থেকে বিপুল উদ্যমে পুলিস জুলুম চলতে থাকে, অসংখ্য যুবক বন্দী হয়, অসংখ্য নিরীহ লোক পুলিসের টানা হেঁচড়ায় লাঞ্ছনা ভোগ করে। অসংখ্য যুবককে মারধর, নির্যাতন করে কথা আদায় করার চেষ্টা হয়। কঠোর নির্যাতনেও বিপ্লবীরা দমেনি। যুদ্ধের সময় ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সরকারী সাক্ষী, বহু আই· বি. পুলিস, গুপ্তচর কলকাতা ও মফস্বলে হতাহত হয়।

জোর করে ধনীলোকের অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে বিপ্লবী-সমিতি সংগঠন এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয় করা একটা সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। কলকাতার বুকের ওপর মোটর ডাকাতি একটি নূতন ঘটনা। গার্ডেনরীচ থেকে বার্ড এণ্ড কোং-এর ১৮০০০ টাকা নিয়ে ট্যাক্সিতে পিস্তল উঁচিয়ে বিপ্লবী যুবকরা সরে পড়েন। কয়েকদিন পরই বেলেঘাটার এক চালের মহাজনের গদী থেকে বাইশ হাজার টাকা নিয়ে গাড়ি চলে যায়। কয়েকমাস পর কর্পোরেশন স্ট্রীট থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে যায়। কিছুদিন পর পরই 'মোটর-ডাকাতি' হতে থাকে। পুলিস বিশেষ ব্যবস্থা করেও মোটর আরোহী স্বদেশী ডাকাতদের ধরতে পারেনি। সুচিন্তিত কার্যকরী প্ল্যান, উপস্থিত বুদ্ধি, গতির ক্ষিপ্রতা এবং ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার কৌশল তাদের ছিল। কলকাতার কর্পোরেশন স্ট্রীট, নদীয়ার শিবপুর ও প্রাগপুর, ত্রিপুরার হরিপুর ও করতালা, ময়মনসিংহের চন্দ্রকোণা, রংপুরের কুরুল (১৯১৫), ত্রিপুরায় গণ্ডোরা ও নাটঘর ; ফরিদপুরের ধানুকটি ; ময়মনসিংহের শইলদ (১৯১৬); ঢাকার আবদুল্লাপুর (১৯১৭) ইত্যাদির ডাকাতিগুলি উল্লেখযোগ্য। ১৯১৬ সালে ত্রিপুরা জেলায় "ললিতেশ্বর" ডাকাতিতে রাজসাহী কলেজের ছাত্র প্রবোধ ভট্টাচার্য মারা যায়। হাফ্ শার্ট, হাফ্ প্যান্ট পরিহিত গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ যুবকটিকে লোকে সাহেব বলে মনে করেছিল। কলকাতার বুকের ওপর যখন ক্রমাগত রাজনীতিক খুন-ডাকাতি হচ্ছিল—যখন বিদেশের যুদ্ধ আর স্বদেশের সন্ত্রাসবাদের উপর লোকের আশা-ভরসা, তখন জার্মানীর দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হল—কলকাতায় অরাজকতা চলছে।

বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর রাসবিহারী বসু দেশ ছেড়ে জাপানে পালিয়ে যান। শচীন সান্যাল ও গিরিজাবাবু বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী প্রমুখ নেতারা বাংলার বাইরে গিয়ে আত্মগোপন করে কাটান। অনুশীলন পার্টির সর্বজনপ্রিয় নেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী উদ্যোগ পর্বের

প্রথমেই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান জেলে প্রেরিত হন।

বিপ্লবী-বীর যতীন মুখোপাধ্যায়

যতীন মুখোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানে বাংলার পুলিস বালেশ্বর যায়; বিদ্রোহের প্রয়োজনে তিনি সে অঞ্চলে তখন অবস্থান করছিলেন।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ময়ূরভঞ্জ স্টেটের জঙ্গলে একদল বাঙালী যুবকের সঙ্গে মিলিটারী পুলিসের সংঘর্ষ হয়। পাঁচজন পিস্তল নিয়ে বহুক্ষণ অবধি প্রতিপক্ষকে হয়রান করে। পরে তারা পুলিস বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। তারপরও চলে উভয়পক্ষে গুলি। অনেকে হতাহত হয়। বিদ্রোহী দলের নেতা যতীন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মী চিত্তপ্রিয় রায় বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে শত্রুর গুলিতে জীবন বিসর্জন করেন (৯ই সেপ্টেম্বর)। অপর তিন জন আহত হয়ে বন্দী হয়,—দু'জনের ফাঁসি হয়, একজন আন্দামানে পাগল হয়ে পাগলা গারদে মারা যায়। দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের জন্য পাঁচটি অমূল্য জীবনের এমনি করে অবসান হল। একদল সশস্ত্র যুবক নিয়ে বিপ্লবী বীর যতীন মুখোপাধ্যায়ই বাংলায় প্রথম সংগ্রাম করেন সশস্ত্র পুলিসের বিরুদ্ধে। বিপ্লবী নেতা যতীন মুখোপাধ্যায়ের খণ্ডযুদ্ধে মৃত্যু দেশের কর্মপ্রাণ যুবকদের কাছে জীবনের সাড়া নিয়ে আসে। অপর এক নেতা নরেন ভট্টাচার্য জাভা থেকে আমেরিকায় পালিয়ে যান। বিপিন গাঙ্গুলী আগড়পাড়া ডাকাতিতে রিভলভার সহ ধরা পড়েন।

মালদহ

মালদহে মহানন্দার তীরে এখনো বেড়াই—রাজনীতির কথা আলোচনা করি। জেলার সর্বত্র ছাত্রদের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সংঘবদ্ধ করাই আমার কাজ। মালদহে সন্ত্রাসবাদমূলক হাঙ্গামা ছিল না বলে ওখানে অস্ত্র রাখার গুদাম করা হয়। বাইরে থেকে এনে বিশ্বস্ত ও সাহসী ছেলেদের বাড়িতে এইসব

"জিনিস" রাখা হত। পিস্তল, রিভলভার কার্তুজ ইত্যাদিকে আমরা "জিনিস" বলতাম। মসার পিস্তল দেখে একটি ছেলে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সুন্দর কারুকার্য খচিত আয়নার মতো স্বচ্ছ, মসৃণ ও ঝকঝকে এ অপূর্ব জিনিসটি কি? এরই নাম মসার পিস্তল শুনে যুবকটি বিস্মিত হয়েছিল এবং বলেছিল, এমন সুন্দর জিনিস এত বড় ধ্বংসকর হতে পারে কি? মালদহ জেলার বিপ্লবী-সংগঠন তখন উত্তরবঙ্গে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এ-সংগঠনের কাজে জেলার সর্বত্র ঘুরতে হয়েছিল—কাটিহার, রাজমহল, পাকুড়, বহরমপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী স্থানেও যাই। যুবক বন্ধুদের নিয়ে কখনো গৌড় পাণ্ডুয়ার অতীত ধ্বংসাবশেষ দেখতে যেতাম। আলালের জমিদার পুত্রের সঙ্গে একবার হাতী চড়ে পাণ্ডুয়ায় যাই। আমার সঙ্গে ছিল মসার পিস্তল। মনে পড়ছে এই পিস্তল দেখে সে বলেছিল, এ পিস্তলে কোনই কাজ হবে না। আমি খাপের ভেতর থেকে পিস্তলটি বার করে তার বাঁটের হুকের সঙ্গে খাপটি লাগিয়ে যখন মসার রাইফেল করে কাঁধে তুলে নিলাম, তখন সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। পরে এই ছেলেটি মালদহ জেলার স্কুলের হেডমাস্টারকে হত্যা করার অপরাধে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। হেডমাস্টার বাবুকে পুলিসের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা হত। তিনি আই. বি. পুলিসের সঙ্গে পরামর্শ করে স্কুল পরিচালনা করতেন, স্কুলের ছেলেদের পকেট ও বই-পত্র তল্লাশ করতেন। প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে এমন একটি ছাত্রের পকেট থেকে তিনি "Tilak's Speeches" (তিলকের বক্তৃতাবলী) নামক একটি বই পান। হেডমাস্টার বাবু ছাত্রটিকে ১০ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে ছাত্রটিকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করার সুপারিশ করেন। হোস্টেলে কড়াকড়ির আর অবধি ছিল না; ছাত্রদের উপর নজর রাখার জন্য হেডমাস্টার বাবু তাঁর নিজস্ব ছাত্র-গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন। কয়েক মাস পূর্বে কুমিল্লা জেলা স্কুলের হেডমাস্টারকে অনুরূপ কারণে হত্যা করা হয়। মালদহ স্কুলে বা জেলায় ছাত্রদের কোন সংঘ-সমিতি ছিল না। শহরে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। বৈধ উপায়ে কোনো আন্দোলন করে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করার কোনো পন্থা না থাকায় সন্ত্রাসবাদ স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিম মালদহের বাচামারী, ন'ঘরিয়া, রতুয়া প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট গুপ্ত-সমিতি ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের আধা হিন্দি ভাষার মিশ্রিত কথা শুনতে বেশ কৌতুক হত। সাধারণ লোকের কোনো রাজনৈতিক চেতনা ছিল না।

কলকাতা থেকে আমাকে বরিশাল জেলার এক পল্লীগ্রামের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য পাঠানো হয়। উত্তর সাবাজপুর ও ইদিলপুরে দল-গঠনের কাজ তার আনুষঙ্গিক। কয়েক মাসের মধ্যেই পুলিস গোপনে আমার নামধাম খোঁজ করে গেল। আমার কানেও সে গোপন খবর এল। তখন আর সেখানে থাকা সমীচীন মনে করিনি। গুপ্ত সমিতির আমি গোপন-কর্মী—ফেরারী আসামী। আমার নাম-ঠিকানা সবই কল্পিত। চলে গেলাম বরিশাল শহরে। সেখানে তখন কোনো ভারপ্রাপ্ত লোক নাই ; জেলার কার্য পরিচালনাভার আমার উপরই এসে পড়ে। কলেজের অগ্রণী ছাত্রদের মধ্যে আমাদের প্রভাব ছিল। কোনো কোনো গ্রামের গৃহস্থ ভদ্রলোক ও ছাত্রদল আমাদের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালদহ অপেক্ষা এখানে জনসাধারণের রাজনীতিক চেতনা বেশী—ছাত্র ও যুবকদের স্বদেশ-প্রেম ছিল গভীর, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা উন্নততর। এখানে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' দুটি দলেরই অস্তিত্ব ছিল। বরিশালে ছিল তখন ধর্মাশ্রমের প্রাবল্য। যুবকরা কোনো না কোনো ধর্মাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে। বিপ্লবী যুবকগণও মঠ, আশ্রম বা রামকৃষ্ণমিশন অবলম্বন করে সেবা-সমিতি পরিচালনা করত। ব্যায়ামচর্চা ও বিবেকানন্দের বই পড়ায় ছেলেদের ঝোঁক ছিল খুব। অশ্বিনী দত্ত ও জগদীশ মুখার্জী তখন ওখানকার আদর্শ ব্যক্তি। গুপ্ত-সমিতি ছাড়া কোনো প্রকাশ্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। শিক্ষিত জনসাধারণের অনেকের মনেই মধ্য-যুগীয় চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বরিশাল জেলা থেকে আমি মাদারীপুর, বাগেরহাট ও খুলনায় সংগঠন বিস্তার করতে যাই। বরিশাল জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে যুবক দল গঠন করেছি, বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণের ব্যবস্থা করেছি, অস্ত্রাদিও কোনো কোনো স্থানে লুকিয়ে রেখেছি কিন্তু সবই গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে করতে হয়েছে। পুলিস আমার কোনো হদিস পায়নি। শব্দ যোজনা ও সাঙ্কেতিক কথা দিয়ে কোড (code) তৈরি করে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এতে পুলিসের পক্ষে ধরা কঠিন। নিতান্ত গো-বেচারী অথচ বিশ্বাসী লোকের নামে চিঠি আনাবার ব্যবস্থা করা হত। অনেক ছাত্র ও যুবক গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে আসার জন্য ও গুপ্ত সমিতির কাজ করার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করত। আমরা যেখানে গিয়েছি সেখানেই যুবকগণ আমাদের সাদরে গ্রহণ করেছে এবং তারই ফলে আমাদের কাজের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা হ'ত। ১৯১৭ সালের

প্রথম ভাগে বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় যাই। সরকারী নিপেষণ নীতির প্রয়োগে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি। কলকাতায় যুবকদের বাসা ভাড়া পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত বরিশাল থেকে একটি ভদ্র পরিবার আনিয়ে বাসা করানো হয়—আমরা তাদের বাড়িতে থাকতাম। বিনায়ক রাও কাপলে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী যুবকও সেখানে আমাদের সঙ্গে ছিল। পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের বিদ্রোহের আয়োজনে তার খুব উৎসাহ ছিল। পশ্চিমাঞ্চল থেকে নিরাপত্তার জন্য তাকে বাংলায় আনা হয়।

উল্টোডাঙ্গার বাসায় বসে বসে প্রায়ই আমরা রাজনৈতিক আলোচনা করতাম—সমাজতন্ত্র ভাল কি নৈরাজ্যতন্ত্র (এনার্কিজম) ভাল। বাকুনিনের মত শুনে নৈরাজ্যতন্ত্রই আমার ভাল লাগে। কোনো শাসক শক্তি শাসন যন্ত্র থাকবে না এমন সমাজ ব্যবস্থাই আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী বললেন, "স্বাধীনতাই নাই, এখন তন্ত্র দিয়ে কি হবে?" মার্কসের নাম তখনো আমরা শুনিনি।

দেশ স্বাধীন হলে আমরা কি করব এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হত, বিপ্লব জয়ের পর আমরা জাতীয় গবর্নমেন্টের সেনাবিভাগে প্রবেশ করে দেশ রক্ষায় দায়িত্ব গ্রহণ করব। স্বাধীনতা অর্জনের পর লোকের দুঃখকষ্ট যে আর থাকবেই না সে সম্বন্ধে আমরা কোনই সন্দেহ পোষণ করতাম না। পাশ্চাত্য দেশের মতো কল-কারখানা ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হলে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। ধনীর ধন সম্পদ ন্যায্যভাবে বিতরণ করার ধারণা আমাদের ছিল; আমরা এটা ভারতের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। জমিদারী অত্যাচার ও প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্ববঙ্গবাসীদের যথেষ্ট ঘৃণা ছিল। স্বাধীনতালাভের পর জমিদার গোষ্ঠীকে কঠোর বিধি বিধানে নোয়াতে হবে যাতে তারা প্রজাদের কল্যাণমূলক কাজ করে। স্বদেশী যুগে বিপ্লবীনেতা অরবিন্দ ঘোষ পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি লিখেছেন। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আমরা ঘৃণা করতাম, বলতাম, স্বাধীন ভারতে এমনটি হবে না। মানুষ সৎ হবে সমাজ উন্নত হবে।

গৌহাটির পাহাড়ে লড়াই

১৯১৭ সালে সরকারী নিষ্পেষণ চরমে উঠেছে। হাজার হাজার যুবক ভারতরক্ষা আইনে আটক ও নির্বাসিত; শত শত যুবক কারাগারে, দ্বীপান্তরে। দৈনিক খানাতল্লাশ ও গ্রেপ্তার,—ফেরারী সন্ধানে যথা-তথা পুলিসের হানা। বিপ্লবীদের দূর আত্মীয়-স্বজনও জুলুম, অত্যাচার, ভীতির কবল থেকে রক্ষা পায় না। আমার আত্মীয়-স্বজনও আমার জন্য লাঞ্ছিত হতে লাগল, যদিও আমি প্রায় চার বৎসর বাড়ি ছাড়া, আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক বর্জিত। একবারে আমার নিজ গ্রাম মাধবদীর কাছে কোনও গ্রামে স্বদেশী ডাকাতি হয়। ঢাকা ও নরসিংদীর পুলিস আমার বাড়ি তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করে—ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে চুরে সবকিছু তচ্‌নচ্‌ করে দেয় এবং ইতর ভাষায় আমার বাবা ও অন্যান্য সকলকে গালাগালি করে। গ্রামের ভদ্রলোকদেরও পুলিস অপমান করে। তখন আমি দেশছাড়া। উত্তরবঙ্গে থাকি। দেশের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখি না।

পুলিসের গুপ্তচর পথে ঘাটে, মেসে, স্কুলে-কলেজে, ছাত্রাবাসে—সর্বত্র। ছাত্র, শিক্ষক, রাস্তার মোড়ের পান-বিড়িওয়ালা, জংশন স্টেশনের হোটেলওয়ালা টাকা খেয়ে পুলিসকে সংবাদ দেয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জোর কমে আসছে ভারতরক্ষা আইনের কঠোর প্রয়োগে। হ্রাস পেয়েছে ভীরু স্বভাবের ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির নৈতিক শক্তি।

এমন সঙ্কটকালে পুরানো বিপ্লবী কর্মীদের বাংলায় থাকা আর চলে না; তাই আসামের গৌহাটিতে থাকার একটা আড্ডা করা হয়। অনুশীলন দলের সব সেরা কর্মীরা ওখানে থেকে বাংলায় আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনা করতেন। ডিসেম্বর মাসে আমি সেখানে যাই। সোজা পথে না গিয়ে হাওড়া থেকে মোকামাঘাট, মুঙ্গের, কাটিহার হয়ে লালমনির হাট জংশন দিয়ে আমীনগাঁয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে গৌহাটি পৌঁছি।

গৌহাটিতে আমরা ভাগ হয়েছিলাম দুটি বাড়িতে; আমরা যে একই দলের লোক অন্যে যাতে তা বুঝতে না পারে সেদিকে আমরা সতর্ক ছিলাম। আসামের বিভিন্ন জেলায় কিছু কিছু সংগঠনের চেষ্টাও হয়। বিশেষ বিশেষ কর্মীকে বাংলাদেশ থেকে ডেকে এনে পরামর্শ আলোচনা হত। ওখানে আমরা সাধারণ ব্যবসায়ী রূপে বাস করতাম। স্বহস্তে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করি। প্রত্যেকে

আমরা দুটি করে কম্বল ব্যবহার করি। একটি পেতে শোওয়া অপরটি গায়ে দেওয়ার জন্য। আসামের দারুণ শীতে অবশ্য এ মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু আমরা তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। বিপ্লবীর আরাম সাজে না। কম্বল, গেঞ্জী, শার্ট ও একটি আলোয়ান আমাদের পোশাক; মাথার তলে একটি বালিশও ছিল না। তা ছাড়া পান, বিড়ি, সিগারেট বা চা-পানের কোনো বালাই ছিল না। বিপ্লবী-জীবন আরাম-উপভোগের জীবন নয়। রাণা প্রতাপের ঘাসের রুটি খেয়ে মরু-প্রান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃষ্টান্ত আমাদের মনে গাথা ছিল। অতি সাধারণ-ভাবে দিন অতিবাহিত করতে আমাদের কোনো কষ্ট হত না। এমন অনেক দিন গিয়েছে যখন দুবেলা পেট ভরে খাওয়া জোটেনি—আবার পকেটে টাকা থাকা সত্ত্বেও খরচ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সকালে বা বিকালে জলখাবার কিনে খাইনি। গৌহাটিতে অভাবের সময় আমরা কোনো কোনো দিন সস্তা কমলালেবুর রস খেয়ে কাটিয়েছি।

পুলিসের আক্রমণ আশঙ্কায় প্রতি রাত্রিতে আমরা পালা করে পাহারা দিতাম। কাঠের বাড়ির দোতালায় বাসা। সেদিন রাত্রিতে আমার পাহারা দেবার পালা। পাঁচ-ছ' জন বন্ধু গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে মসার পিস্তলটি হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। খুব শীত। ঘণ্টাখানেক স্থির হয়ে বসে আছি। কত কথা মনে আসে। মনটা ভারাক্রান্ত। জেল খেটে এসে আজ প্রায় পাঁচ বৎসর অবধি এই ছন্ন-ছাড়া জীবন। থাকার কোনো ঠিকানা নেই—কাপড়-জামাও নিজস্ব বলে কিছু নেই, বিছানা নেই। কত জায়গায় ঘুরলাম, কত নাম-ধাম পরিবর্তন করলাম; শিক্ষক, গৃহশিক্ষক, কম্পাউণ্ডার, দোকানদার, ব্যবসায়ী, নৌকোর মুসলমান মাঝি ইত্যাদি কত না বিভিন্নরূপে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে রয়েছি—শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্য—'দেশের স্বাধীনতা'। ভারী ভাল লাগে এ জীবন! আনন্দমঠের 'সন্তান' দলের মতো বিদ্রোহীর দল, বাড়ি-ঘর, স্ত্রী-পুত্র ও স্বজনবর্গ—সব ছেড়ে আসা অপূর্ব এ জীবন। কাজ—কেবল কাজ। রোদ-বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে যায়—শীত-গ্রীষ্ম দেহের উপর দিয়ে যায়। দিনগুলি ফুর্তিতেই কাটে। জীবনে অসাধ নাই, ভয় নাই মরণেরও।

শিবাজীর মাউলী সেনা, রাণা প্রতাপের রাজপুত সেনা, গুরু গোবিন্দের শিখ সেনা এমনিভাবে সর্বত্যাগী হয়েই স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। ইওরোপেও কার্বনারী দল, জেকোবিন দল, সিনফিন ও নিহিলিস্টরা দেশের কল্যাণের জন্য

অসীম বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। আমাদের চেষ্টাই বা সফল হবে না কেন? এও ঠিক যে, আমাদের অনেক সহকর্মী আজ কারাগারে, দ্বীপান্তরে। ইংরাজ আমাদের সংগঠন দুর্বল করে দিয়েছে—লোকবল, অর্থবল এবং অস্ত্রবল, সব আমরা প্রায় হারাতে বসেছি। তবু তো এটা ধ্রুব সত্য যে, মহৎ উদ্দেশ্য কখনো ব্যর্থ হয় না, সত্য পথের সাধনা কখনো বিফল হয় না। শেষ জয় আমাদের হবেই। ভাবছিলাম এইসব কথাই। দৃষ্টিটা ঠিক ছিল বাইরের দিকে। আমার চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেল একটা ব্যাপারে। অকস্মাৎ একটা লোক দ্রুতগতিতে অন্ধকার পথ দিয়ে হেঁটে গেল—টর্চের আলোটা মুহূর্তের জন্য জানালার ওপর—আমার চোখের ওপর ফেলে গেল। কে এই লোকটা? রাত্রির সাধারণ কোনো পথিক না আর কিছু! পিস্তলটা সজোরে চেপে ধরি। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। নিদ্রিত বন্ধুদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে। আরো একটা কালো মানুষ যেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল—তারপর আরো একটা। ভীষণ শীতের মধ্যেও শরীরের জমাট-রক্ত গরম হয়ে উঠে। আমার চোখের পলক আর পড়ে না। ঘোড়ায় আঙুল বসিয়ে পিস্তলটি জানালার দিকে উঁচিয়ে ধরি। সব চুপচাপ। উঠে গিয়ে এক নিদ্রিত বন্ধুর কপালে হাত বুলাতেই সে জেগে গেল। চকিতে মাথার তলা থেকে রিভলভারটা টেনে দিল বজ্রমুষ্টিতে। আস্তে আস্তে বলি, 'পর পর তিনটা লোককে সন্দেহজনকভাবে যেতে দেখলাম—আপনারা ঠিক থাকুন; কি জানি কি হয়।' হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'স্বপ্ন দেখেননি তো?' আমি হেসেই জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ স্বপ্নই বটে তবে জেগে—চোখ চেয়ে।' দারুণ শীতের মধ্যে আরাম ছেড়ে তারা উঠে দাঁড়াল যে যার হাতিয়ার নিয়ে। রাত্রি প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই কিন্তু কুয়াশায় আঁধারে সব ঢাকা। অকস্মাৎ দূরে বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ শোনা গেল।

নিকটবর্তী আর একটা বাড়িতে অন্য কয়েকজন বন্ধু বাস করেন, আক্রমণটা তাদের উপর। অনতিবিলম্বেই এ বাড়িও যে পুলিস ঘেরাও করবে তা নিঃসন্দেহ। আমরা তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই স্থির করি। ভোর হয়-হয়—কুয়াশাচ্ছন্ন পথে দশ হাত দূরের লোকটিও দৃষ্টির অন্তরালে। অসমিয়া পুলিস বন্দুক কাঁধে অন্য বাড়িটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল হলেই বাড়িতে প্রবেশ করার ইচ্ছা। তারা বোধ হয় ভেবেছিল, বাঙালী সন্ত্রাসবাদীরা একটু ঘুমিয়ে নিক, পরে ধীরে সুস্থে তাদের বন্দী করা যাবে। যুবকগণ কিন্তু তাদের শেষ রাত্রির প্রহরীর কাছ থেকে পুলিসের আগমনবার্তা জেনে যায়। বাইরে সশস্ত্র পুলিস-

বেষ্টনী,—ভিতরে ৭.৮ জন ভয়ঙ্কর বিপ্লবী,—যাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা আছে। চুপে চুপে তারা সাহসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়াই স্থির করল। তখনো প্রভাতের আলো রাত্রির মলিনতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি—ঘন কুয়াশার মাঝে তারা সকলে অকস্মাৎ একযোগে পিস্তল ফায়ার করে দ্রুত-গতিতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কুয়াশার মাঝে এই আকস্মিক অভিযানে পুলিস প্রথমটা হকচকিয়ে যায়—ছত্রভঙ্গ হয়ে একটু দূরে হটে যায়। পরক্ষণেই ফিরে এগিয়ে এসে আন্দাজে বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করে দিল। বিপ্লবীরা তখন দূরে কুয়াশার অন্তরালে। একটি যুবকের পায়ে গুলি লাগায় সে পড়ে যায়, পরক্ষণেই আবার উঠে কামাখ্যা পাহাড়ে ছুটে যায়। পরে সেখানেই গ্রেপ্তার হয়।

গৌহাটির নিকটবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে দু'বাড়ির যুবকদল মিলিত হয়েছে। আজ আমরা ঘরছাড়া। সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি। শহরের পথে, ব্রহ্মপুত্রের ধারে এবং পাহাড়ের গায়ে অনুসন্ধানরত সশস্ত্র পুলিস বাহিনী। গৌহাটি, আমীনগাঁও, কামাখ্যা, পাণ্ডুঘাট রেলস্টেশনেও পুলিসের সতর্ক পাহারা। রেলযাত্রীদের লাঞ্ছনার আর অবধি নাই। এ অবস্থার মধ্যেও নামজাদা এক বিপ্লবী গৌহাটি স্টেশন থেকে কলকাতার দিকে রওনা হন। তাঁর বয়স, বিশাল সুন্দর দেহাবয়ব এবং গৌরবর্ণ কান্তি দেখে তাঁকে ছন্ন-ছাড়া বিদ্রোহীদেরই একজন মনে করা কঠিন ছিল। তিনি প্রথমশ্রেণীর প্যাসেঞ্জার হয়ে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে চলে যান। তিনি উত্তরপাড়ার সুপরিচিত নেতা অমর চ্যাটার্জী।

আমি ও অপর একজন বন্ধু ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে দূরবর্তী এক ছোট স্টেশনে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠি।

হেঁটে যাওয়ার সময় পথে পথে লোকের গল্প শুনি,—'কলকাতার বহু বাঙালী যুবক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এখানে আত্মগোপন করে ছিল, আজ তারা জোর সাহসের সঙ্গে পুলিসের ওপরে গুলি ছুঁড়ে চলে গেছে। কে জানে কত লোক মরেছে। স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে কেউ পারে না।' উভয়পক্ষের গুলির শব্দে গৌহাটি শহর চঞ্চল ও সন্ত্রস্ত। নানা রকম গুজবে শহর সরগরম।

বিকাল বেলা একজন অল্পবয়স্ক যুবককে সাধারণ গো-বেচারা সাজিয়ে খাবার আনার জন্য পাহাড় থেকে শহরে পাঠানো হয়েছিল। সে খাবার নিয়ে যখন ফিরল তখন বেলা শেষ। সকলেই ক্ষুধার্ত। খাবার মুখে দেবে এমন সময় পাহাড়ের ঢালু গা থেকে বন্দুকের আওয়াজ হল। যুবকগণ চেয়ে দেখে, নীচে পশ্চিম দিকে অসংখ্য পুলিস—সোনালী সূর্যকিরণে তাদের কাঁধের উপর

বেয়নেট ঝক্‌মক্ করছে। খাওয়া আর হল না। মুহূর্ত মধ্যে যে যার অস্ত্র নিয়ে উঠে দাঁড়াল। যুবকগণ উপরে, পুলিস নীচে। উপর থেকে যুবকগণ ক্রমাগত পাথর ছুঁড়ে মারে,—নীচে থেকে পুলিস রাইফেল ফায়ার করে। মাঝখানে বড় গাছ-পাথরের ব্যারিকেড। যুবকগণ ধরাধরি করে একটি প্রকাণ্ড পাথর নীচের দিকে ঠেলে ফেলে দিল। পুলিস এবার সরে গিয়ে পাহাড়ী-গাছের আড়ালে আত্মরক্ষা করে। এর পর পুলিস নিজেদের অসুবিধা বুঝে উপরে উঠতে সাহস পেল না। কিন্তু ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার নেমে এল; বিপ্লবীরা ধীরে নিঃশব্দে পাহাড়ের গা ঘেঁষে নীচে উপত্যকায় নেমে গেল। আবার চড়াই। উপায় নেই এগুতেই হবে। আজ আর এখানে থাকা চলে না। চলে যেতে হবে দূরে—শত্রুর এলাকার বাইরে। সারা দিন উপবাস। এই শীতের রাতে অচেনা দুর্গম পথে তাদের যাত্রা। সারা রাত চড়াই উৎরাই পার হয়ে মনে হল—অনেক দূর এসে পড়েছি। পূর্বাকাশ ফরসা দেখা যায়। এবার নিরাপদে খাওয়া ও বিশ্রাম করা যাবে। তরুণ যুবক নলিনী বলেছিল—'মনে পড়ে পুণা পাহাড়ে মাউলী সৈন্যের কথা—প্রবলপ্রতাপ মোগল বাদশার বিরুদ্ধে শিবাজীর অভ্যুত্থান—পাহাড়ে পাহাড়ে গেরিলা যুদ্ধ।' অন্য এক যুবক উত্তরে দু'লাইন কবিতা আউড়ে ছিল:

'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে…'

ভোর বেলায় পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে তুমুল শব্দ করে রেলগাড়ি চলে গেল। বিদ্রোহী যুবকগণ বিস্মিত ও চিন্তিত। সারা রাত হেঁটে তারা বেশী দূরে এগোয়নি—অদূরে গৌহাটি শহর। সারাদিন এখানে চুপ করে থাকাই স্থির হল; আবার রাত না এলে কোনদিকে যাওয়ার উপায় নেই। সারাদিন শুয়ে, বসে ও ঘুমিয়ে কাটল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপরে উঠে পুলিসের গতিবিধি লক্ষ্য করে। দুপুরে গতকালের সঞ্চিত খাদ্য যেটুকু ছিল তা সকলে ভাগ করে খেয়ে নেয়। নিকটবর্তী ঝরণা থেকে অঞ্জলি ভরে জল পান করে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। অকস্মাৎ অপরাহ্ণ বেলায় পাহাড়ের উপরিভাগে পুলিসের আবির্ভাব,—সংখ্যায় ৩০।৩৫ জন—কারুর হাতে বন্দুক, কারুর হাতে রেগুলেশন লাঠি। এসেই তারা গুলি চালায়। আমাদের যুবকগণ বড় একটি পাথরখণ্ডের আড়াল থেকে প্রত্যুত্তর দিল-কিন্তু তাদের পিস্তলের গুলি পুলিসের কাছে পৌঁছায় না। অবস্থা সঙ্কটজনক। উপত্যকা পেরিয়ে অন্য একটি পাহাড়ের উপরে উঠে দাঁড়ানোর

সংকল্প করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পরক্ষণেই একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'ও, ওদিকেও তো পুলিস,—ওই যে রোদে কাঁধের উপর বেয়োনেটগুলো ঝক্‌মক্ করছে।'

হ্যাঁ, পুলিস তো বটে!··

নিরুপায় হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়া-ই সকলের মত। ধীরে ধীরে ফায়ার করতে করতে পুলিস ও সার্জেণ্টের দল পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে আসছে নীচে—বিদ্রোহীদের কাছে। কখনো চিৎকার করে বলছে "Hands up!"... "Surrender!" এদিক থেকে মাঝে মাঝে দু' একটি পিস্তলের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো উত্তর নেই। ক্রমে পুলিস আরও কাছে এসে পড়ে। যুবকরা বড় বড় পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারতে তখন উদ্যত। অকস্মাৎ একটি গুলি এসে যুবকদলের নেতার পা ভেঙে দিয়ে গেল। তিনি সেখানেই পড়ে গেলেন। বিদ্রোহীদের গুলি প্রায় নিঃশেষ। গত দুদিনের ক্রমাগত গুলি চালনায় বুলেট ফুরিয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণ পর পর একটি দুটি গুলি চালিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা অবধি প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে টিকে আছে। পুলিসদল এতক্ষণ কাছে আসতে সাহস পায়নি। এখন তারা এদের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছে—অসমীয়া পুলিস তাই নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে —বড় বড় লাঠি উঁচিয়ে আসছে—তারা। এদিকে পাথর ছুঁড়ে মারে, ওরা চালায় লাঠি। ক্রমে আরো কাছাকাছি—উভয় পক্ষে শুরু হ'ল মারামারি ধ্বস্তাধ্বস্তি। পুলিসের লাঠির ঘা পড়ে যুবকদের ওপর—যুবকরা পিস্তলের বাঁট দিয়ে পুলিসকে আঘাত হানে। পিস্তল কেড়ে নিয়ে দু'তিন জনকে যখন হাতকড়ি দিয়ে বন্দী করছে, বাকি চারজন তখনও গাছের ডাল ও পাথর টুকরো নিয়ে মারামারি করছে, তাদের সর্বাঙ্গে রক্ত—আঘাতের চিহ্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ—পাহাড় নিস্তব্ধ—যুবকদের নেতা নলিনী ঘোষ প্রখর দৃষ্টিতে কলকাতার পুলিস কর্মচারীর দিকে তাকিয়ে আছে; বন্দী বন্ধুদের দিকে সকরুণ দৃষ্টি। মারামারি ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে যে দুজন সরে পড়েছিল তা কারুর খেয়াল হয়নি। একজন পুলিস বলে উঠল, দুজন ওদিকে ভেগে গেছে। তখনই একদল পুলিস ছুট দিল তাদের ধরার জন্যে। চারদিকে খোঁজাখুঁজি কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ। মারামারির হট্টগোলে তারা বন্ধুদের ইঙ্গিতে সরে পড়েছে।

বিপ্লবী নলিনী বাগচীর জীবনাহুতি

নলিনী বাগচী ও প্রবোধ দাসগুপ্ত—দুটি যুবক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে পাহাড়ে বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দ্রুত গতিতে অনেক দূর চলে গেল। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় এক ঝোপের মাঝে বিশ্রামের জন্ম তারা বসেছিল। এতক্ষণ তারা ছুটে চলেছে—কেবলই চলেছে। পিছনপানে ফিরে তাকায়নি। এবার বিশ্রাম। সারাদিনের শ্রান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা তাদের দুর্বল করে ফেলেছিল। দেহ তাদের এলিয়ে পড়ে ওখানকার ঐ রুক্ষ পত্রশয্যায়। অল্পক্ষণেই তারা গভীর নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে। ভোরে ঘুম থেকে জেগে উভয়েই সমস্ত মাথায় তীব্র বেদনা অনুভব করে। এক রকম বিষাক্ত পোকা রাত্রিতে ছুটবার সময় তাদের মাথায় কামড়ে ধরেছিল—পোকাগুলি তখনও মাথায় কামড় দিয়েই ছিল। কিছুতেই টেনে বার করতে না পেরে ছুরি দিয়ে একজন অপরের মাথা থেকে পোকাগুলো কেটে ফেলে দেয়। গাছের শিকড় ধরে উপরে উঠবার সময় তাদের হাত পা ও বুক ছড়ে যায়—সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ—হাতের তালু থেকে একটু একটু রক্ত তখনও চুইয়ে বের হচ্ছিল। তারা অবসন্ন।

কিন্তু বসে থাকার সময় নেই। এখানেও বিপদ ঘটতে পারে। দূরে—আরো দূরে যেতে হবে। তারা রেললাইন ধরে চলে, দুদিকে পাহাড়। পা আর চলে না। শরীর অবশ। কিছুদূর গিয়ে এক পল্লীর সন্ধান পাওয়া গেল। নলিনী নিজেদের অসমিয়া বলে পরিচয় দিয়ে অসমিয়া ভাষায় কথা বলে কিছু চিড়া-গুড় সংগ্রহ করে ও জলে ভিজিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খায়। খেতে খেতে সেখানে গল্প শুনল যে, গৌহাটিতে ভীষণ খুনোখুনি চলছে। বাঙালী স্বদেশী-ওয়ালারা কলকাতা থেকে এখানে এসেছে সাহেবদের খুন করতে। উভয় পক্ষেই গুলি চলেছে—হতাহত হয়েছে। আমাদের শান্তি নষ্ট করলে ওই ছেলেগুলো। একজন বললে, না রে—ওরা আমাদের সকলের ভালোর জন্যই এ কাজে ব্রতী হয়েছে।—নলিনী ও তার সাথী সোজা পথ ছেড়ে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী পথ ধরে চলল। সারাদিন হেঁটে রাত্রিতে আবার পাহাড়ে আশ্রয়। প্রকাণ্ড গাছের তলায় একটা পাথরের নীচে ওরা নিদ্রামগ্ন। রাত দুপুরে বাঘের ডাক শুনে বিভ্রান্ত হয়ে জেগে উঠেই রিভলভার দুটি হাতে নিয়ে উভয়ে উঠে দাঁড়াল। এ অস্ত্রে বাঘ মরে না—তা তারা জানে। তবু নির্বিরোধে বাঘের মুখে যেতে নারাজ। কিছু না দেখে চুপি চুপি গাছে উঠে পড়ে। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। গাছে উঠে এলে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে দুজনে ছুটো গুলি

ছুঁড়বে এমনই লক্ষ্য। বে-কায়দায় পড়ে বাঘ ফিরেও যেতে পারে। আবার বাঘের ডাক। তাদের বুক কাঁপে। পুলিসের হাত এড়িয়ে এসে মরতে হবে কি শেষে বাঘের মুখে—ভাবে তারা। নলিনী একটু হাসে, প্রবোধ চুপ করতে বলে—বাঘ কি জানি কেন সরে পড়ল। দূরে গর্জন শোনা গেল। বাকি রাতটুকু তাদের গাছেই কাটল। তৃতীয় দিন ভোরে উঠেই আবার চলা শুরু হল। একটা রেল স্টেশনে পশ্চিমা কুলিদের কাছে ছাতু পাওয়া গেল। তাই দিয়ে সেদিনের ক্ষুধা মিটানো হল। চেহারা এবং পোশাক কুলীদের মতোই হয়ে গিয়েছিল, তাই কুলীরা নিঃসন্দেহে তাদের ছাতু খেতে দেয়। খাওয়ার পর আবার রেল-লাইন ধরে সমুখ পানে চলা। ওটা লামডিং জংশন পৌঁছবার রাস্তা। স্নান নেই কদিন ধরে—শীতের প্রকোপে প্রয়োজনও কম। পেটে ভাত নেই—ঘুমও তেমন নেই। যেতেই হবে—চলতেই হবে চড়াই-উতরাই বেয়ে। গৌহাটি থেকে যতদূরে যাওয়া যায় ততই নিরাপদ। রাত্রে একটা রেল স্টেশনের কাছে তারা পাহাড়ে শুয়ে কাটায়। পুলিসের আগমনের আশঙ্কা এখনো যায়নি—রেল-লাইন ছেড়ে অজানা অচেনা পাহাড়ী পথে নিবিড় জঙ্গলে ঢোকারও কোনো সার্থকতা নেই, সেখানে হয়ত বাঘের মুখে কিংবা কোনো পাহাড়ী জাতির হাতে পড়তে হবে—হয়ত খাদ্যাভাবে মরতে হবে। ক্রমাগত পাঁচদিন চলার পর শীতে অনাহারে অনিদ্রায় কাবু হয়ে দুজনে এক রেল স্টেশনে এসে লামডিং-এর টিকিট কিনে গাড়িতে উঠে বসে। প্রবোধ কারও সঙ্গে কথা বলে না—নলিনীই অমায়িক পরিচয় দিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে খাতির জমায়। পথে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হলে ঐ যাত্রীদের সঙ্গেই নেমে গ্রামের পথে হাঁটতে থাকবে। লামডিং স্টেশন থেকে শ্রীহট্ট ও বাংলা দেশের উপর দিয়ে কাটিহার হয়ে তারা বিহার প্রদেশে চলে যায়। বাংলায় চলেছে তখন পুলিসের উৎপাত। তাই এখানে কোথাও নামা তারা নিরাপদ মনে করেনি। নলিনী বিহারে একেবারে বিহারী সেজে গিয়েছিল—পরনে মোটা কাপড়, মাথায় টিকি, হাতে লোটা-কম্বল। পশ্চিমা দেহাতী কথা। মজঃফরপুরে কিছুদিন থাকে। ওখানকার কলেজের সিন্ধুদেশবাসী অধ্যাপক 'কৃপালনী'* নলিনীকে স্নেহ করেন—সাহায্যও করেন। পুলিসের সন্দেহ পড়ে নবাগত এই যুবকের প্রতি। নলিনী পশ্চিমার মতো কলকাতায় এল। প্রবোধ পূর্বেই বাংলা দেশে এসে ধরা পড়ে যায়।

* আচার্য কৃপালিনী—নিখিল ভারত কংগ্রেসের একদা প্রেসিডেন্ট, গান্ধীজীর অহিংস নীতির একান্ত অনুরক্ত।

আমি তখন গৌহাটি থেকে বিভিন্ন পথে-বিপথে ঘুরে কলকাতায় ফিরে এসেছি। আমার কাছে খবর এল, বিহার থেকে কে একজন এসেছে, দেখা করতে চায়। অসুস্থ হয়ে লোকটি গড়ের মাঠে শুয়ে আছে। আমি খবর শুনে বিস্মিত। মেসের একটি ছাত্রবন্ধু বলল: 'ওর বসন্ত হয়েছে, মেসে আনতে সাহস পাচ্ছি না। তাই আপনার কাছে এলাম। এখন কি করা যায়।' তৎক্ষণাৎ গড়ের মাঠে ছুটলাম। মনুমেন্টের নীচে কম্বল মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে একটা লোক পড়ে আছে—যেন একটা কুলি।

নলিনী বিহার থেকে যে ছেলেটিকে সঙ্গে করে এনেছিল সে আমাকে বলল, এই সেই 'খোকা'। নলিনীকে আমরা 'খোকা' নামে ডাকতাম। আমি ডাক দিতেই সে জড়িত কণ্ঠে বলল, 'আমি নলিনী।' বড় কষ্ট হ'ল তার এ-অবস্থা দেখে। সর্বাঙ্গে তার বসন্তের গোটা, গায়ে হাত দিয়ে জ্বরের উত্তাপ খুব বেশী মনে হ'ল। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, রিভলভারটি হাতের মুঠোতেই নিবদ্ধ। আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি: একে নিয়ে যাই কোথায়! গৌহাটি ফেরতা এই ফেরারী যুবককে বাঁচাতেই হবে পুলিসের হাত থেকে আর যমের হাত থেকে। এখনি এখান থেকে সরে পড়া দরকার। এ-জায়গা নিরাপদ নয়। দিকে দিকে গুপ্তচরের আনাগোনা। অনন্যোপায় হয়ে ওকে আমার গোপন বাসায় নিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম।

একতলায় ছোট্ট একটি ঘরে আমি থাকি। বাড়িওয়ালাকে বলেছি, 'চাকরি করি আর ছেলে পড়াই।' বসন্তের রোগী নলিনীকে এখানে এনে ওঠালাম, মনটা ভারি উদ্বিগ্ন; বাড়িওয়ালা টের পেলে এখনি বিদায় করে দেবে। তখন যাই কোথায়? নলিনীর এ-রোগ কঠিন। প্রতিদিন কাগজে বসন্ত রোগীর মৃত্যু সংবাদ পাচ্ছি। নলিনীর মতো একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ছেলের এই দুরারোগ্য ব্যাধি আমাকে আকুল করে তোলে। মনে মনে ভাবি, নলিনী গৌহাটিতে পুলিসের বিরুদ্ধে লড়ায়ে মরল না—শেষে কিনা বসন্ত রোগে মারা যাবে? নলিনী বহরমপুর কলেজে পড়ত। আই. এস. সি. পরীক্ষায় পাশ করে ২০ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পায়। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করার কি দুর্জয় আকাঙ্খা ছিল তার মনে। আজ পার্টি দুর্বল, সরকারী নিষ্পেষণে বাংলার প্রায় দু'হাজার কর্মী জেলে, অন্তরীণে। আমরা যুদ্ধের সুযোগেও সাফল্যজনক কিছু করতে পারিনি বলে জনমতও আমাদের সমর্থন করে না। টাকার অভাবে নলিনীকে ভালভাবে রাখার ব্যবস্থা করতে পারছি না। চারিদিকে গুপ্তচর;

সন্দেহ হলেই গ্রেপ্তার। যেমন করে হোক নলিনীকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কার্বলিক তেল কিনে এনে নলিনীর সর্বাঙ্গে মালিশ করে দিতাম। ঢাকা জেলে নিজে বসন্ত রোগে ভোগার সময় আমার এ অভিজ্ঞতা হয়। ক্রমশ চোখে-মুখে, মাথায় ও সর্বাঙ্গে গোটা উঠে গেল। কথা বন্ধ হল, গলার ভিতরেও গোটা। একা আমিই তার শুশ্রূষা করি। বিপ্লবীদের গোপন আড্ডা আর কারুকেই দেখানো চলে না; গতিবিধি লক্ষ্য করে একটু সন্দেহ হলেও সার্জেন্ট ও পুলিস এসে হাজির হয়। কলকাতায় তখন এ ব্যাপার নিত্য-নৈমিত্তিক। কত নিরীহ নির্দোষ লোক লাঞ্ছনা ভোগ করে। প্রতিবাদ করলে লাথি। খবরের কাগজে বা নেতাদের বক্তৃতায় পুলিস জুলুমের প্রতিবাদ খুব কমই হত, যেটুকু হত, তাও ভারতরক্ষা আইনের কবলে পড়ে, বিনষ্ট হত। যাক্ নলিনীকে নিয়ে চিন্তার আর অবধি রইল না, নলিনী বুঝি আর বাঁচে না। বার বার শুধু আক্ষেপ ভরে এইটেই ভাবি, ও গৌহাটিতে পুলিসের গুলিতে মরলো না কেন। যাই হোক, দিন দশেক পর নলিনীর অবস্থা ভালর দিকে এলো, ওর মুখ দিয়ে কথা বের হল। ও চোখ মেলে চাইল। ম্লান হাসি হেসে বললো, আমার জন্য আপনার খুব কষ্ট করতে হচ্ছে, না?

নলিনী বেঁচে উঠলো। সেদিন আমার কি আনন্দ। বিছানায় বসেই সে আমার রান্না করা ঝোল ভাত খায় আর একটু গল্প-গুজব করে। তারিণী মজুমদার পূর্ববঙ্গের নানা জায়গা ঘুরে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছেন জানা গেল, যুবকদের নিয়ে দল গঠন অর্থাৎ দলে দলে নূতন ছেলে সংগ্রহ করার কাজ চলছে। দিন দু'য়েক পর ভবানীপুর ও আলীপুর ঘুরে সন্ধ্যাবেলা এক বন্ধুর দেখা পাওয়ার আশায় ইডেন গার্ডেনে ঢুকলাম। ইডেনে গার্ডেন থেকে বেরিয়ে হাইকোর্টের সামনের রাস্তায় পৌঁছানোমাত্র চার পাঁচ জন ভদ্রবেশধারী লোক হঠাৎ আমার গলা, হাত ও কোমর চেপে ধরল। দেখি তাদের তিনজনের হাতে তিনটি রিভলভার। আমার দম আটকে আসছিল। আমাকে টানা-হেঁচড়া করে আর জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে গাড়িতে ওঠাল। আমার সাথীটিকেও তারা এক নিমেষে চেপে ধরলো। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি বন্দী হলাম। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পরিচয়ে আত্মগোপন করে পাঁচ বৎসর কাজ করার পর ভারতরক্ষা আইনে বন্দী হলাম। নলিনীর কাছে আর ফিরে যাওয়া হল না।

নলিনী ভাল হওয়ার পর পূর্ববঙ্গের সংগঠন-কার্য পরিচালনার ভার তার হাতে দিয়ে তাকে ঢাকা অঞ্চলে পাঠানো হয়। জুন মাসে ঢাকা কলতা বাজারের এক

বাসায়—বিপ্লবীদের এক গোপন আবাসে পুলিসের সঙ্গে লড়াইয়ে সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে নলিনী প্রাণ হারায়।

শেষ রাত্রিতে পুলিস সে বাড়িতে হানা দেয়। ভোর হওয়া মাত্র নলিনী ও তার সাথী তারিণী মজুমদার দুয়ার খুলেই একটি হাবিলদারের দিকে গুলি নিক্ষেপ করে দ্রুত বের হওয়ার চেষ্টা করে। হাবিলদার ধরাশায়ী হয়; তৎক্ষণাৎ চারিদিক থেকে পুলিসদল অসংখ্য গুলি বিদ্ধ করে তারিণীর জীবনান্ত করে দেয়। এ সময় ঘরের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে নলিনী আই. বি. ইনস্পেক্টরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে, ইনস্পেক্টর বাবু আহত হয়ে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষ থেকে গুলি চলে - শেষ অবধি পুলিস রাইফেল ফায়ার করে কাঠের দুয়ার ভেঙে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভিতরে ঢোকে। নলিনী তখন সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে অবশ হয়ে পড়েছে। হাতের মুঠোয় আছে মসার পিস্তল কিন্তু চালাবার শক্তি নাই—পুলিস ধরাধরি করে তাকে গাড়িতে তুলে নিলে। হাসপাতালে যখন অর্ধচেতন অবস্থায় নলিনীর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি কাটছিল তখন আই. বি. পুলিস কর্মচারী প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে—'বল, নাম কি? কোথায় বাড়ি' ইত্যাদি। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত নলিনী উত্তর দিয়েছিল:—'আমাকে বিরক্ত করবেন না, শান্তিতে মরতে দিন।' কয়েক মিনিট পরেই নলিনীর জীবনান্ত ঘটে। বীর শহীদ নলিনী মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও আত্ম-প্রকাশের এতটুকু আকাঙ্ক্ষা করেনি। গুপ্ত-সমিতির গোপন কাজের মাঝে নিজেকে জাহির করার এতটুকু কামনা না করেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেল স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে। ঢাকা কলতা বাজারে পুলিসের সঙ্গে লড়াইয়ে যে দু'জন যুবক-নেতা জীবন দিলেন তাঁরাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ শহীদ।

নিষ্পেষিত বিপ্লবীর সংগ্রাম সাধনা

১৯১৭ সালের শেষ ভাগে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যখন মন্দীভূত, তখনো যুবকগণ হাল ছাড়েনি। সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মতো দৃঢ়তা, মনোবল এবং বিশ্বাস তাদের ছিল। জনসাধারণের দুঃখ, অসন্তোষই তাদের মনের দৃঢ়তাকে পুষ্ট করে তোলে। একদিকে সরকারী শোষণ অত্যাচার দুর্নীতি—অপরদিকে জনগণের দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, কুসংস্কার সমাজে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল বলেই ক্রুদ্ধ এক প্রতিকার-স্পৃহা তেজস্বী যুবকগণের চিত্ত অধিকার করে; বিদেশী শোষণের

বিরুদ্ধে জীবন দেওয়া ও জীবন নেওয়ার উদ্দীপনা যোগায়। সম্প্রতি তারিণী ও নলিনীর বীরত্বব্যাঞ্জক সংগ্রাম, পুলিসের গুলিতে জীবন দান যুবকদের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে উত্তেজিত করে তোলে। উত্তেজনাকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার মতো কোনো শক্তিই তখন তাদের ছিল না। অস্ত্র নাই, টাকা নাই, সর্বোপরি সংগঠনও নাই; পুরানো ও নূতন নেতারা সকলেই জেলে, দ্বীপান্তরে কিংবা অন্তরীণে আটক। তারিণী, নলিনীর নেতৃত্বে যে-সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠত তাদের মৃত্যুতে সে-সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রমাগত অত্যাচারে নিষ্পেষণে বাংলায় পুলিসী শাসন কায়েম হয়, বিপ্লবী-সংগঠনের মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙে পড়ে। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই লাল দত্তের জীবন দানে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তি পত্তন হয় সাম্রাজ্যবাদী পুলিসের গুলিতে নিহত তারিণী, নলিনীর বীরত্বব্যাঞ্জক লড়াইয়ে ১৯১৮ সালে সে সংগ্রামের প্রথম পর্ব শেষ হল। এই দশ বৎসরে বিপ্লবী আদর্শ সাধনায় কত কল্পনা, কত আয়োজন বাংলার প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিপ্লবী দল গঠনের কত না চেষ্টা বাংলার জেলায় জেলায়, শহরে-গ্রামে, স্কুলে-কলেজে, বাংলার আনাচে-কানাচে শিক্ষিত যুবকদের মনে জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা ও সক্রিয় বিরোধিতা জাগিয়েছে। কত অগ্রণী কর্মীর দল ধরা পড়েছে, আবার নূতন কর্মীরা এগিয়ে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, কত যুবক গুলিতে ফাঁসিতে মরেছে, কারাগারে জীবন দিয়েছে। তারই ফলে, কত শত নূতন যুবক এক মহান মৃত্যুর নূতন উদ্দীপনা পেয়েছে। কতবার দল ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, আবার নূতন করে দানা বেঁধে উঠেছে। এমনি করেই বিপ্লবীদের সকল চেষ্টা বারে বারে ভেঙে গেছে সত্যি, আবার ধূলিশয্যা থেকে দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে। তারা দমেনি, সামনে চলার পথ ভুলেনি—মুক্তি পথের সন্ধান ছাড়েনি। ভাঙা দলকে আবার গড়ে তুলেছে আরো শক্ত করে।

এই দশ বৎসরের ইতিহাস বাঙালী যুবককের স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্ত রঞ্জিত ইতিহাস। গণশক্তি হতচেতনা, শিক্ষিতেরা ভীরুতায়, ঈর্ষায় ও স্বার্থপরতায় মগ্ন। তারই মধ্যে তেজস্বী, ত্যাগী চরিত্রবান ছেলেদের বেছে বেছে বিপ্লবী দলভুক্ত করা হত—দৃঢ় মনোবল-সম্পন্ন যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে নিযুক্ত করা হত। দল গঠন ও দলের বিস্তারের জন্য সকল রকম সংঘ-সমিতি, আশ্রম ও প্রতিষ্ঠানের ভেতর কর্মীরা যোগ দিতেন। আখড়া, পাঠাগার, সেবা-সমিতি ও স্কুল-কলেজে ছাত্র-সমিতি গঠন করে যুবকদের ঐক্যবদ্ধ এবং সমষ্টিগতভাবে কাজ করার ব্যবস্থা

ছিল। কিছু কিছু উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি জনপ্রিয় ব্যক্তিরা যুবকদের কাজের সহায়তা করতেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের পিছনে সব সময়ে পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি লেগেই ছিল। বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য ধরপাকড় ও খানাতল্লাশ প্রায়ই হত। তবু জাতীয় ভাব উদ্দীপনায় ও সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতার পথে এগোবার সত্যিকার প্রচেষ্টা ছিল এখানে—এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের প্রতি লোকের সহানুভূতি ছিল, সত্যিকার স্বাধীনতার পূজারী বলে একমাত্র আস্থা ছিল এদেরই উপর।

একাজে দেশের লোকের সমর্থন আমাদের শক্তি যোগাত। কিন্তু ১৯১৮ সালে অবস্থা অন্যরূপ। যুদ্ধে ইংরাজ জিতে গেছে—মানুষ হতাশা-গ্রস্ত। যুদ্ধে ইংরাজ রাজের দুঃসময়ে আমাদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। আমরা দেশের আশা পূর্ণ করতে পারি নাই।

কেউ কেউ বিপ্লবী-দলের কর্মীদের অর্থ সাহায্য করতেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। বিপ্লবী-সংঘ পরিচালন, গৃহত্যাগী সর্বক্ষণের কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রকাশ, পিস্তল-রিভলভার ও বিস্ফোরক দ্রব্য কেনা ইত্যাদি নানাবিধ ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রচুর অর্থ আবশ্যক হত। যুদ্ধের সময় পুলিসের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বার বার দলের সংহতি ভেঙে পড়েছে, ভাঙা দল আবার গড়ে তোলার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়েছে। যুদ্ধের শেষ ভাগে যখন নিষ্পেষণের প্রকোপে আমরা আর দাঁড়াতে পারছিলাম না, তখন বিক্রমপুরে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির আয়োজন করা হয়। আর্থিক প্রয়োজন মিটানো এবং যুবক চিত্তে রাজনৈতিক উদ্দীপনা জাগানো এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই কাজটি করা হয়।

শক্তি দেখিয়ে ধনীর পাপার্জিত ধন কেড়ে আনার উদ্দেশ্যে ঢাকার ছেলেরা আবদুল্লাপুরের এক ধনীর বাড়িতে যাত্রাগানের সময় জোর করে টাকা ও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে আনার প্ল্যান করে। গান তখন জমে উঠেছে। অকস্মাৎ এক সময় পরিচ্ছন্ন শার্ট ও হাফপ্যান্ট পরা পোশাকে সুশ্রী সবল যুবকের দল পিস্তল রিভালভার উচিয়ে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের আওয়াজ—'বিউগ্‌ল্‌'এর ধ্বনি। দলের নেতা হুকুম দিল: কেউ এক পা নড়বেন না, যে যেখানে আছেন, সেখানেই বসে থাকুন। শ্রোতৃবর্গ ত্রস্ত, ভীত ও চঞ্চল; হতভম্ব হয়ে রইল। এমনি সময় বাড়ির মালিকের চিৎকার শুনা গেল: আমার সব নিয়ে গেলরে—সব নিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পর পর তিন-চারটি পিস্তলের

তারই মাথায় গুলি লাগবে।" মালিকের বন্দুকটি তখন তাদের দখলে এসে পড়েছে। যাত্রা গানের আসর থেকে একজন বলে উঠে: "এরা সব স্বদেশী ডাকাতের দল।" ডাকাত সর্দার চেঁচিয়ে বলে: "এ-বাড়ির টাকা যায় তো আপনাদের ক্ষতি কি? আপনারা তো কেউ এ-বাড়ি থেকে কোনো সাহায্য পান না। আমরা এ-টাকা নিয়ে সদ্ব্যয় করব - দেশের স্বাধীনতার কাজে ব্যয় করব।" আধ ঘণ্টা পর আবার বিউগল্ বেজে উঠল। ডাকাতদের কাজ শেষ। প্রায় ৩২০০০ হাজার টাকা তারা পেয়েছে। বিউগলের ধ্বনি হওয়া মাত্র যুবকের দল যার যার জায়গা ছেড়ে এক লাইন হয়ে দাঁড়াল। যাত্রা গানের সহস্রাধিক দর্শক কৌতুহলী দৃষ্টিতে বিউগলের তালে স্বদেশী ডাকাতের কুচকাওয়াজ লক্ষ্য করছে। সংখ্যায় তারা ত্রিশ জনেরও বেশী হবে। টাকা ও অলঙ্কারগুলি তাদের থলিতে ঝুলছে। এ-বাড়ির বন্দুকটিও তারা কাঁধে তুলে নিয়েছে। টেলিগ্রামের তার পূর্বেই কেটে দেওয়া হয়েছিল। পরে যখন সকলে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দূরাগত বিউগলের ধ্বনি অনুসরণ করে ডাকাত ধরতে ছুটল তখন তারা দূরে খরস্রোতা নদী-প্রবাহে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে; বিউগলের আওয়াজ থেমে গেছে। এ ডাকাতি ভাবপ্রবণ বাঙালীর মনে উদ্দীপনা জাগিয়েছিল; সাধারণ আলাপ-আলোচনায় শিক্ষিত বাঙালীরা এই ধরনের ডাকাতির জন্য কখনো ঘৃণা প্রকাশ করেনি। ছাত্র ও যুবকগণ এ ঘটনায় বরং উৎসাহিতই হয়, বিপ্লবী-দলের শক্তিতে বিশ্বাসবান হয়ে উঠে। ব্রিটিশের শাসন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে মনে করে আনন্দ পায়।

কার্য-পদ্ধতি

যুদ্ধের সময় বাঙলার সর্বত্র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তীব্র ও প্রসারিত হয়ে পড়ে। ১৯১৬ সালে প্রায় তিনশ' যুবক ঘর-বাড়ি ছেড়ে গুপ্ত সমিতির কাজে বার হয়ে পড়ে। তার মধ্যে দুই শতাধিক হবে অনুশীলন পার্টির ছেলে। অর্থ-সংগ্রহের জন্য সরকারী টাকা বা অত্যাচারী ধনীর টাকা লুণ্ঠন, সরকারী কর্মচারী এবং রাজসাক্ষীর শাস্তি বিধান, বিদ্রোহ উদ্দীপক পুস্তিকা বিতরণ এবং সকলের উপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে দল গঠন তখনকার প্রধান করণীয় কাজ বলে পরিগণিত হত। দলের কাজ প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত:—সংগঠন-বিভাগ

ও কর্মবিভাগ বা আক্রমণাত্মক কাজ ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদী কাজকে 'এ্যাকশন' (action) বলা হত। প্রতিটি কর্মীর ঝোঁক ও কর্মপ্রবণতা দেখে তার উপর কার্যভার ন্যস্ত হত। টেকনিক্যাল বিভাগ পৃথক ছিল, এ-বিভাগ কয়েকটি পৃথক উপবিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়: (১) গোপনে অস্ত্র-সংগ্রহ, ও বোমা তৈরি করা (২) বন্দুক-পিস্তলাদি মেরামত (৩) পুস্তিকা মুদ্রণ, চিঠি-পত্র ও ঠিকানার পোস্টবক্স হিসাবে লোক মজুত রাখা হত। বই, অস্ত্র রাখা, গোপন ফেরারী কর্মীদের আশ্রয় দেওয়া, খবরাখবর আদান-প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের কাজের জন্য বিভিন্ন কর্মী নিযুক্ত করা হত। আশ্রয় দেওয়া এবং দুর্গম পথে পিস্তল নিয়ে যাওয়ার কাজে স্ত্রীলোকের সাহায্য নেওয়া হত। এ-কাজে মা, বোন, বৌদি বা আত্মীয়রা অগ্রণী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ছাত্রীরাও ছেলেদের মতোই দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

অনুশীলন পার্টি বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ আসাম ও পাঞ্জাবে প্রসারিত হয়েছিল। একটি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে সর্বত্র কাজ পরিচালিত হত। জেলা ও প্রাদেশিক পরিচালক নিযুক্ত করা বা স্থানান্তরে প্রেরণ করা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে হত। সমস্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার বিধান ছিল। যুগান্তর পার্টি কলকাতা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারীপুর, রংপুর ও হুগলী প্রভৃতি জেলার ছোট ছোট দল সমূহের একটি যুক্তদল (Federation of groups) হিসাবে কাজ করে। এ-দু'টি বিপ্লবী দল ছাড়া আরো ছোটখাট দল এক-একজন যুবক দাদার নেতৃত্বে গড়ে উঠত, ছেলেদের নিয়ে কানাকানি করত, ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদের কথা বলত।

বাংলার বিপ্লবীদল সমূহের পরস্পরের লক্ষ্য ও আদর্শের কোনো পার্থক্য ছিল না—কর্ম-পদ্ধতিও অনুরূপ। এরা পরস্পর কখনো ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বিরোধ করে, আবার কখনো বা গুরুতর কাজেও সহযোগিতা করে।

অনুশীলন সমিতির একদল অগ্রণী কর্মী ধরা পড়ে গেলে আর একদল উপরে উঠে দলের পরিচালনভার গ্রহণ করে; এ-দল গ্রেপ্তার হলে আবার আর একদল উঠে দাঁড়াত—তারপর আর একদল, ১৯০৭।৮ সাল থেকে ১৯১৭-১৯ সাল অবধি ধরা পড়েও নূতন নূতন বিপ্লবী এসে নেতৃত্ব দিয়ে দলের শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গিয়েছে।

সরকারী জুলুম ও নির্যাতনের কথা

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা যে-নির্যাতন সহ্য করেছে পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা বিরল। গ্রেপ্তারের পর তাদের কেবল কিল ঘুষি বুটের লাথিই মারা হত না, লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মাথায় হাঁটুতে কনুইয়ে জোর আঘাতের ফলে কত যুবক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কাউকে কাউকে দশ বারো দিন না খেতে দিয়ে দেয়ালে হাতকড়ি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হত; প্রতিদিন অজ্ঞান হয়ে গেলে মাথায় তেল জল দিয়ে জ্ঞান ফিরে এলে আবার হাতকড়ি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হত। মাসের পর মাস নির্জন কক্ষে বন্দী রেখে মাঝে মাঝে রাত্রিতে তালা খুলে ঘুম থেকে টেনে তুলে প্রশ্ন করা হত: 'কি জান—বল:' স্বীকারোক্তি না পেলে সার্জেন্ট ও পুলিসের বুট চলত সজোরে হতভাগ্য বন্দীর বুকে, মাথায়, চোখে, তলপেটে। একদিন মাঝ রাত্রিতে কলকাতা দালান্দা হাউসের বন্দীরা বিকট চিৎকার শুনে জেগে উঠেছিল। একটি রুদ্ধ কক্ষ থেকে প্রথমটায় করুণ আর্তনাদ শোনা যায়; তারপর মারের দুপ্ দুপ্ শব্দ তারপর সব চুপ। কতজন কোর্টে গিয়ে হাকিমকে মুখে, কপালে, পিঠে, হাতে, পায়ে লাঠির আঘাতের চিহ্ন দেখিয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে উত্তর হত: 'আসামী নিজে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরতে গিয়েছিল' অথবা কখনো উত্তর দেয়: 'আসামী পুলিসকে মারতে গিয়ে নিজেও আহত হয়েছে।' এর উপর আর কোনো কথা কওয়ার অধিকার ছিল না। নখে ছুঁচ ঢোকানো, ঘাড়ের চুলে উল্টা দিকে হেঁচকা টান দেওয়া, হাতের আঙুলে লাঠির আঘাত, জোরে কানমলা এ-সব তো ছিলই। এ-ছাড়া আরো কত রকম নির্দয় অমানুষিক নির্যাতন চলে যার সঙ্গে মধ্যযুগীয় শাস্তিরই তুলনা করা চলে। আমি যখন প্রথমে জেল খাটি তখন ময়মনসিংহের সরার চর মামলার "লাহিড়ী" নামক এক কলেজের ছাত্র-বন্দীকে দেখি। সে বাঁকা হয়ে হাঁটত, মাথাটাও তার কোথাও উঁচু, কোথাও বাঁকা ছিল। একদিন কিছু কিছু কথা হওয়ার পর জানলাম, ধরা পড়ার পর পুলিস তাকে কি নিদারুণ নির্যাতন করেছে।' আমি তার মর্মান্তিক কাহিনী শুনে কান্না সম্বরণ করতে পারিনি। সে ১৯১১ সালের কথা। পুলিসের অত্যাচারই লাহিড়ীর দৈহিক বিকৃতির কারণ ছিল।

আমার এক বিপ্লবী বন্ধু লর্ড স্ট্রীট পুলিস অফিসে ক্রমাগত বুটের লাথি ও লাঠির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন একজন ফেরারী নেতা, তাই তার উপর অত্যাচার চরমে উঠে। চেতনা ফিরে এলে তিনি জল চান। জলের পরিবর্তে তার নিকট প্রস্রাব উপস্থিত করা হয়। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে পুলিস কর্মচারীকে "ছোটলোক" বলেন। পরে আবার তাকে লাথি মারা হয়— তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। চার পাঁচ দিন তাকে কিছুই খেতে না দিয়ে আঁধার ঘরে একা বন্ধ করে রাখে—তিনি অবসন্ন দেহে অজ্ঞানের মতো পড়ে থাকেন। একটু জ্ঞান হলেই আই. বি ও এস. বি পুলিস—বিপ্লবী দলের গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত আর তার জন্য তাকে মারধরও করত। একেবারে মেরে ফেলারও ভীতি প্রদর্শন করত। শেষ অবধি তিনি অনড় অটল ছিলেন। ডেপুটি কমিশনার সাহেব তাঁর সহ্য শক্তি দেখে তাঁর সামনেই বলেছিলেন: এ লোকটির ভেতর কি একটা শক্তি আছে (There is something in him)। এই বন্ধুটি পরে গৌহাটি খণ্ডযুদ্ধ মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

তরুণ বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জীর উপর আই. বি পুলিস অফিসে যে নিদারুণ অত্যাচার হয় তার মুখে সে-মর্মান্তিক কাহিনী শুনে আমরা অশ্রু সম্বরণ করতে পারিনি। দেয়ালে খাড়া হাতকড়ি দিয়ে এগার দিন (দিন রাত) ওকে দাঁড় করিয়ে রাখে। কিচ্ছু খেতে দিত না। ক্ষুধায় অনিদ্রায় নিরন্তর দাঁড়িয়ে থাকার দুঃসহ পীড়নে অবসন্ন হয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ত তখন পুলিস তার হাতকড়ি খুলে চোখেমুখে ও মাথায় জল দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করত। তার মুখ থেকে গুপ্ত-তথ্য বার করার জন্যই এটুকু সাহায্য। সে-চেষ্টা ব্যর্থ হলেই আবার সেই খাড়া হাতকড়ি—সেই লাঞ্ছনা। একদিন ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে খেতে চায়; তৎক্ষণাৎ মেথর ডেকে বিষ্ঠা আনিয়ে তার মুখের কাছে ধরা হয়েছিল। যোগেশ ক্রোধে ঘৃণায় পুলিস কর্মচারীর সর্বাঙ্গে থুথু ছিটিয়ে দেয়। এর জন্য অবশ্যই তার অনেক কিল ঘুষি ও লাথি পুরস্কার মিলেছিল। পরে বড় সাহেব এসে দু-পয়সার মুড়ি খাওয়া মঞ্জুর করেন। আই.বি ও এস. বি পুলিস অফিসের নিভৃত কক্ষের এই পাশবিক পীড়ন তখন দেশবাসীর কাছে প্রকাশ পায়নি। এরকম অমানুষিক অত্যাচারেও যোগেশ চ্যাটার্জীকে দমাতে পারেনি। তিনি যুক্তপ্রদেশে 'আর-এস-পি-আই' দলের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দেন শেষ বয়সে।

১৯১৬।১৭ সালে মারধর অত্যাচার চরমে উঠে—তখন বহু যুবক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পুলিসের কাছে গুপ্ত-তথ্য বলে দিত অথবা নিজেদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হত।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতের এক বন্ধুকে বাংলার রাজনৈতিক কর্মীদের উপর বাংলা গভর্নমেন্টের কঠোর নিষ্পেষণের কথা লেখেন। এই নির্মম ব্যবহারের ফলে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে, কেউবা পাগল হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ বাংলার লাট রোনাল্ড্‌সে সাহেব অস্বীকার করেন। ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ মন্টেগু তাঁর ভারতের ডায়রীতে লেখেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ আটক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের বিভীষিকায় রাজনৈতিক হয়ে গেছেন।"

আনি বেশান্তও বাংলার বন্দীদের প্রতি নির্যাতনের প্রতিবাদ করে ভারতের বড়লাট সাহেবকে চিঠি লেখেন। তার কিছুদিন পরই আনি বেশান্ত নিজেই অন্তরীণাবদ্ধ হন। বাংলার যুবকদের নির্যাতনের এ-বর্বর কাহিনী সংবলিত এক চিঠি মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক জজ আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট উইলসন সাহেবকে লিখে পাঠান। জজ বাহাদুর আনি বেশান্তের 'থিওজোফিস্ট' দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ সালে অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা কমে যায়। আমি ঐ সময় ধরা পড়ে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, প্রকাশ হয়ে পড়ায় মতো উৎকট মারধর বন্ধ করার গোপন নির্দেশ এসেছে ওপর থেকে। তবু দিনের পর দিন আই. বি পুলিসের অফিসে নির্জন কক্ষে আটক রেখে আমার নার্ভের ওপর ক্রমাগত ভীতি সঞ্চারের কৌশল পূর্ণ চেষ্টা কম হয়নি। আবার মুক্তির আশা নিয়েও কোন কোন ধূর্ত পুলিস অফিসার গভীর রাতে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। বিপ্লবীর মনোবল ভাঙার বৈজ্ঞানিক কৌশল নাকি ইংলণ্ডের আই বি'র "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড" থেকে এ-দেশের পুলিস শিখে এসেছিল।

গুপ্ত সমিতির বিভিন্ন কর্মধারা

১। রিক্রুটিং

ছাত্র ও যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল বিপ্লবী দলের একটি প্রধান কাজ; এর জন্ত প্রতি জেলায় অনেক স্কুল-কলেজে, ক্লাব, সেবা-সমিতি ও ব্যায়াম

সমিতিতে গোপনে গোপনে রিক্রুটিং-এর কাজ চলত। বই পড়িয়ে, স্বদেশী বিষয়ে আলাপ করে ছেলেদের স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার পর তাদের দলে টেনে আনার জন্য কত চেষ্টাই না হয়ে গেছে বাংলার প্রায় সর্বত্র। প্রত্যেক শহরের প্রায় প্রতি স্কুলে ও কলেজে কয়েকটি ছাত্রের একটি গোপন দল থাকত; ছেলেদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিশে ধীরে ধীরে তাদের সন্ত্রাসবাদী রোমান্সে উদ্দীপিত করে দলে টেনে আনবার কাজ ছিল এই গোপন দলটির। রিক্রুট করতে পারার মর্যাদা ছিল যথেষ্ট; বেশী সংখ্যক ছেলে রিক্রুট হলেই দলের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ত্যাগী, সাহসী, চরিত্রবান এবং পড়াশুনায় ভাল ছেলেদের বেছে বেছে রিক্রুট করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলতো। মাঝে মাঝে ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদের কাজে লাগার জন্য ছাত্রদের উদ্দীপিত করে গোপন ইশ্‌তেহার ছড়ানো হত। এতে ছাত্ররা সত্য সত্যই উত্তেজিত হয়ে উঠত।

এক একটি সাফল্যজনক পুলিস বা গুপ্তচর হত্যার পর অথবা বড় রকমের ডাকাতির পর সেই অঞ্চলে রিক্রুট করার কাজ খুব সহজ হয়ে যেত। বোমা পিস্তলের কোনো কাজ (এ্যাকশন) হলেই যুবক-মনে সাড়া পড়ে যেত; সেই কাজটি সম্পন্ন করে বিপ্লবীরা সরে পড়তে পারলে আরো বেশী উত্তেজনার সৃষ্টি হত। বহু সংখ্যক ছাত্রই স্বার্থপরতায়, বিলাসিতায়, কিংবা পড়াশুনায় 'ভাল ছেলে' হওয়ার চেষ্টায় মগ্ন থাকত। স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করার মতো ছেলে খুব কমই পাওয়া যেত। আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা, শিক্ষক সকলেই ছেলেদের এ-পথে যেতে নিরুৎসাহ করতেন কিংবা বাধা দিতেন, ভীতি প্রদর্শন করতেন। গুপ্তচরের ভয়েও ছেলেরা ভীত ছিল; গুপ্তচরের গতিবিধি ছিল সর্বত্র—স্কুলের শিক্ষক ও গরিব চরিত্রহীন ছাত্রদের মধ্যে টাকা খেয়ে কেউ কেউ গুপ্তচরের কাজ করতো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গুপ্তচরের উৎপাত খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল, গুপ্তচর বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ীই বাংলা গভর্নমেন্ট পরিচালিত হত। প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যুবকগণ গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসুক ছিল। গোপনতার আড়ালে অনেক কিছু গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে এমন ধারণা তারা পোষণ করত; বিপ্লবী কর্মীরা অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন এবং প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এ-রকম ধারণা অনেকেরই ছিল। শিক্ষিত ভদ্র-লোকদের কথাবার্তায় প্রায়ই শোনা যেত, 'এদের শক্তিকে কেউ রোধ করতে পারে না, ওরা যা করা স্থির করে তা ওরা করেই।' তিন তিন বারের চেষ্টায় বাংলার গুপ্তচর বিভাগের বড় কর্তাকে হত্যা করার পর জনসাধারণের এ-বিশ্বাস

আরো দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল—বিপ্লবীদলের কর্মীরা অজেয়। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করা এবং এ-দাবি আদায়ের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থান একমাত্র বিপ্লবী দলেরই লক্ষ্য ও কর্মসূচী ছিল বলে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক—উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী বিপ্লবী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং গোপনে সাহায্য করতেন। রিক্রুট করার ব্যাপারে কোনো কোনো সময়ে একদল অন্যদলের বিরোধ লেগে যেত। দলাদলির বিরোধ আমরা এড়াতে পারিনি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনা সংগ্রহের পথে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সরকারী বাধা ও পারিবারিক বাধা তো ছিলই। তা ছাড়াও প্রথম যুগে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের চেয়ে মধ্যযুগীয় ধর্ম, শিক্ষা সামাজিক আচার আচরণই যুবচিত্ত অধিকার করেছিল বেশী করে। দেশের দশের প্রতি কর্তব্য গৌণ; পারিবারিক স্বার্থ ও পারিপার্শ্বিক সামাজিক গণ্ডির চেতনা ও ধর্মসংস্কারই মুখ্য, বাস্তব ক্ষেত্রে জমিদারী-তালুকদারীর লুপ্তপ্রায় মালিকানার গরিমা ও আরামের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দেশের মুক্তি সংগ্রামে টেনে আনার দুরূহ কর্তব্য পালন করতে হয়েছিল প্রথম যুগের বিপ্লবীদের। শহরের ইংরাজী শিক্ষিতের অনেকে ইংরাজ-রাজত্বের প্রতি অনুগত ছিলেন; ভয়-ভীতিও তাদের দুর্বল করে রেখেছিল। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই বিপ্লবীদলের কর্মী সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে দলের প্রসারতা বৃদ্ধি করা হয়।

মেয়েদের রাজনীতিক শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার না থাকায় তাদের দলে আনার কোনো কল্পনা তখন ছিল না কিন্তু মা, বৌদি, স্ত্রী ও বোন রূপে তাদের সাহায্য অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে, ফেরারী বা পলাতক কর্মীদের অতি সংগোপনে আশ্রয় দেওয়া, পিস্তল-রিভলভার রাখা বা স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া, চিঠি আদান-প্রদানের পোস্টবক্স হিসাবে কাজ করা—কোনো কোনো বিপ্লবী পরিবারে মেয়েরা এ সকল কাজ করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দুকড়ী বালা দেবী ও তার বোন পো নিবারণ ঘটক কয়েকটি মসার পিস্তল সহ বীরভূম জিলার এক গ্রামে ধরা পড়েন। ১৯১৭ সালে সিউড়ি কোর্টে তাদের কারাদণ্ড হয়। মহিলার বাক্সে ঐ পিস্তল কি করে এল তা তিনি বলতে অস্বীকার করেন। ভয় দেখিয়েও পুলিস তার কাছ থেকে কোনো কথা বার করতে পারে নাই। তখন তার বয়স ২৯-৩০ বছর। পিস্তল রাখার অপরাধে দুকড়ী বালা দেবীর দু'বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সাধারণ

কয়েদীর মতোই তাকে দৈনিক আধমণ ডাল ভাঙতে হতো। এই মহিলাই প্রথম কারাদণ্ড ভোগ করেন বিপ্লবী দলের কাজে।

শ্রীমতী ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করে পুলিস অনেক নির্যাতন করে। ৩০-বৎসর বয়সের এই মহিলা হাওড়া জিলার বালীর অধিবাসী। তিনি চন্দননগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাকে ধরার কারণ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প শুনেছি।

বিপ্লবীদলের রামচন্দ্র মজুমদার ধরা পড়ার সময় বলে যেতে পারেন নি কোথায় পিস্তল রেখেছেন। সেটা জানার জন্য ননীবালা দেবী রামবাবুর স্ত্রী সেজে জেলে দেখা করে পুলিসের চোখের উপর জেনে এলেন গুপ্ত খবর। পুলিস পরে তা জানতে পেরেই নাকি মহিলাকে গ্রেপ্তার করে তার প্রতি খুব দুর্ব্যবহার করে। বিভিন্ন জেলের নির্জন অন্ধকার সেলে তাকে রাখা হয়। আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেল থেকে আই. বি. পুলিস অফিস ইলিসিয়াম রো তে এনে তাকে অসম্মানজনক কথা বলায় তিনি স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গোল্ডির গালে চড় মারেন। ইনিই প্রথম মহিলা ১৯১৮ সালের ৩ আইনে কিছুকাল রাজবন্দী থাকেন। মুক্তির পর আশ্রয় অভাবে ও দারিদ্র্যে তাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়। আন্দোলনের প্রথম যুগের এই দুই মহিলার নির্যাতন ও বন্দীজীবন সে-যুগের মহিলাদের তেমন আকৃষ্ট করে নাই।

কলকাতার পুলিসী ঝঞ্ঝাট থেকে নিরাপদে থাকার জন্য আমরা ফেরারী (এব্‌সকণ্ডার) বিপ্লবীরা কলকাতা শহরতলীতে বাসা ভাড়া নিতাম। একবার বরাহনগরের একটি বাসায় রাত্রিতে অকস্মাৎ পিস্তলের বুলেট সশব্দে বেরিয়ে যায়। আমরা তৎক্ষণাৎ আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি কিন্তু দু'দিকের বাড়ি থেকে ডাকা-ডাকি শুরু হয়। আমরা কিছুই না জানার ভান করি। প্রতিবেশীদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ায় পরদিন আমাদের বাড়ি ছেড়ে যেতে হল।

বাগবাজার অঞ্চলের এক মজুর বস্তিতে অতি অল্প ভাড়ায় একখানি ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। আমরা ৬।৭ জন ওখানে থাকি এবং স্বহস্তে রান্না করে খাই।

মজুর বস্তিকে 'কুলী বস্তি' বলা হত; বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক, মুটিয়া, রিক্সাওয়ালা, ঠেলা ও গরুর গাড়ির চালক প্রভৃতি ঐ বস্তিতে ছিল। এখানে এদের সঙ্গে থাকার একটা অসুবিধা আমাদের ভোগ করতে হয়; আমাদের পরিষ্কার ভদ্রবেশ এখানে অচল। আমরা বাড়িতে নোংরা ও ছেঁড়া কাপড়-জামা পরতাম, বেরিয়ে যাওয়া-আসার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতাম পাছে কুলী-মজুরদের সন্দেহ দৃষ্টি না পড়ে আমাদের ওপর। আশে-পাশের ঘরের মজুরদের

সঙ্গে আমাদের বেশ সৌহার্দ্য হয়। তারা আমাদের সাধারণ শিক্ষিত গরিব বাঙালী বাবু বলে মনে করত। আমরা লুকিয়ে খবরের কাগজে নিয়ে আসতাম—কখনো তাদের সামনে কথাবার্তায় ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করিনি। বস্তির অধিবাসীদের ঝগড়া-মারামারি, হাসি-গান, গল্প-গুজব, সেকেলে কেচ্ছা, ছড়া ও বটতলার বই সুর করে পড়া আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। কলতলায় ও নোংরা পায়খানায় স্থান পাওয়ার জন্য কি ঠেলাঠেলিই না চলত। কি বিচিত্র এই বস্তিজীবন! ভাবতাম দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে এই বস্তিবাসীদের থাকা, খাওয়া, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সাধন করা যাবে। দেশের স্বাধীনতার কথায় বা রাজনীতির কথায় আমরা আগ্রহ দেখাইনি পাছে আমাদের উপর সন্দেহ আসে। এমনিতেই কেন আছি, কি কাজ করি তার মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হত প্রতিদিন। বস্তির কুলী-মজুরদের সারল্যপূর্ণ জীবন আমাদের ভাল লেগেছিল। কয়েক মাস পর আমাদের গতিবিধি অনুসরণ করে কেউ কেউ বস্তিতে আসা-যাওয়া করছে এ-রকম আভাস পেয়ে আমরা সরে পড়ি। পাথুরিয়াঘাটায় এক বাড়িতে বিপ্লবীদের আড্ডায় একটি গুপ্তচর উঁকি মেরে দেখছিল; তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে হত্যা করে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলন

বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৯০৮ সালে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বেনারসে শচীন সান্যালের উদ্যোগে অনুশীলন সমিতি সংগঠিত হয়। বাংলার অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর "যুবক সমিতি" নাম নিয়ে যুবকদের সংগঠন পরিচালন করার কৌশল অবলম্বন করা হয়। বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে এই সমিতির যোগ ছিল। পরে নেতা রাসবিহারী বসু বেনারসে এসে যুবকদের বোমা ও রিভলভার চালনা-কৌশল শিক্ষা দেন। পিংলে নামক মহারাষ্ট্রীয় যুবক ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে রাসবিহারী ও শচীনকে বলেন যে, আমেরিকা হতে হাজার হাজার শিখ ও গদর পার্টির কর্মীরা ভারতে বিদ্রোহের জন্য এসেছেন—বিদ্রোহ আরম্ভ হলে আরো অনেক লোক আসবে। পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের সঙ্গে

পরামর্শ করার জন্য রাসবিহারী, পিংলে ও শচীন লাহোরে গেলেন। বেনারসে ফিরে এসে রাসবিহারী দলের কর্মীদের আসন্ন বিদ্রোহ ঘোষণার কথা জানিয়ে দেন এবং বলেন, এবার জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। দামোদর স্বরূপকে এলাহাবাদের কার্যভার দিয়ে পাঠানো হয়। বোমা ও অস্ত্র আনার জন্য দু'জনকে বাংলায় পাঠানো হয়। বিনায়ক রাও কাপ্‌লেকে বোমা সংগ্রহের জন্য পাঞ্জাবে পাঠানো হয়। বেনারস ও জব্বলপুর সেনাব্যারাকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করা হয়। লাহোর দিল্লী থেকে পূর্ব বাংলা অবধি সর্বত্র ১৯১৫ সালের ২১ শে জানুয়ারী বিদ্রোহ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। কিন্তু লাহোর কেন্দ্র থেকে কোনো সিগন্যাল না পেয়ে শচীন সান্যাল বেনারস প্যারেড ময়দানে উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করেন। লাহোরে বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ায় ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে যায়। পিংলে বেনারস থেকে এক বাক্স বোমা সহ মীরাট সেনাব্যারাকে প্রবেশ করার সময় ধরা পড়ে যায়। বুদ্ধিমান তেজস্বী বীর যুবক পিংলের ফাঁসি হয়। বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর শচীন সান্যাল ও গিরিজা বাবুর উপর যুক্ত প্রদেশের বিপ্লবী-সংগঠন পরিচালনের ভার দিয়ে রাসবিহারী বসু জাপানে চলে যান। গিরিজা বাবুর প্রকৃত নাম নগেন্দ্রনাথ দত্ত; সিলেট জেলায় কাজ করতে করতে সাধারণ কর্মী থেকে ক্রমে শিক্ষা লাভ করে বাংলার অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মী হয়ে উঠেন। শচীন সান্যাল, গিরিজা বাবু ও আরো কয়েকজন যুক্ত প্রদেশীয় যুবক পরে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হন। গিরিজা বাবু আগ্রা জেলে মারা যান। এর পরও যুক্ত প্রদেশের নানা জেলায় বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণ চলতে থাকে।

বাংলার বিপ্লবীদল প্রথম থেকেই আসামের বিভিন্ন জেলায় সংগঠন তৈরি করে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব—সমগ্র উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে যোগাযোগ ছিল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। পরে লাহোরেও বোমা পাওয়া যায়। পুলিসের কর্মতৎপরতায় পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা ধরা পড়ে। রাসবিহারী বসু গা ঢাকা দেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় আমীর চাঁদ, আবাদ বিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস এই চার জনের ফাঁসি হয়। ১৯১৫ সালে যুদ্ধের সময় সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতে যে-বিদ্রোহের আয়োজন হয় লাহোর ছিল সে-বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। ২৮ জনের ফাঁসি হয়। বহু লোকের দ্বীপান্তর

দণ্ড হয়। যে-সব বিদ্রোহীকে সৈন্যদের সামরিক বিচারে (কোর্ট মারশাল) ফাঁসি অথবা গুলিতে জীবন দিতে হয় তাদের সম্বন্ধে কোনো তথ্যই প্রকাশ করা হয়নি।

বোম্বাই, মাদ্রাজেও বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হত।

যুদ্ধকালে ভারতের কংগ্রেস ও বিপ্লবী রাজনীতি

যুদ্ধের প্রথম কয়েক বৎসর ১৯১৪—১৯১৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস নির্জীব অবস্থায় ছিল। যুদ্ধের প্রথমেই ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এস. পি. সিংহ ঘোষণা করেন—এখনো আমাদের স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন লাভের সময় আসেনি। যখন ভারতীয় বিপ্লবী দল ভারতের বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টায় ব্যাপৃত, যখন বিপ্লবী নেতারা আমেরিকার রাষ্ট্রগঠনের অনুকরণে ভারতে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র—"Federal Republic of India"—প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত, তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সময় আসেনি বলে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভের দাবি করতেও অনিচ্ছুক। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে বিলাতের গভর্নমেণ্ট ভারতে ক্রমশ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। রুশিয়ার বিপ্লবই ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশ শাসনের বন্ধন রজ্জুকে খানিকটা শিথিল করায় আসল কারণ। রুশিয়ার সম্রাট জারের পতন ও রুশিয়ার গণ-জাগরণ বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভীতি উৎপাদন করেছিল।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন বসলে অন্তরীণমুক্ত আনি বেশান্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। সুরেন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ নরম দলের নেতারা আনি বেশান্তকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করতে অনিচ্ছুক, শেষ অবধি গরম দলেরই জয় হল। আনি বেশান্তই প্রেসিডেন্ট হলেন। রবীন্দ্রনাথ গরমদলের পক্ষপাতী। আমরা আমাদের গোপন আড্ডায় ঔৎসুক্য সহকারে নরম ও গরমদলের বিরোধের পর্যালোচনা করি। একদিন খবর এল, ভারতের স্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু বিপ্লবী দলের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজনীতিক আলোচনা করতে চান। মণ্টেগু সাহেব শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য ভারতে এসেছেন এবং সম্প্রতি কলকাতায় বিভিন্ন রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলেন। আমাদের পার্টির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যারিস্টার মিস্টার

এস. এন. হালদারের মারফত খবর আসে যে, মণ্টেগু সাহেব আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গেও গোপনে দেখা করতে চান। আমাদের তরফ থেকে একজন বলে আসেন যে, "দেখা করে আর কি হবে—আমরা কোনো আপস রফা চাই না; পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র কাম্য।" তখনকার দেউলিয়া নেতৃত্ব এর বেশী আর কিছু বলার খুঁজে পায়নি। বড় নেতারা সব জেলে। আমি বলেছিলাম, "নেতাদের মুক্তি দাবি করেননি কেন? জেলে নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ করতেও তো পারতেন।" মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জী ও মিঃ এস. এন. হালদার আমাদের হয়ে মণ্টেগু সাহেবকে সে অনুরোধ করেছিলেন। এই ব্যারিস্টার দু'জন অনুশীলন দলের সমর্থক ছিলেন।

বিপ্লবী আন্দোলনের নীতি ও আদর্শ

১৯০০ সাল থেকে ১৯২০ সাল অবধি সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কল্পনা নিয়ে বাংলায় বিভিন্ন যুবক সমিতি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন করে। ১৯০৫-১৯০৬ সালের স্বদেশী আন্দোলন এই অগ্নিযুগ সৃষ্টির ও প্রসারণের সহায়ক হয়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে আমাদের চিরাচরিত অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে যাওয়ায় জমির সঙ্গে যুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই আঘাত পায় বেশী। জমির আয় থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা প্রথমে চাকুরির সন্ধানে ছুটে। চাকুরি যখন জুটল না, তখন সর্বত্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে; ইংরেজ বিদ্বেষ ও সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব সেই অসন্তোষেরও অন্যতম কারণ। আমাদের ছোটবেলায় আমরা লোকের অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য ও ইংরেজ শাসনের জুলুম অত্যাচার দেখেই স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হই; সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অরবিন্দ ঘোষের শুভেচ্ছা ছিল এর গোড়ায়। প্রমথ মিত্রের অনুপ্রেরণায় ও উদ্যোগে শতাব্দীর প্রথমেই বাংলায় অনুশীলন সমিতি যুবক চিত্তে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করে। পুলিন দাস পূর্ব ও উত্তর বাংলায় যুবকদের সামরিক সংগঠন এবং সামরিক নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন। যতীন মুখোপাধ্যায় ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে লড়াই করে জীবন দিয়ে সংগ্রামের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন। ব্যক্তিগত আক্রমণমূলক সন্ত্রাসবাদই ছিল তখনকার কার্যধারা। যুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে ব্যাপক বিদ্রোহের পরিকল্পনা হয়।

স্বদেশী-আন্দোলনের পর বাংলায় প্রদেশব্যাপী কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

ছিল না। কংগ্রেস তখনো কলকাতা কেন্দ্রে অবস্থিত। গুপ্ত সমিতিই একমাত্র বাংলাদেশব্যাপী রাজনৈতিক সংগঠন।—বাংলার বাইরেও এই সমিতির কর্মীরাই সর্বত্র সংগঠন বিস্তার করে সন্ত্রাসবাদী কাজের দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবপ্রবণ যুবকদের মনে স্বাধীনতার সংগ্রামের রোমান্স জাগিয়ে রেখেছিল। স্বদেশের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে এরাই,—কারাগার, লাঞ্ছনা, অত্যাচার এরাই মাথা পেতে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ "তাঁর কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধে এই যুবকদেরই একমাত্র সত্যিকার ত্যাগী নিষ্ঠাবান কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছেন (১৯১৭ সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে রামমোহন লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।)

গভর্নমেন্ট আমাদের এনার্কিস্ট (anarchist party) বা উচ্ছৃঙ্খল নামে অভিহিত করেন। বিপ্লব করার উদ্দেশ্যে কাজ করি বলে আমরা নিজেদের বলতাম বিপ্লবী। সুতরাং আমাদের দল বিপ্লবী দল। 'বিপ্লব' বলতে আমরা রাষ্ট্র-বিপ্লব বুঝি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করার কাজই বিপ্লব। সে-সংগ্রাম করবে কে? সংগ্রাম শক্তিতে শক্তিমান স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ সর্বত্যাগী সাহসী যুবকগণই এ-কাজে অগ্রণী হবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের নিয়েই আমরা সঙ্ঘ গঠন করেছি। সাধারণ শ্রেণীর জনগণের ভিতর তখনো কোন রাজনৈতিক চেতনা আসেনি। জনসাধারণের সংগঠন ও আন্দোলনের খেয়ালও আমাদের মনে আসেনি। আমরাই দেশের সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ করি—আমরাই সর্বসাধারণের হয়ে কথা বলার অধিকারী এমনি ধারণা নিয়েই আমরা কাজ করছিলাম। সর্বসাধারণের কল্যাণের কোনো সংজ্ঞা (definition) আমাদের জানা ছিল না; সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণের কোনো আইডিয়া মনের কোণে স্থান পায়নি। ভাবপ্রবণ বাঙালী যুবকেরা স্বদেশ হিতৈষণায়, রোমান্সের উদ্দীপনায় আমাদের দলে যোগ দিত। অনেকে একবার জেল খেটে বা পুলিসের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে ঘরে ফিরে যেত।

মানুষের দাস-মনোবৃত্তিসুলভ দুর্বলতা, স্বার্থপরতা যুবকদের স্বার্থের প্রতি আকৃষ্ট করে রেখেছিল। একদিকে সরকারী লাঞ্ছনা ও পীড়ন, অন্য দিকে সাড়াহীন, স্পন্দনহীন নিরাশা-মগ্ন জনসাধারণ—এ সঙ্কটে যুবকদের উদ্দীপনার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ত। ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ কর্মীই শেষ অবধি লক্ষ্যপথে টিকে থাকতে পারেনি, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রাম অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছে মুক্তির লক্ষ্য পথে।

প্রথমটায় আমরা স্বদেশী দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারাই

পেয়েছিলাম। ভারতের গৌরবময় অতীতের সনাতন সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। রাম-রাজ্য স্থাপনের পটভূমিকায় ছিল আমাদের লক্ষ্য পথের সাধনা। দেশীয় রাজ্যের কোনো রাজাকে ভারতের সিংহাসনে নির্বাচন করার আলোচনাও চলতো। পরে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের আলোচনা হত। ১৯১৫ সালের সঙ্কল্পিত বিদ্রোহের ঘোষণা-বাণীতে ভারতে প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কল্পনা করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শেই ভারতের ওই রকম রাষ্ট্র পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। কংগ্রেসের দাবি এ-সময় গিয়েছে ইংরাজের অধীনে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা অবধি।

পূর্ববঙ্গে আমরা জমিদার মহাজনের অত্যাচার ও শোষণ চোখের উপর দেখেছি বলে, এই দুর্নীতির উচ্ছেদ কামনা করেছিলাম। কখনো মনে হত, স্বাধীনতার পর অত্যাচারীদের বিলুপ্ত করে দিয়ে সত্যপরায়ণ প্রজারঞ্জনকারী জমিদার এবং ন্যায়পরায়ণ নির্লোভী মহাজন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মোটের উপর আমাদের ভাবধারা নিতান্তই ঘোলাটে ও অস্পষ্ট ছিল। যে সহজ সরল বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ করতাম তা হচ্ছে এই যে, একবার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে সব দুঃখ-দুর্গতি দূর হয়ে যাবে—সব মালিন্য দূর হয়ে যাবে। মানুষ সদ্‌ভাবাপন্ন হয়ে সকলে মিলেমিশে সমাজ-জীবন যাপন করবে।

প্রথম দিকে ধর্মবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই আমরা কাজ করতাম। ধর্মের ভিত্তিতেই আমাদের রাজনীতিক জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়েছিল। তা' আবার বিবেকানন্দ প্রদর্শিত সুসংস্কৃত হিন্দু ধর্ম। তখন আমরা কোনো 'এ্যাকশন' বা আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে দেবীর আশীর্বাদ স্বরূপ নির্মাল্য নিয়ে যেতাম। কালী প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করার শপথ গ্রহণ করাও হত।

তারপর ক্রমশ সঙ্কীর্ণতা কেটে যায়। আমরা বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধী হয়ে উদার মতাবলম্বী হয়ে পড়ি। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সম্বন্ধে পার্টির কোনো পরিস্ফুট ভাবধারা ছিল না বলে বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে পল্লীতে সঙ্ঘগুলি বেশী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। নূতন ছেলেদের দলে ভর্তি করার সময় নানারকম ভ্রান্ত অলৌকিক অনুষ্ঠান অবলম্বিত হত। মুসলমানদের দলে নেওয়া সম্বন্ধে কারুর কোনো উৎসাহ ছিল না এবং একটা অবিশ্বাসের ভাবই বিদ্যমান ছিল।

১৯১৭ সালের মাঝামাঝি দু'জন শিক্ষিত বিপ্লবীর সঙ্গে একত্র থাকা কালে সমাজতন্ত্রবাদের কথা শুনি। তাঁরা সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা নৈরাজ্যবাদ (anarchism) উচ্চতর আদর্শ বলে মনে করতেন। বাকুনিন ও অন্যান্য

এনার্কিস্টদের নামও শুনি। বাকুনিনের "ভগবান ও রাষ্ট্র" (গড এ্যাণ্ড দি স্টেট) বই পড়ি। নূতন ভাবধারা বেশ ভালই লাগে। সুশীল লাহিড়ী নামে যুক্তপ্রদেশের একজন বিপ্লবী কর্মী বিবেকানন্দের সমাজ-আদর্শকে ভারত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করতেন। লক্ষ্ণৌতে তাঁর ফাঁসি হয়। বিনায়ক রাও কাপলে সমাজতন্ত্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি পাশ্চাত্য নূতন মতবাদ পছন্দ করতেন। উত্তরপাড়ার অমর চ্যাটার্জী এই দুই মতের সমন্বয় সাধনের কথা উল্লেখ করে বর্তমানে দেশের স্বাধীনতাই প্রধান চিন্তনীয় বলে আলোচনা করতেন। বস্তুত দেশের বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে কোনো মতবাদের ধারণাই সে সময় ছিল না। কার্ল মার্কসের নাম আমরা শুনিনি। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় রুশ বিপ্লব (ফেব্রুয়ারী বিপ্লব) সম্বন্ধে একটি ছবি আসে। আমি বন্ধুদের সঙ্গে সেই সিনেমা দেখে উদ্দীপিত হয়ে আসি। ব্রিটিশ ধনতন্ত্রবাদীর তৈরী ছায়াচিত্র তার নিজস্ব ধারণানুযায়ী রচিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবু অত্যাচারী রুশ সম্রাটের পতন, রুশ রিপাব্লিকের (প্রজাতন্ত্র) উত্থান আমাদের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল ও বাস্তব করে তুলেছিল। আজ দীর্ঘকাল পরে সেদিনের কথা মনে হলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আমরা মনে করেছিলাম নিহিলিস্টদের সাধনা এতদিনে পূর্ণ হল। রুশিয়ার বিপ্লবের কত পূর্বেই যে নিহিলিস্টদল বিলুপ্ত হয়ে নূতন গণতান্ত্রিক চেতনায় রুশজাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল আমরা তখন তা জানতাম না, গণ সংগঠনের বিপ্লবী শক্তি তখন আমরা এতটুকুও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। জগতে অগ্রগতির পথে আমরা এক শতাব্দী পিছনে পড়েছিলাম। অক্টোবর বিপ্লব যে কি অমূল্য সম্পদ নিয়ে এসেছিল বিশ্বের নির্যাতিত জনগণের দুয়ারে, আমাদের মাথায় তা প্রবেশ করেনি। জারতন্ত্রের উচ্ছেদটুকু আমাদের খুব ভাল লাগে এবং এর থেকে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের প্রেরণা পাই। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আমাদের তদানীন্তন বিপ্লব-আদর্শের সঙ্গে কতকটা খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু এ-বিপ্লব রুশ জনগণের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারেনি, কৃষককে জমি দিতে পারেনি,—তাই না এ-বিপ্লবের ব্যর্থতা! ইতিহাসের গতিপথে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব নিতান্তই কালাতিক্রান্ত ও অকেজো। পরবর্তী অক্টোবর (১৯১৭) বিপ্লব সময়োচিত এবং তার যথার্থ পরিণতি—যা রুশিয়ার জনগণের তদানীন্তন সমস্যাগুলির বাস্তব ও প্রকৃষ্ট সমাধান দিতে পেরেছিল। প্রথমটি আমাদের আকৃষ্ট করে—এর অসাফল্য যে দ্বিতীয় পরিণতি অবশ্যম্ভাবী করে তোলে, সে বিষয়ে আমরা অবহিত হয়নি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুক্তিযুক্ত পরিণতিই হল অক্টোবরের গণ-বিপ্লব।

আমরা স্বাধীনতা পেলেই খুশী। পৃথিবীর সব দেশই স্বাধীন হোক—এমন একটা উদার মনোভাব আমরা পোষণ করতাম। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হলেও ধনতন্ত্রবাদ উচ্ছেদের কোনো কল্পনা আমাদের মনে আসেনি। কলকারখানার শিল্পোৎপাদন ভিত্তি করে গড়ে উঠবে নূতন স্বাধীন ভারত। মধ্যযুগীয় জমির মালিক, আধুনিক যুগের কলকারখানার মালিক—এই উভয় রকম মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করেই ছিল আমাদের ভারত গড়ার কল্পনা। ১৯১৫ সালে যুদ্ধের সময় ভারতের বিপ্লবী-নেতৃত্ব বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের আদর্শ বলে ঘোষণা করে।

বিপ্লবীদের কল্পনা-প্রবণ মনে স্বাধীনতার আলোকে সব উজ্জ্বল হবে বলে প্রতিভাত হত।

রাজবন্দী জীবন

আগেই বলেছি, ১৯১৮ সালের প্রথম ভাগে কলকাতা হাইকোর্টের সামনে ধরা পড়ি। প্রায় পাঁচ বৎসর আত্মগোপন করে চলার জীবনের অবসান হল। ঘর বাড়ি নেই, নিজস্ব সম্পদ নেই—দলের স্বদেশী কর্মী ছাড়া আত্মীয় স্বজন কেউ নেই—ছন্নছাড়া, তবু অতি প্রীতিদায়ক এই পাঁচ বৎসরের জীবন। কেবল স্ফূর্তি, আনন্দ, কর্মোদ্দীপনা। প্রতি দিনের সংগ্রামের জীবন, প্রতিদিনের সতর্ক জীবন—তবু তার ভিতরেই আছে পূর্ণ এক পরিতৃপ্তি। যাদের মরণের ভয় নেই,—বিদ্রোহের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে যারা মৃত্যুর গর্জন সঙ্গীতের মতো শুনেছে,—যারা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেই কাজে নেমেছে, প্রতিটি সংগ্রামাত্মক কাজে মৃত্যু যাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, তাদের সকল গোপন বিপ্লবী-কর্মীদের অফুরন্ত আনন্দের উৎস রোধ করবে কে? আমার যৌবনের সেই সর্বোৎকৃষ্ট অংশ—যার অপূর্ব স্মৃতি আমি ভুলতে পারিনি তার পরিসমাপ্তি ঘটে এই গ্রেপ্তারে।

ইলিসিয়াম রো স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের অফিসে ৪।৫ দিন আটকে রেখে নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদে উত্যক্ত করে তোলা হয়। ওখানে আমার কাপড়, জামা, জুতা, গায়ের চাদর কেড়ে নিয়ে শুধু একটি নেংটি পরতে দেওয়া হয়। ওই নেংটি পরেই ওই ক'দিন রাত দিন চেয়ারে বসে কাটাতে হয়েছিল। তন্দ্রা এলে ঘাড়ের চুল ধরে উল্টো দিকে হেঁচকা টান মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। দৈনিক ২।৩ কাপ চা আমার খাওয়ার ব্যবস্থা, এর বেশী কিছু

নয়। অবশ্য আমি কখনও ওসব চাইওনি। পুলিসের ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি সাহেবেরা পালা বদল করে একজনের পর আর একজন এসে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলেন। বন্দুক কাঁধে দু'জন সিপাই দু'দিকে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রশ্নের উত্তর না পেলে কথায় কথায় আমাকে ভয় দেখানো হত যে, অন্ধকার ঘরে নিয়ে হাড় গুঁড়ো করে ফেলার ব্যবস্থা আছে।...'তখন তো সবই বলে দেবে, এখন বললে হাড় ক'খানা রক্ষা পেত!' অকথ্য ইতর ভাষায় গালাগালি করে যেত কোনো কোনো ভদ্র বেশী ইনস্পেক্টার। একদিন এক স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এসে আমার বাঁ পা তুলে ধরে একটা কাটা দাগ দেখে নিলে। তারপর পা-টা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওটা কিসের দাগ?'

উত্তর দিলাম, 'ছোটবেলায় কেটে গিয়েছিল।'

সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো ইংরেজিতে: "হারামজাদা শূয়ার, আমি জানি তুমি বোমা ছুঁড়েছিলে...(অমুক) জায়গায়। এ তারই লোহার টুকরোর কাটার চিহ্ন। তাই না?"

আমি বিস্মিত হয়ে সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সাহেব একটা বড় খাতা এনে দেখালে। ওতে লেখা রয়েছে, আমার পায়ের কোন স্থানে কত ইঞ্চি পরিমাণ দাগ আছে এবং কোন তারিখে কোথায় বোমার টুকরো পায়ে বিদ্ধ হয়েছিল। লেখা দেখিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। 'আমি ওসব কিছুই জানি না' বলতেই সাহেব হিংস্র হয়ে ওঠে—বুটের ঠোক্কর দিয়ে সজোরে আমার বুকে একটা ঘা মেরে চলে যায়। আমি চেয়ার শুদ্ধ পড়ে যাই, এক মিনিটের মধ্যে আমার মাথা ঘুরে বমি হয়ে যায়। এরপর পুলিস আমাকে এক গ্লাস জল দিল। দিন তিনেক পর এই এক গ্লাস জল পেলাম।

সেইদিন রাত দুপুরে একটা ছোট ঘরে আমাকে নিয়ে যায়। কলকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের হেড অফিস—নির্মম ও হিংস্র প্রকৃতি পুলিসেরই ভিড় এখানে—যেন যমপুরী। কেন এখানে নিয়ে এল ভেবে পাই না। একটা হ্যারিকেন বাত টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে। গেল দু'বছর যে-মারধর ও নির্যাতন চলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে কি? মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলি, 'ভগবান; মনের বল না যেন ভাঙে।' এক কোণে এক যুবক বসে আছে—হাতে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—চুলগুলি রুক্ষ। পুলিস হাত ধরে টান দিয়ে ওরই সম্মুখে আমাকে নিয়ে বসাল। 'এসেছেন—পারলেন না আরো কিছুদিন বাইরে থাকতে' বলেই যুবকটি মুচ্‌কি হেসে আমার দিকে তাকাল। যুবকটি আমাদের

বন্ধু 'কিষ্ট সাহা'। মাস তিনেক আগে ধরা পড়ে এই যমপুরীতে এসেছে। সে আমাকে বলল, 'এখানে যে কি নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছি তা আর বলার নয়। এই দেখুন ওরা আমার হাতটা ভেঙে দিয়েছে। পারবেন কি এত যন্ত্রণা সহ্য করতে? তার চেয়ে দু'চার কথা বলে দিয়ে চলুন বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি।' কথা শুনেই সন্দেহ হল 'কিষ্ট সাহা' যেন পুলিসের হাতের লোক হয়ে গেছে। দলের পুরানো লোক—সাহসী বলে খ্যাতি ছিল। এত অধঃপতন কি করে হয়! আমি সহ্য করতে না পেয়ে ওকে একটা লাথি মেরে বললাম, 'বিশ্বাসঘাতক।' সে চেঁচিয়ে উঠল—পাশের দুয়ার খুলে গেল। এক ইনস্পেক্টার বাবু ছুটে এসে 'কিষ্ট সাহাকে' সরিয়ে নেওয়ার জন্য সিপাইকে নির্দেশ দিল। সকলেই চলে গেলে এক যুবক সিপাই আমাকে নিয়ে ওখানে রইল। এ-সময় সিপাইটি চুপে চুপে বলল, 'বাবু, এ শালা হারামী হ্যায়, আপ কুছ্ মাৎ বলিয়ে।' আমি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে সেপাইর দিকে তাকালাম,—এ দৈত্যপুরীতেও কি প্রহ্লাদ আছে? এমন সময় অপর একটি সেপাই ঘরে ঢুকে পড়ল। আমাকে সারা রাত এ-ঘরেই বসিয়ে রাখলে। নিদ্রার আবেশে চোখ আমার এক একবার ভেঙে পড়ে। দু'ঘণ্টা পর পর সেপাই বদলী হয়। শেষ রাত্রে এক ছোকরা গোছের গুপ্তচর এসেই বলল, 'আপনার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। ঐ কম্বল আর ঐ লোহার ডাণ্ডা যা দেখছেন, তা আপনাদের মতো বেয়াড়া লোকদের জন্যই রাখা হয়েছে। কিষ্ট সাহা দোষ স্বীকার করতে দেরি করেছিল বলেই তার হাতটি ভেঙে দিতে হয়—পরে সে সব কিছু বলে দেয়। গৌহাটির ঠিকানাও আমরা তার কাছেই পাই।' আমি নীরবে শুনি। তখন বুঝতে পারি, আমার ধরা পড়ার মূলেও কিষ্ট সাহার কারসাজি ছিল। লাটসাহেবের নির্দেশে তখন দৈহিক নির্যাতন অর্থাৎ মারধর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ভীতি সঞ্চার করে স্নায়বিক নির্যাতন বন্ধ হয়নি। আমার কাছ থেকে কিছু কথা বের করার আশা তাদের ছাড়তে হল।

শীর্ণ অবসন্ন দেহে কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলের চুয়াল্লিশ নম্বর সেলের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে। তালা বন্ধ নির্জন কক্ষে কত কথাই না মনে আসে: প্রথম বোমার মামলার আসামী বারীন ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীরা এখানে ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ এখানে ধ্যানমগ্ন চিত্তে বাসুদেব দর্শন করেছিলেন। কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু এখান থেকেই ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামকারী শহীদের পাদস্পর্শে পূত এই পীঠস্থান

প্রেসিডেন্সী জেলের 'চুয়াল্লিশ সেল', এখানে এসে গৌরব বোধ করি—অন্তরের গ্লানি কেটে যায়। কিছুদিন পর ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন অনুযায়ী স্টেট-প্রিজনার করে হাতে হাতকড়া দিয়ে আমাকে রাজসাহী জেলে নিয়ে যায়। তিন বৎসর জেলে পড়াশুনা, চিন্তা ও আলোচনার ভিতর দিয়ে অনেক কিছুই শিক্ষা লাভ করি। ইংরেজের যুদ্ধজয়ের পর আমরা সর্ব প্রথম খবরের কাগজ পড়ার অনুমতি পাই—"দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান"।

সন্ত্রাসবাদ ও রাজদ্রোহাত্মক আন্দোলন দমন কল্পে গভর্নমেণ্ট রাউলাট কমিশন নিয়োগ করে। রাউলাট কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী কঠোর দমন-নীতি মূলক আইন প্রণয়ন করার বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রতিবাদ করেন। তার সঙ্গে ১৯১৯ সনের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হয়। ১৯২০ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের মুসলমানরাও কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ করে খেলাফত আন্দোলন জাগিয়ে তোলে। জেলের ভিতর আমরা রাজবন্দীরা এই সব খবর পড়ে আলোচনা করি। এই বৎসর ভারতের বিচ্ছিন্ন শ্রমিক সঙ্ঘগুলি প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ঐক্যবদ্ধ হয়। আগ্রা জেল থেকে আগত এক বন্ধুর কাছে খবর পাই, বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত অনুশীলন সমিতির নেতা গিরিজা বাবু আগ্রা জেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। তিনি আরও বলেন যে, আমাশয়ে মাসথানেক ভোগার পরও যখন রোগ সারে না, তখন ডাক্তার অজ্ঞাতকুলশীল কয়েদীকে একমাত্রা বিশেষ ওষুধ খাইয়ে দেন; যার ফলে গিরিজা বাবুর জীবনের অবসান হয়। গিরিজা বাবুর প্রকৃত নাম ছিল নগেন্দ্র দত্ত। ইনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী।

রুশিয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাত "স্টেটস্‌ম্যান" কাগজ। তারই ভেতর দিয়ে আমরা রুশিয়ার বিপ্লব বুঝতে চেষ্টা করি। এ নূতন বিপ্লব পৃথিবীর পরাধীন জাতি ও আর্ত মানবজাতির কাছে যে সুখ, শান্তি ও স্বাধীনতার নূতন বাণী নিয়ে এসেছে আমরা রাজবন্দীরা তাতে উল্লসিত হই। চন্দননগরের বসন্তদা বাংলায় অর্থনীতির বই লিখছিলেন, একদিন মনের উল্লাসে তাঁকে বললাম বসন্তদা, রেখে দিন এ বই লেখা। লেনিনের রুশিয়া নূতন 'অর্থনীতি' তৈরি করছে, ধনীর অর্থনীতি আর চলবে না।" বসন্তদা গম্ভীর মেজাজে উত্তর দিলেন, "এ দেশে তা অনেক দূরের কথা।"

৩ বৎসর পর ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে মুক্তি লাভ করি। কয়েকদিন পূর্বেই নাগপুর কংগ্রেসে স্বরাজের আদর্শ গৃহীত হয় এবং অহিংস অসহযোগ নীতি ঘোষিত হয়।

অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন

১৯২১-২৩

জেল থেকে বাইরে এসেই আমি আবার স্বদেশী কাজে লেগে যাই। যুদ্ধাবসানে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন বন্যার প্লাবনের মতো সমস্ত ভারত ও সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি জনসাধারণ খুব আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। হিংসাপন্থীদের নিন্দা পথে-ঘাটে; যেখানে সেখানে তাদের অপমান করা হয়। কংগ্রেসে "ভায়োলেন্স" বা হিংসা-পন্থীদের স্থান নাই। অহিংস আন্দোলনের জয়-জয়কার। ইংরেজের দুর্দিনে সশস্ত্র বিপ্লব-পন্থীরা কিছু করে উঠতে পারেনি। সুতরাং অহিংস পথই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ—সকলেরই মনে এ-বিশ্বাস বদ্ধমূল। পুলিন দাসের নেতৃত্বে আমরা এ-স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উল্লেখ করে তিনি বলতেন, 'গান্ধী দেশটাকে কুলীর দেশে পরিণত করে ফেললেন। সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া দেশের স্বাধীনতা আসবে না।'

অনুশীলন পার্টি আমাকে বরিশাল জেলা সংগঠনের পরিচালন ভার দেয়। এখন আর গুপ্ত-সমিতি নাই; সকল সন্ত্রাসবাদী দলই প্রকাশ্য আন্দোলনে কাজ করে। আমাদের দল ছাড়া সকল দলই স্বাধোদ্ধারের সাময়িক উপায় বা 'পলিসি' হিসাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন স্বীকার করে নিয়েছে। অতীতের অজ্ঞাত-কুলশীল বিপ্লব-প্রয়াসী কর্মীরা এখন বাংলার সর্বত্র প্রকাশ্যভাবে যুবক সংগঠন, লাইব্রেরী ও ক্লাব গঠন এবং কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। আমি ১৯২১ সালে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ করি; কিন্তু যখন অহিংস-সংগ্রামে বিশ্বাস করার নীতি স্বীকার করে প্রতিজ্ঞা পত্র সই করে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার নির্দেশ এলো, তখন স্বরাজ লাভের জন্য 'অহিংস-সংগ্রামে বিশ্বাস করি' এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করায় কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াতে হল। এতে বরিশালের অনেকের নিকটই অপ্রিয় হলাম। গান্ধীর আন্দোলনে

ভারতে যে প্রথম গণ-চেতনার উন্মেষ হয় তাতে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রয়োজন হবে না—এই রকম ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের একতাবদ্ধ আন্দোলন ও লক্ষাধিক লোকের কারাবরণই এমন ধারণার কারণ।

সকলের নিন্দা-অখ্যাতি অগ্রাহ্য করে আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের নামে দল গঠনের কাজ চালিয়ে গিয়েছি। তখনকার অবস্থায় দলের প্রসারতা লাভের সম্ভাবনা ছিল না,—কোনোমতে টিকে থাকা মাত্র। গান্ধীজীর কথামত এক 'স্বরাজ' লাভ না হওয়ায় এবং চৌরিচৌরায় বিদ্রোহী জনগণের বৎসরে অভ্যুত্থানের ফলে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় "অহিংস" পন্থার প্রতি লোকের আস্থা কমে যায় এবং আমাদের সংগঠনের প্রতি আবার বিশ্বাস ফিরে আসে।

বছর দু'য়েক যেতে-না-যেতেই নেতা পুলিনবাবুর কর্মপন্থায় আমরা আস্থা হারাই। তাঁর বিরাট পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র বিপ্লব কোনো দিন কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, ছোট ছোট কারখানায় বড় বড় অস্ত্র তৈরি করে বিদ্রোহের জন্য তৈরি হতে হবে; গণ-সংগঠনের কোনো মূল্য তিনি দিতেন না। সত্যিকার কোনো সংগ্রাম-নীতি তাঁর কল্পনায় নাই, ক্রমশ আমরা তা বুঝেছিলাম। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের দিনে পুলিনবাবুর পরিচালিত মিলিটারী সংগঠনই বাঙালী যুবকদের সংগ্রামশক্তি জাগিয়েছিল। কিন্তু তারপর বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অগ্নিদিনের খ্যাতনামা কর্মীদের মতো পুলিন দাসের প্রতিভাও ম্লান হয়ে যায়। সে যুগের অভাবকে তিনি মেটাতে পারেননি। যার ফলে ১৯২২ সালের শেষের দিকে আমরা অনুশীলন দলের নেতা পুলিনবাবুকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হই। তবে অহিংস সংগ্রাম নীতির কাছে তিনি মাথা নোয়ান নাই।

অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের পর

এ সময় অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পর পুরানো বিপ্লবী দলগুলি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দল গঠন আরম্ভ করে। অনুশীলন ও যুগান্তর এই দুটি প্রধান দল কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলে যোগ দেয়। চিত্তরঞ্জন

আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় নেতা পার্নেলের মতো বিপ্লবী দলগুলি হাতে রেখে স্বরাজ্যদলের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বিপ্লবীরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বরাজ্যদলে যোগ দেয়। বাঙালী বিপ্লবীরা কেউই গান্ধীবাদের পরিবর্তন বিরোধী নীতি সমর্থন করেনি। বিপিন গাঙ্গুলী, সন্তোষ মিত্র ও জ্যোতিষ ঘোষ প্রমুখ কর্মীদের প্ররোচনায় একদল যুবক আবার পূর্বের মতো সন্ত্রাসবাদী কাজে ব্রতী হয়। এ সময় প্রত্যেক পার্টিই নিজ নিজ দলীয় সাপ্তাহিক মুখপত্র বের করেছিল। শঙ্খ, বিজলী, স্বরাজ, সারথি প্রভৃতি সাপ্তাহিক কাগজগুলি ছিল বিপ্লবীদের পরিচালিত তখনকার প্রগতিশীল পত্রিকা। আমাদের পার্টির মুখপত্র "শঙ্খ" পত্রিকায় আমি প্রায়ই প্রবন্ধ লিখতাম। সম্পাদক নলিনী গুহ লেখার জন্য আমাকে উৎসাহিত করতেন। আমার লেখা 'বিপ্লবী নলিনী বাগচীর জীবন কথা' সে দিনে বেশ আদৃত হয়েছিল।

১৯২৩ সালে অগ্নিযুগের সংগ্রামের ঐতিহ্য বহনকারী বাংলা আবার বিপ্লব-পথের সন্ধানে যুবশক্তিকে সংগঠিত করার চেষ্টায় অগ্রণী হয়। এবার কংগ্রেস, ছাত্র ও যুবক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আরো ব্যাপকভাবে সংগঠন বিস্তার চলতে থাকে। "ভারত স্বাধীনতার অগ্রদূত" নামে একটি বলশেভিক পত্রিকা বিদেশ থেকে বিলি করা হত। আমরা পত্রিকাখানি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম; কংগ্রেস নেতারা এ কাগজের লেখা পছন্দ করতেন না। মুষ্টিমেয় একদল যুবক পুরানো সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রবর্তনের চেষ্টায় কলকাতা শাঁখারীটোলা পোস্ট অফিস লুট করে। আমরা এই ধরনের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের উপরে আর আস্থা রাখতাম না—তার পরের পর্যায় সম্বন্ধে তখন আমরা চিন্তা করছি। কিন্তু সরকারী আমলাতন্ত্র ঐ সন্ত্রাসবাদী কাজের অজুহাতেই ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশনে আমাদের সতেরো জনকে গ্রেপ্তার করে 'স্টেট প্রিজনার' করে রাখে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, পূর্ণ দাস।

১৯২৩ সালের প্রথম ভাগে সোভিয়েত রুশ প্রত্যাগত অবনী মুখার্জীর সঙ্গে আমাকে অনুশীলন পার্টি বিদেশে পাঠানো স্থির করে। উদ্দেশ্য ছিল বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে দেশের অনুশীলন পার্টির নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করা। অবনী মুখার্জী নাকি সে আশ্বাস দেয় অনুশীলনের নেতাদের কাছে। সেজন্যই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়—সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতি আমার ঝোঁক দেখেই

আমাকে বাছাই করা হয়। অবনী মুখার্জী তখন ঢাকায় বসে "গরীবের কথা" বই লিখছিলেন। বাংলার গণ-সংগঠনের পরিচয় পত্রসহ অবনী উহার প্রতিনিধি রূপে সোভিয়েত দেশে যাবেন। অনুশীলন পার্টির সাহায্যে তিনি পরিচয় পত্র তৈরি করেও নিয়েছিলেন। পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়েই তিনি এখানে এসেছিলেন। একথা পরে জানা যায়।

বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজের বিরুদ্ধে জার্মানীর সহিত বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের সময়ও তিনি সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি করেছিলেন সেজন্য যুগান্তর পার্টি তাকে স্থান দেয় নাই।

ঢাকার পার্টি কেন্দ্র থেকে বিছানা-পত্র ও সাঙ্কেতিক কোড সহ আমি কলকাতায় আসি।

কলকাতা থেকে ওয়ারেনফেল নামক হাম্বুর্গগামী সওদাগরী জাহাজে যাওয়া আগেই ঠিক হয়েছিল। জাহাজ ছাড়ার একদিন আগে অবনী মুখার্জীর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে উপরোক্ত জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমি এক বন্ধু সহ খিদিরপুর ডকে গিয়ে দু'তিনটে জাহাজে উঠে দেখে শুনে পরে জার্মান জাহাজে উঠি। আমরা সাধারণ গোবেচারী লোকের মতো জাহাজ দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ জাহাজে ওঠার এক মিনিটের মধ্যে দু'জন বাঙালী ভদ্রলোক এসে আমাদের নানা প্রশ্ন করতে থাকে। আমরা তখন ইঞ্জিনিয়ারের খোঁজ না করে কলকব্জা দেখার ভান করতে লাগলাম। ভদ্রলোক দুটি আমাদের পেছন আর ছাড়ে না—জিজ্ঞাসাবাদে আমাদের বিব্রত করে তোলে। গতিক ভাল নয় বুঝে আমরা এক পা দু পা করে নীচে নেমে আসি। আই. বি-র লোক দুটি পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললো, 'বিনা অনুমতিতে জাহাজে উঠেছেন কেন? আপনাদের সঙ্গে কি আছে তা দেখব।'...'কেন সবাই তো ওঠে এবং দেখে চলে যায়—'বলেই আমরা দ্রুতবেগে নেমে পড়ি। আই. বি. পুলিস দুটি তখন পাহারাওয়ালাদের ডাক দিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'ওই লোক দুটোকে পাকড়াও কর।' হট্টগোলের মধ্যে পুলিস 'কেয়া হ্যায়'—'কেয়া হ্যায়' বলে যখন চেঁচাচ্ছে তখন আমরা দৌড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কুলিমজুর-খালাসীদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছি। অবনী মুখার্জী মাস দুই পূর্বে এ জাহাজে এসেছেন। এই ওয়ারেনফেল জাহাজেই ফিরে যাবেন। তিনি নিজেই অনেককে এ গোপন তথ্য বলেছিলেন। তাতেই গোপন কথা আর গোপন ছিল না, পুলিস প্রভুদের কানে পৌঁছে যায়। অবনী মুখার্জীকে ধরার জন্যই আই. বি. পুলিস এ জাহাজে

গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয়। বিদেশে যাওয়া স্থগিত হল। অবনী মুখার্জীর সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতাম না, তাঁর নিজের কথাই আমরা বিশ্বাস করি।

মাস দুই পর

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে ১৮১৮ সালের ৩-আইনে বন্দী করে স্টেট-প্রিজনার করে রাখে পাঁচ বৎসর। আশায় ছিলাম ইওরোপ যাব বিপ্লবের দেশ সোভিয়েত রুশিয়া দেখব; ভাগ্যে জুটল ইংরাজের কারাগার। আমরা তখন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের সমর্থক ছিলাম না, পুলিস তা জেনেও আমাদের গ্রেপ্তার করে। ব্যথাহতচিত্তে ঢাকা থেকে সশস্ত্র পুলিস বেষ্টিত হয়ে আলিপুর জেলে প্রবেশ করি। ১৯২৪ সালের প্রথমভাগে কলকাতায় 'লাল ইস্তাহার' বিলি হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসক তখন কঠোর নিষ্পেষণে বাংলার জাগ্রত যুবশক্তিকে জেলে পুরে দিয়েছিল।

অবনী মুখার্জী কেবল রুশিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় পার্টি থেকে বিতাড়িত হন নাই, তিনি 'কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল' থেকেও বিতাড়িত হন। রুশ হতেও বিতাড়িত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে বিদেশে গেলে আমার সহিত তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতোই। কমিউনিস্ট-বিরোধীর সঙ্গে আমার কোন সংস্রব থাকতে পারে না।

জেলে পাঁচ বছর

(১৯২৩-২৮)

প্রায় আড়াই বৎসর বাইরে কাজকর্ম করার পর ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয়বার ধরা পড়ি এবং পাঁচ বৎসর বন্দী-জীবন যাপন করে ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে মুক্তি লাভ করি। এই পাঁচ বৎসরের জেল-জীবন বিচিত্র কাহিনীতে ভরা। বাংলা দেশের আলিপুর, মেদিনীপুর, ঢাকা, মহারাষ্ট্রের যারবেদা এবং কর্ণাটকের বেলগাঁও জেলে পাঁচ বৎসর কাটাই। ১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে সরকার রাতারাতি অর্ডিনান্স বিধান জারী করে বাংলার বহু যুবককে গ্রেপ্তার

করে। সুভাষ বসু ও সত্যেন মিত্রও ঐ সময় বন্দী হন। বহু নূতন বন্দীর আমদানীতে আমাদের কারাগারে নরক গুলজার হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় ছাড়াও অর্ডিনান্স জারী করে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের সরকার গ্রেপ্তার করতে পারে—এ ধারণা আমাদের ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের নূতন অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নেতাদের একটু চিন্তিত করে তুলেছিল।

জেলে বসে অতীতের সমালোচনামূলক কথায় ও চিন্তায় আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে নূতন কিছু শিখেছিলাম বলে মনে হয় না। মেদিনীপুর জেলে অনুশীলন, যুগান্তর ও বিপিন গাঙ্গুলীর দলের (তদানীন্তন তিনটি প্রধান বিপ্লবীদল) প্রধান নেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন। অতীত ও ভবিষ্যতের নানা কথাই সেখানে আমরা আলোচনা করতাম।

আমরা বিপ্লব চাই, কিন্তু বিপ্লব যে কি, সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা তখনো আসেনি। সন্ত্রাসবাদের দ্বারা যে স্বাধীনতা আসবে না—তাতে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। রুশ বিপ্লবের বৈপ্লবিক সাফল্যের প্রতি আমাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল—কিন্তু এ সাফল্যের পেছনে যে ছিল গণশক্তির অভ্যুত্থান—সে বিষয়ে আমরা বাংলার বিপ্লবীরা মোটেই সজাগ হইনি। আসলে আমাদের বিপ্লবের আদর্শ ছিল অত্যন্ত ঘোলাটে, স্বাদেশিকতার ভাবাবেগে ও স্বাধীনতার মহান প্রেরণায় পূর্ণ; একটা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমাদের মানব কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা সত্য ও সার্থক হয়ে উঠবে—এই সরল বিশ্বাস নিয়েই আমরা বসেছিলাম। রুশ বিপ্লব বুঝার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের লেখা বই, অথবা বাট্র্যাণ্ড রাসেল, জি. ডি. কোল, ব্রেলস্‌ফোর্ড প্রমুখ ব্যক্তিদের সাহিত্যই তখন আমাদের সম্বল। গণবিপ্লব-বিরোধী বিলাতী সাম্রাজ্যবাদী মাসিকপত্র 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী এ্যাণ্ড আফটার' (Nineteenth Century and After) পড়েও রুশ বিপ্লবের ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করতাম। অরবিন্দের 'মানব ঐক্যের আদর্শ' (Ideal of Human Unity) পড়ে আমরা শিখেছিলাম, সমাজতন্ত্রবাদ বা রুশিয়ার বলশেভিকবাদ মানব-জীবনের সমস্যার সমাধান নয়। তবু রুশ বিপ্লব যে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের দুর্গ চূর্ণ করে দিয়ে পৃথিবীতে নূতন জীবনের সত্যিকার শান্তি ও স্বাধীনতার বার্তা নিয়ে এসেছে—পরাধীন আমরা তা অস্বীকার করতে পারিনি। আমরা গণ-জাগরণের বুলি মাঝে মাঝে আওড়াতাম, আর জাতীয় আন্দোলনকারী শিক্ষিত ভদ্রসমাজই জনগণের প্রতিনিধি, এই মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতাম।

দল থেকে অবনী মুখার্জীর সঙ্গে আমাকে বিদেশে পাঠানো স্থির হয় বিদেশ থেকে পার্টির কাছে অস্ত্র প্রেরণের জন্যে—রুশিয়ার বিপ্লবী গভর্নমেণ্টের কিংবা বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কথাটা ছিল নিতান্তই গৌণ। যুদ্ধের পর ব্রিটেনের সঙ্গে সোভিয়েত রুশিয়ার বিরোধ চলছিল। তাতেই ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা সংগ্রামে রুশ গভর্নমেণ্ট প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাহায্য করবে—অনুশীলন পার্টির নেতারা এই রকম মনে করেন। মূল্য দিলে ইওরোপ থেকে অস্ত্র পাঠানো যাবে অবনী মুখার্জীও এরকম আশ্বাস দেন; মজুর-কৃষকের সংগঠন ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছিলেন। এম. এন. রায়ের বিরুদ্ধে অবনী মুখার্জীর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে স্থান পাওয়ার জন্যে দরকার ছিল ভারতের কোনো গণসঙ্ঘের প্রতিনিধিত্বসূচক পরিচয় পত্র—আর অনুশীলন পার্টির আকাঙ্ক্ষা ছিল অস্ত্র পাওয়ার। এ দুয়ের মধ্যে সত্যিকার সংযোগ-সূত্র কিছুই ছিল না। অন্য-দলও বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। অস্ত্রের পরিবর্তে গণ-চেতনা উদ্দীপক পুস্তিকা প্রকাশ ও মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র পাঠানোর ইঙ্গিত আসে বিদেশ থেকে। বাঙালী বিপ্লবীদের মনে গণ-বিপ্লবের কোনো ধারণাই ছিল না—কাজেই সে পথে তারা এগোয়নি।

আমরা প্রথম বন্দী দলের সকলেই ছিলাম পুরানো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী; আমাদের গ্রেপ্তার নিয়ে দেশে আন্দোলন হয়। এরই মাস তিনেক পূর্বে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে একা "স্টেট প্রিজনার" রূপে আটক ছিলেন। আমরা তখন তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে কোনো গুরুত্ব দিইনি। পর বৎসর তাঁকে কানপুর বল্‌শেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করে নিয়ে যায়। সেদিন কে জানতো, এই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদই বসন্তের অগ্রদূতের মতো ভবিষ্যৎ গণশক্তি অভ্যুত্থানের বাণী নিয়ে এসেছেন। জেলে আলোচনার সময় যুগান্তর পার্টির একজন খ্যাতনামা নেতা বলেছিলেন, "ভারতে বিপ্লব আসবে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে; হয়তো রুশ বিপ্লবের চেয়েও উচ্চতর ও মহত্তর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে স্বাধীন ভারত।" স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়া সনাতন ভারতের অকাট্য শ্রেষ্ঠতার গৌরবমণ্ডিত মন নিয়ে আমরা ঐ নেতার কথায় সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম বৈ কি! মেদিনীপুর জেলে আমরা স্বহস্ত লিখিত স্বরচিত একটি মাসিকপত্র বের করতাম। ঐ পত্রিকায় অনুশীলন পার্টির এক নেতা মুসোলিনী ও তাঁর ফ্যাসিস্ট যুবকদলের প্রশংসা করে এক প্রবন্ধ লেখেন। আমি তীব্র ভাষায় ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখি। আমারও যুক্তি বেশী কিছু ছিল না, শুধু লেখকের দারোগা

মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বলি এবং গণতন্ত্রের দোহাই দিই। এ লেখার জন্য জেলে আমাকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়।

গোপীনাথ সাহা কলকাতার পুলিস কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবকে গুলি করতে গিয়ে ভুলে অপর একজন সাহেবকে চৌরঙ্গীর পথে গুলি করে হত্যা করে। ভুল করার জন্যে গোপীনাথ দুঃখ প্রকাশ করে এবং বীরের মতো ফাঁসি কাঠে গিয়ে দাঁড়ায়। ফাঁসির আদেশ হবার পর গোপীনাথ কোর্টে বলেছিল, 'আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ ছড়িয়ে দেবে।' সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে স্বদেশপ্রেমিক বীরের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক প্রস্তাব পাশ হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতেও আত্মত্যাগী স্বদেশহিতৈষী যুবকের সম্বন্ধে প্রশংসাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং অহিংসা মন্ত্রের ঋষি মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতেও প্রায় অর্ধেক ভোট এই প্রস্তাবের পক্ষে পড়েছিল।

১৯২৫ সালে বাঁকুড়া জেল থেকে তরুণ যুবক গণেশ ঘোষকে আনা হয় মেদিনীপুর জেলে; পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এই সন্দেহে তাকে ছোট জেল থেকে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী করা হয়। দেখলাম, একটি আগুনের ফুলকী—স্বচ্ছন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় ব্রিটিশ রাজত্ব ধ্বংসের অনলে। কিছুকাল পরে নিরঞ্জন সেন বহরমপুর কলেজ থেকে অর্ডিনান্স আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ফুলের মালা হাতে নিয়ে এলো মেদিনীপুরে। মালাটি আমাকে দিয়ে বললো, 'এ আপনারই প্রাপ্য।' কলেজের ছাত্ররা গ্রেপ্তারের পর তাদের প্রিয় নেতা নিরঞ্জনকে ফুলের মালা দিয়ে বিদায় অভিনন্দন দেয়। বরিশালে পড়ার সময় থেকেই নিরঞ্জন আমার পরিচিত। কিশোর বয়সে একটি সাধু-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। পরে আমাদের সঙ্গে মিশে ছাত্রদের নিয়ে বিপ্লবী সংগঠন তৈরীর কাজে সে দিন দিন উন্নত হয়ে গড়ে উঠেছিল। বহরমপুরের ছাত্র, প্রফেসার ও ভদ্রলোকেরা নিরঞ্জন সেনের কর্মশক্তি ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে শ্রদ্ধা করতো এবং ভালবাসতো। তারপর আসে দক্ষিণ কলকাতা যুব-সঙ্ঘের অক্লান্ত কর্মী যতীন দাস। বেনারসের বিপ্লবী নেতা শচীন সান্যালের সঙ্গে বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা প্রকাশের কাজে ব্যস্ত থাকা কালে যতীন দাস ধরা পড়ে। যতীন দাস ও নিরঞ্জন সেন পূর্বেই দলের কার্য-সূত্রে আমার পরিচিত ছিল। গণেশ ঘোষের সঙ্গে এদের সৌহার্দ্য ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এই জেলের ভেতর। তিনজনই প্রায় সমবয়সী। কলেজী শিক্ষা ছেড়ে জেলে এসে মিলেছে। জেলখানাকে বিপ্লবী রাজনীতি শিক্ষার কলেজে রূপান্তরিত করে তোলার সাধনা

ছিল তাদের। সমস্ত দলীয় সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে তারা তিন জনে সঙ্কল্প করেছিল —এবার বাইরে গিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে ; প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কাজই ছিল তাদের দৃঢ়-সঙ্কল্প। আমি নিজেও তাদের এ চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমতাবলম্বী ছিলাম। এই সুন্দর সজীব আকাঙ্ক্ষার জন্য তাদের তিনজনকে আমি ভালবাসতাম।

মেদিনীপুর থেকে চিকিৎসার জন্য আমাকে কলকাতা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে যায়। সেখানে যাওয়ার ক'দিন পরেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীরা জেলে মানুষোচিত ব্যবহার পাওয়ার জন্য দাবি করেন। কেউ তাদের অভিযোগে কর্ণপাত করেনি ; জেল ও পুলিস কর্মচারীরা দণ্ডপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদী কয়েদীদের ঘৃণা করতো, আর বিনা বিচারে আটক বন্দীদের কিছুটা পরোয়া করতো।

একদিন বাংলার আই. বি. পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন চট্টোপাধ্যায় তাদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হন। ভূপেনবাবু প্রায়ই রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে জেলে আসতেন। তাদের অন্তরের কথা জেনে নেওয়ার মতলবেই তাঁর এই আসা। এই হত্যা মামলায় অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী নামে দুটি একনিষ্ঠ কর্মী যুবকের ফাঁসি হয়, অপর তিন জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়। দক্ষিণেশ্বরে ধৃত ন'জন যুবক সুদৃঢ় বিপ্লবী কর্মী বলে খ্যাতিলাভ করেছিল। অনন্তহরি ও প্রমোদ সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে। সুন্দর স্বভাবের জন্য আমরা তাদের প্রশংসা করতাম, তাদের ফাঁসি আমাদের মর্মান্তিক দুঃখের কারণ হয়েছিল।

ঐ বৎসর (১৯২৬ সাল) কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনেই নজরুল ইসলাম রচিত বিখ্যাত গানটি প্রথম গাওয়া হয়। বাঙালী বিপ্লবী শহীদের রক্তমাখা ছন্দে রচিত এই গান স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকের মৃত্যুকে উজ্জ্বল করে তোলে।

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান হে।
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিবে কোন বলিদান॥

বাইরে থেকে কিছু কিছু খবর পাওয়া যেত আলিপুর জেলে। "গণবাণী" নামক সাপ্তাহিক কাগজকে কেন্দ্র করে এক দল লোক নাকি রুশিয়ার বিপ্লবী মত প্রচার করে। আমাদের বন্দী বন্ধুদের কাছে এ দল সম্বন্ধে একটু তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের

ভাবই দেখতাম। এরা নাকি একটা পিস্তলের চেয়ে একজন মজুর বা কৃষককে দলে ভিড়াতে পারলে বেশী কাজ হল বলে মনে করে। বলা বাহুল্য আগ্নেয়াস্ত্রের উপর যারা নির্ভর করে আছে গণতন্ত্রের উপর তাদের বিদ্রূপোক্তি স্বাভাবিক। শুনলাম, গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামী অনুশীলন সমিতিতে নাকি গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে। গণ-সংগঠন মূলক কোনো কোনো কার্যপদ্ধতি গ্রহণের জন্য পার্টির কাছে তাঁরা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য জেদ করেন। গোপেন চক্রবর্তী তখন রুশিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন। মোটের উপর বাইরের এই নূতন কর্মপন্থার পথিকদের সম্পর্কে সত্য মিথ্যা নানা ঘটনা ও রটনা জেলের ভিতরে এসে বিপ্লবী বন্দীদের বিদ্রূপ উদ্রেক করত। আমি পার্টির প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলাম, আমার পার্টির বিপ্লবী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশা ও বিশ্বাস রাখতাম। পার্টির বিরুদ্ধবাদীদের সম্বন্ধে নেতারা যা কিছু বলতেন তাই নির্বিচারে বিশ্বাস করি, মনে কোনই সন্দেহের উদয় হত না। নিন্দা শুনে শুনে এই নূতন কর্মীদলের বিপ্লবী সম্ভাবনা থাকতে পারে এমন কোনো ধারণা তখন আমার মনে আসেনি। আর এই নিন্দা সম্পর্কে সন্ত্রাসবাদীদের সকলে একই মত পোষণ করতো, গণ-আন্দোলনের মর্মার্থ বুঝার কোনো চেষ্টা বা আগ্রহ আমাদের ছিল না; নেতা এবং সাধারণ কর্মী সকলেই এ বিষয়ে উদাসীন। গণ-বিপ্লবের সাহিত্য তখন দুষ্প্রাপ্য; আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় সংগ্রামের সাহিত্য জেলে প্রচুর আমদানী হত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পথের দাবী" প্রকাশ হওয়ার পর সকলেই তা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। 'পথের দাবী'তে তখনকার বিপ্লবী মনের যথাযথ ছবি ফুটে উঠেছিল; জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, মধ্যবিত্তের স্বাধীনতা, শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন সব কিছুর সংমিশ্রণে রক্তাক্তবিপ্লবের কাহিনীতে গাঁথা এই বই দেশে বেশ আদৃত হয়েছিল। আমরা এখানে বসে সাহিত্য চর্চাও করতাম—বই লেখা বা অনুবাদ করা বা লেখার উপাদান সংগ্রহ করা ইত্যাদি। আমি "আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস" লিখি। আমার লিখিত পুস্তকের ৭০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিখানি বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে যায়। ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে একটি বই লেখেন।

আলিপুর থেকে আবার মেদিনীপুর জেলে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এখান থেকে সেরা সেরা বন্দীদের দূর দূরান্তর জেলে চালান দেওয়া হয়েছিল; আবার নূতন নূতন বন্দীদের এখানে এনে বন্দীশালা পূর্ণ করে তোলা হয়।

চাটগাঁর গণেশ ঘোষকে যুক্তপ্রদেশে পাঠানো হয়। আবার চাটগাঁর সূর্য সেন মেদিনীপুরে আসেন। তারপর আমাদের বদলীর পালা—সূর্য সেন, নিরঞ্জন সেন রত্নগিরি জেলে ; আমি ও অপর একজন বেলগাঁও (কর্ণাটক)। বোম্বাই-এর নিকটবর্তী কল্যাণ জংশন অবধি আমরা এক সঙ্গেই যাই। পথে বড় বড় স্টেশনে আমাদের সঙ্গে মাথায় লাল পাগড়ী, কাঁধে বন্দুক পুলিস দল ও বেল্টে রিভলভার বাঁধা সার্জেন্ট দেখে লোকের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়ত। আমাদের এক সাথীর অসুখ হয়ে পড়ায় নাগপুর স্টেশনে আমরা পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া করে থেকে যাই। আমাদের দেখার জন্য স্টেশনে ভীড় জমে যায়। নাসিকে জনতা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা করে। কল্যাণ স্টেশনে সাথীদের ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয়েছিল, বিশেষ করে নিরঞ্জনকে। বিদেশে কারাগারে নিরঞ্জনের সঙ্গে একত্রে থাকার সুযোগ পেলে কেবল আমিই খুশী হতাম না—নিরঞ্জনের মা-বাবা, স্ত্রী অমিয়া সকলেই খুশী হতেন।

বাইরে গিয়ে একত্রে কাজে নেমে যাওয়ার কথাটা বিদায়ের প্রাক্কালে সূর্য সেনকে আবার মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম। সূর্য বাবু হাসিমুখে হাত তুলে সম্মতিসূচক অভিনন্দন জানালেন; আমাদের গাড়ি তখন পুনা অভিমুখে চলেছে। দূর বিদেশে শৃঙ্খলিত বন্ধুরা যখন একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার আঘাত যে কত বড় তা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। দুদিকের পাহাড় দেখতে দেখতে শিবাজীর দেশ পুনায় পৌছলাম। আমাদের সহযাত্রী প্রহরী নেতা সার্জেন্ট সাহেব পথে নানা কথা বলে আমাদের আপ্যায়িত করেন। তিনি গান্ধীজীকে আহ্‌মদাবাদ থেকে পুনা নিয়ে গিয়েছেন, বেশ গর্বের সঙ্গেই সে কথাটা বলেন। তিনি আরো বলেন যে, আপনাদের সম্বন্ধে কঠোর নির্দেশ আছে, আপনারা নাকি বিপজ্জনক বন্দী।

পুনা স্টেশনে মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি, পুলিসের তৎপরতায় অবশ্য তা হয়ে উঠেনি। সেখান থেকে কবুতরের খোপের মতো গাড়িতে চড়ে আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথে কখনো বা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আমরা পর দিন দুপুরে কর্নাটকের প্রধান শহর বেলগাঁও স্টেশনে পৌছি। বেলগাঁওয়ে প্রায় চার পাঁচ শ' লোক আমাদের দেখার জন্য ভীড় করে দাঁড়ায়। দর্শকদের মধ্যে বাঙালী ছিল না কেউই। আমাদের মাথায় টুপী বা পাগড়ী ছিল না—টিকি তো নয়ই। কাজেই আমরা হিন্দু কি মুসলমান, দর্শকদের বোঝা বেশ কঠিন হচ্ছে—তাদের পরস্পরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা হিন্দলগী সেণ্ট্রাল প্রিজনে প্রবেশ করি। জেলের কয়েদী, সিপাই ও অফিসারগণ আমাদের বাংলার রাজা-জমিদার স্থানীয় লোক বলেই মনে করেছিল।

"স্টেট প্রিজনার" তারা কখনো দেখেনি। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কয়েকজন শিখ বন্দী ওখানে কঠোর নির্যাতন ভোগ করছিলেন। তাঁরা ২৪ ঘণ্টা সেলে বন্দী থাকতেন। খাটুনী ছিল—গম পেষা। আহার—মানুষের অখাদ্য জোয়ারী রুটি, ঘাসের তরকারী, আর কলাইয়ের ডাল। দণ্ড—আজীবন দ্বীপান্তর। তাঁদের সঙ্গে দেখা করার কোনো উপায় ছিল না। আমাদের সম্পূর্ণ এক পৃথক প্রাঙ্গণে সমস্ত কয়েদীর সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। আমরা আমাদের ঘরে বসে আরব সাগরের তীরবর্তী পশ্চিম-ঘাট পর্বতের অপূর্ব দৃশ্য দেখতাম, আর দু-হাজার মাইল দূরের বাংলা—স্বদেশী ভাবের জোয়ারে উদ্বেলিত বাঙলার কথা স্মরণ করতাম। কর্ণাটকে রাজনীতিক চেতনা তখন বাংলার চেয়ে কত কম তা বুঝেছিলাম বে-সরকারী জেলপরিদর্শক, জেল ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও জেল কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। বে-সরকারী পরিদর্শক রাওসাহেব মনে করেছিলেন আমরা কোনো ছোট দেশীয় রাজ্যের রাজা। গবর্নমেণ্টের রোষে পড়ে রাজবন্দী হয়েছি। তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে কথা বলতেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কথাবার্তা হলেই পরস্পরকে বুঝতে আর কোন কষ্ট হবে না—এই তাঁর ইচ্ছা। আমরা মহারাষ্ট্রীয় ভাষা জানি না বলায় তিনি বিস্মিত হন। আরও বিস্ময়ের বস্তু, বাংলাদেশের কলকাতা শহরের নাম তিনি জানেন না। জেলের ডাক্তার বিলাম পল্লী আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি জব্বলপুরে থাকা কালে শুনেছিলেন, বাঙালী সন্ত্রাসবাদীরা ভয়ঙ্কর জীব। আমাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর সে ভ্রম দূর হয়। বেলগাঁও জেলে গিয়ে আমরা ব্রাহ্মণ পাচক দাবি করি। সে-দেশে এই দাবি না করলে শুধু আমাদের নিজেদের মর্যাদা নয়, আমাদের রাজনীতিক মর্যাদাও হানি হত। জেলার উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাছ খাবেন তো আবার ব্রাহ্মণ পাচক চাইছেন কেন? মারাঠি পাচক ছাড়া কেউ মাছ রান্না করবে না।' অবশেষে হিন্দুস্থানী ঠাকুর পাওয়া গেল।

বেলগাঁও জেলে নানা ভাষাভাষী নানা জাতির কয়েদীদের কথাবার্তা শুনতে খুব ভালো লাগত। মারাঠি, কানাড়ী, গোয়াবাসী, সিন্ধি ও হিন্দুস্থানী—এই পাঁচ জাতীয় কয়েদী পাঁচটি পৃথক ভাষায় কথা বলে। আমাদের চাকর নিলাপ্পা (কানাড়ী), ঝাড়ুদার বাপাপ্পা (মারাঠি) আর হিন্দুস্থানী ঠাকুর—তিনজনে

একসঙ্গে বসে কখনো গল্প করত, কখনো বা ঝগড়া করত। মজা এই যে, কেউ কারুর কথা ভালো করে বুঝত না। তার চেয়ে আরো উপভোগ্য হত, গোয়াবাসী সেপাইটি যখন তার নিজ ভাষায় এদের ঝগড়া মেটাতে আসত। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে হাসির হর্‌রা উঠতো।

কাছেই যত্নগিরি জেলে নিরঞ্জন সেন ও সূর্য সেন ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যোগ স্থাপনের কোন উপায় ছিল না। নিরঞ্জনের স্ত্রী অমিয়ার সঙ্গে চিঠি-পত্রালাপের ভিতর দিয়ে নিরঞ্জনের খোঁজ খবর পেতাম। বেলগাঁও থেকে পুনা যারবেদা জেলে বদলী হয়ে যাই। যাওয়ার সময় এক কানাড়ী ব্রাহ্মণ কর্মচারী গো-রক্ষার দিকে একটু নজর রাখার জন্য আমাদের অনুরোধ করেন। আমরা বলেছিলাম, স্বাধীনতা এলেই সব কিছু রক্ষা পাবে।

সেখানে গিয়ে যারবেদা জেল বলতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কিছুই বুঝতে পারেন না। উচ্চারণ না জানায় লজ্জিত হই। বাংলায় আমরা 'যারবেদা' জেলে বলি —আসলে উচ্চারণ হলো 'য়েরোড়া' জেল। বিরাট জেল—বোধ হয় ভারতে এর চেয়ে বড় জেল আর নেই। বিধি-বিধানের কঠোরতা, রাজবন্দীর নির্যাতন এখানে খুব বেশী। ইওরোপীয় বন্দীদের প্রাঙ্গণের এক অংশে আমাদের ২।৩টি স্টেট প্রিজনার থাকায় সেলগুলি। সেলের মাঝখানে ছোট্ট লোহার খুঁটিতে পোঁতা একটি লোহার রিং (বলয়)। লোহার রিংটা কিসের জন্য জিজ্ঞেস করায় জেলার সহেব জবাব দিয়েছিলেন, "আপনাদের আচরণ ভালো না হলে ওইতে হাতকড়া দিয়ে রাখা হবে সারা রাত। ওরই জন্যে এই ব্যবস্থা।"

এই ধরনের অভদ্রোচিত উত্তর আমি আশা করিনি। উত্তরে বলেছিলাম, "বাংলার দেশপ্রেমিকরা ভদ্রলোকই। আপনার আচরণেই বোঝা যাবে—কি ধরনের ব্যবহার আশা করেন আপনি।" বোঝা গেল জেলার সাহেব রাগ চেপে গম্ভীর হলেন।

১৯১৭ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত গদর পার্টির বৃদ্ধ বন্দীদের আন্দামান দ্বীপ থেকে ফিরিয়ে এনে এ জেলে রেখেছে। অফিসে যাতায়াতের পথে তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত—দেখামাত্র তারা দুহাত জোড় করে 'বন্দেমাতরম্' বলতো। আমরাও 'বন্দেমাতরম্' বলে প্রত্যাভিবাদন জানাতাম। ইচ্ছে হত—দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বলি, কিন্তু উপায় ছিল না।

গ্রেট বিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির জর্জ এলিসন জাল পাসপোর্টে ভারতে

আমার অপরাধে দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঐ যুবকের সঙ্গেও দেখা হল এখানে। জেলে তাঁর উপর খুব কড়া নজর ছিল—স্বভাব গুণে যুবকটি অন্য সকল ব্রিটিশ কয়েদীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এলিসন আমাকে একদিন বলেছিলেন, "গণশক্তিকে উপেক্ষা করে শুধু সশস্ত্র যুবক সমিতি গড়ে আপনারা দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারবেন না। চরকা কেটেও স্বরাজ আসবে না। গণসংগঠনের দিকে দৃষ্টি দিন"। যুগান্তর পার্টির নেতৃস্থানীয় সুরেন ঘোষ বদলি হয়ে এখানে আসেন, কিছুদিন পর চট্টগ্রাম দলের নেতা সূর্য সেনও এই জেলে আসেন। নিরঞ্জন সেন বাংলায় ফিরে যায়।

সূর্য সেনের সঙ্গে কথাবার্তায় বাইরে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করা স্থির হয়। নিরঞ্জনকে আমার একান্ত প্রিয়জনে মনে করে তিনি বলেন নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। সূর্যবাবু শান্ত ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। নানা গল্প-গুজবে আমাদের সময় কাটত। সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে নানা কথা তো হতই, মুক্তির পর বাইরে গিয়ে খুব জোরের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজে লেগে যেতে হবে এবং এবার একটা কিছু করতে হবে—এমনি ধারায় আলাপ-আলোচনা হত প্রায় প্রতিদিনই।

সুরেন ঘোষের সঙ্গেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালন সম্বন্ধে আলোচনা করি। সুরেন খুশী হয়ে বলেন—আমরা এবার সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। সুরেনবাবু জেলে বসে বৈষ্ণব-তত্ত্বের গবেষণা করতেন এবং বলতেন, বাংলার সমাজ কোনো গোঁড়ামির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে না। সনাতন হিন্দুধর্মের চেয়ে বাংলায় সাম্যমূলক বৌদ্ধ আচার নীতিরই প্রভাব ছিল, পরবর্তী যুগে এখানে বৈষ্ণব মতের প্রসার হয়। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান ও উঁচুজাত নিচুজাত সকলেরই এখানে সমান অধিকার। বাংলার সমাজ গড়া হল এই সাম্যের ভিত্তিতে। রাজনীতিতেও গণতান্ত্রিক সমতাই হবে এ ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। অর্থনীতিক সমস্যার বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন। কখনো বা বলতেন জাতি ও বর্ণভেদ দূর করে দিলে পরে আপনা থেকেই লোকের মনে সাম্যভাব এসে যাবে; শোষণের মনোবৃত্তি ধনীর মন থেকে মুছে যাবে।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত গভর্নমেন্টের নির্দেশে আমাকে বোম্বাই-এর যারবেদা জেল থেকে পূর্ব বাংলার ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আমার পিতা তখন বসন্ত রোগে আক্রান্ত; এই ব্যবস্থা হয় তাঁর সঙ্গে দেখা

করার জন্যই। ঢাকা জেল থেকে সশস্ত্র পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে আমি বাড়ি যাই।

ইস্টবেঙ্গল রাইফেল ব্যাটেলিয়ান-এর দশজন গাড়োয়ালী পুলিস বন্দুক কাঁধে করে আমার আগে পাছে চললো আগলে। তাছাড়া জেলের হাবিলদার, আই. বি. ইনস্পেক্টর ও দু'জন 'ওয়াচার' (watcher) মোট ১৪ জন রক্ষী মাধবদী গ্রামে আমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে পৌছল। বাড়ির সীমানার মধ্যে আমার থাকার নির্দেশ ছিল—গাড়িয়ালীরা বন্দুক কাঁধে করে সারারাত পাহারা দিত। 'ওয়াচার' দু'জন বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে দেখতো, আমি কোনো বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি কিনা। গ্রামের লোক এ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে। মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে ভয় পেতে লাগল। সেপাইরা বাজারে গিয়েও চার পাঁচজন করে দল বেঁধে বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়াত। খবর পেয়ে দৈনিক শত শত লোক আমাকে দেখতে আসতে লাগল। চতুর্থ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি প্রায় সহস্রাধিক লোক আমাকে দেখতে আসে। রাত্রে পুলিস কাউকেই আমার বাড়িতে ঢুকতে দিত না। অকস্মাৎ পঞ্চম দিন সকাল বেলা খবর এলো যে, আমাকে আবার জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিনও প্রায় হাজার লোক আমার চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে আসে। রাইফেল বন্দুক কাঁধে নিয়ে ১০ জন গাড়োয়ালী সেনা আমাকে মাধবদী বাবুর হাট থেকে জিনাদ্দি রেল স্টেশন অবধি পাঁচ মাইল রাস্তা মার্চ করিয়ে নিয়ে যায়। কলকাতার প্রায় সকল দৈনিক কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ আমার বাড়িতে সশস্ত্র গাড়োয়ালী সেনার আগমনবার্তা প্রকাশিত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আসে।

প্রায় দুমাস ঢাকা জেলে থাকার পর ফৌজদারী সংশোধনী আইন অনুযায়ী আমার লেখা, আঙুলের ছাপ ও ফটো রেখে আমাকে বাড়িতে অন্তরীণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে মুক্তি পাই।

মুক্তির পর

১৯২৮ সালের মাঝামাঝি আটক বন্দীরা মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন। দেশে আবার আন্দোলনের ঢেউ। কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাস তখন মৃত। নেতৃত্ব করছেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা সুভাষ বসু রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ।

বিপ্লবী নেতারা জেল থেকে ফিরে এসে বাংলার সর্বত্র অভিনন্দন পাচ্ছেন যা তাঁরা পূর্বে পাননি, সভা সম্মেলনে তাঁদেরই সম্বর্ধনা। পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করার সম্মান পাচ্ছেন তখন তারাই। বাংলার ছাত্র ও যুবক-মন আকৃষ্ট করে ফেলেছে সদ্যমুক্ত বিপ্লবী কর্মীরা—যাদের সাথীরা গুলিতে, ফাঁসিতে মরেছে—এতদিন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কংগ্রেস নেতাদের চেয়েও তখন আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা বেশী।

চারিদিকে জনগণের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া—রাজনৈতিক চেতনা বেশ উদ্বুদ্ধ; সংগ্রামাত্মক নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে দেশের জনসাধারণকে সুসংগঠিত করে নেওয়ার এই তো প্রকৃষ্ট সময়;—এবং বিপ্লবী সংগঠনগুলিই এ দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত।

অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তর-সংযুক্ত দলের মনোনীত নেতারা একদলে মিলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রুদ্ধকক্ষে দিনের পর দিন মিটিং করতে লাগলেন। 'যুগান্তর সংযুক্তদল' বলতে মূল যুগান্তর দলের সঙ্গে ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারীপুর, হুগলী ও চট্টগ্রাম জেলার উপদলগুলির সংযোগ বুঝায়। জেলেই এ-মিলনের—সম্মিলিত দল গঠনের জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। মুক্তির পর বিপ্লবী দলগুলি পূর্বকল্পনা কাজে পরিণত করার ব্যাপারে ব্রতী হন। 'ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লবী সঙ্ঘগুলি একত্রে মিলে যাবে'—মিলন সাধনের পূর্বেই একথা প্রচার হয়ে পড়ে। এ-মিলনে বাংলার বিপ্লবীদল শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে যুবগণ উল্লসিত। সত্যিই ঐক্যবদ্ধদলের শক্তি অপরাজেয় হত। নেতারা কোন কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারার পূর্বেই জেলখানায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁরা "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" গঠনে উদ্যোগী হন। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও নীতি পদ্ধতি সম্বলিত খসড়া প্রস্তুত হয় সম্মিলিত বিপ্লবী দলের প্রতিনিধিদের দ্বারা। জাতীয় কংগ্রেসে তখনও "স্বাধীনতা" লক্ষ্য বলে স্বীকৃত হয়নি। তাঁরা এই সঙ্ঘ গঠনের ভিতর দিয়েই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসীদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজেরাই একটি প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে সাহসী হলেন না। সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে খসড়া কিছু পরিবর্তন করে সুভাষ বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর এবং আজাদ অবধি এতে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুধু বিপ্লবীদের নিয়েই বিপ্লবীদল গঠন করার চেষ্টা ব্যর্থ হল, অ-বিপ্লবী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আপস মনোবৃত্তির ফলে। সকল জাতীয়তাবাদীদের নিয়েই "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" গঠিত হল। আমাদের কয়েকজনের এ-ব্যবস্থা মনঃপূত হয়নি। আমাদের নেতারা একই সময়ে

কংগ্রেসীদের বিরাগভাজন হতে এবং সরকারী রোষে পড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। আসল কথা বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতিভা ও উদ্যোগ না থাকায় তাঁরা নিজেদের শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন না।

এর কিছুদিন পরেই সকল দলের লোক মিলেই ঢাকা জেলা স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠিত হয়—আমাকে তার সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। নিরঞ্জন সেনকে সম্পাদক করে বরিশালে সঙ্ঘ গঠিত হয়। অন্য কয়েকটি জেলাতেও স্বাধীনতা সঙ্ঘ স্থাপিত হয়।

বিপ্লবী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা আর বেশীদূর এগোয়নি। নিজেদের দলাদলি কংগ্রেসে নিয়ে গিয়ে কংগ্রেসের দলাদলিকে আরও শক্ত ও সবল করে তুললো।

১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন। আমরা কংগ্রেসের কাজে মনোনিবেশ করলাম। বিপ্লবীদলের সঙ্গে আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে অংশ গ্রহণ নিয়ে কংগ্রেসী নেতাদের একটা বোঝাপড়া হয়। এবারেই সর্বপ্রথম দু'হাজার যুবককে মিলিটারী পোশাকে সজ্জিত করে মিলিটারী কায়দায় ট্রেনিং দিয়ে কংগ্রেস পরিচালনের ব্যবস্থা করে। বিপ্লবীদলের নেতা ও কর্মীরা এই "জাতীয় সেনাবাহিনী" পরিচালনের ভার নেয়। সুভাষ বসু ছিলেন সর্বাধিনায়ক (G. O. C.)।

এরই কয়েকমাস পূর্বে কলকাতা ও আশেপাশে কয়েকটি মজুর ধর্মঘট হয়। লিলুয়ার হাজার হাজার রেল শ্রমিকের ধর্মঘট জনসাধারণের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। মজুর আন্দোলন তখন বেশ দানা বেঁধে উঠছিল। শ্রমিক ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক শক্তি নিয়ে আমাদের বিপ্লবী নেতারা তখনও বড় বেশী মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু তাঁদেরই একটি শাখা যখন ছাত্র ও যুবকদের আকৃষ্ট করে 'ইয়ং কমরেড লীগ' গড়ে তোলে তখন একটু চিন্তার কারণ হয়েছিল বৈকি। যুব সংগঠন বিপ্লবীদেরই একচেটিয়া,—সেখানেও কি সাম্যবাদীরা প্রবেশ করল? এই ছিল চিন্তার কারণ। অক্টোবর মাসে কলকাতায় সমস্ত ভারতের মজুর-কৃষক পার্টির প্রথম কংগ্রেস। পাঞ্জাবের সোহন সিং জোশ প্রেসিডেন্ট। এলবার্ট হলে সভার অধিবেশন আমরা কয়েকজন দেখতে গেলাম। ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, নীরোদ চক্রবর্তী প্রভৃতি পরিচিত বন্ধুরা আদর করে মঞ্চে নিয়ে বসালেন। কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নাম শুনে আসছি কতকাল ধরে। প্রথমেই তাঁর খোঁজ নিই। একজন 'কমরেড' বন্ধু

দেখালেন 'এই ত আপনাদেরই সামনে'। অন্ধ্রপ্রদেশের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তখন তিনি কথায় ব্যস্ত ছিলেন। অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে সেদিন এই কথাই মনে হয়েছিল—এই সামান্য দর্শনের লোকটিই কি অসামান্য বিপ্লবের বার্তা নিয়ে এসেছে এদেশে! সম্মেলনের বক্তারা শ্রমিক কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনের কথা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কথা বলার পর আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘের" উদ্দেশ্যে তীব্র গালাগালি দিতে থাকেন। বক্তৃতায় বলা হয়েছিল ওই সঙ্ঘ একটি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান। বুর্জোয়া স্বার্থান্বেষীরা ভাড়াটে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্যে বুর্জোয়া স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে। ক্ষুব্ধ চিত্তে বাসায় ফিরে আসি। মজুর সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য সকলের কাছ থেকেই তিরস্কৃত হই। কমিউনিস্টদের নীতি-অনুযায়ী তারা আমাদের নিন্দা করেছে, কিন্তু তাদের সাম্যবাদী নীতি কার্যকরী হতে এখনও অনেক দেরি। আমরা আমাদের কাজ করে যাব, এইভাবের চিন্তা দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিনেও আবার ঐ সম্মেলন দেখতে যাই। আমি একাই যাই। সম্মেলনের পর ওঁদের শোভাযাত্রাতেও আমি যোগ দিয়েছিলাম।

কংগ্রেস অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে আসছে। পার্ক-সার্কাসে কংগ্রেস বসবে। রোজ সেখানে যাই—নানা রকম কাজে যাওয়ার ডাক আসে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা ও বহরমপুর ঘুরে কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির কিছু কিছু সভ্য করে এসেছি। দলীয় বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজও সঙ্গে সঙ্গে দেখাশুনা হয়ে গেল। সর্বত্রই যুবকগণ বিদ্রোহাত্মক কাজ করার জন্য উন্মুখ। ঢাকার যুবকগণ নেতৃত্বের পুরানো ধারায় আর বিশ্বাসী নয়, চায় তারা নতুন কাজের নির্দেশ। ভিতরে ভিতরে পার্টি নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ জমে উঠেছে—তারও আভাস পেলাম। বরিশালে ঐ একই কথা, নিরঞ্জন সেন এই খবর আনলো। প্রভাত চক্রবর্তী কুমিল্লা ও অন্যান্য স্থানের পার্টি সভ্যদের সংগ্রামাত্মক কাজের আগ্রহের কথা জানায়। কংগ্রেসের সময় সকলেই কলকাতায় আসে।

ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য জেলার কতিপয় অনুশীলন পার্টির যুবক মিলে কংগ্রেসের সময় পার্ক-সার্কাসে একটি গোপন বৈঠকে আলোচনা করে। কাজকর্ম সম্পর্কে কি করা যায় এই ছিল আলোচ্য বিষয়। এতদিন নেতারা জেলে ছিলেন, তাঁদের মুক্তিতে আশা জেগেছিল—"এবার একটা কাজের হদিস পাওয়া যাবে"। প্রথমে তাঁরা সকল বিপ্লবী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে ধৈর্যধারণ করতে বলেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এখন অবধি কাজের

কোনো কথাই নাই। নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সকলেই একমত—নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বহ্নি যেন প্রজ্বলিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেল এই আলোচনার মাঝে। কাজ চাই—কাজ চাই—কাজ। কাজ মানে সশস্ত্র প্রতিরোধ। যুবকদের দুজন প্রতিনিধি আমাকে তাদের আলোচনার বিষয় জানায়। আমি তাদের গোপন আলোচনার কথা গোপন রাখতে বলি এবং নিজেদের সঙ্ঘশক্তি আরও শক্ত ও প্রসারিত করার আবশ্যকতা বুঝাই। নেতাদের দ্বারা আর বিশেষ কিছু হওয়ার ভরসা নাই। জেলের অভিজ্ঞতা থেকে তা পরিষ্কার অনুধাবন করা গিয়েছিল। লাহোর থেকে ভগৎ সিং প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট এসোসিয়েশনের বিপ্লবী কর্মী কংগ্রেসে এসে দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাসের সঙ্গে একযোগে কাজ করা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব একত্রে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করলে একটা নূতন অবস্থার সৃষ্টি হবে—এই ছিল পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের বক্তব্য। লাহোরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জাতীয় আন্দোলনকারী জনগণের উপর অত্যাচার করায় বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে এসিস্ট্যাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গুলিতে হত্যা করে কাজ আরম্ভ করেছে। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশীয় বিপ্লবীরা বাংলার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক বুঝে আমাদের সঙ্গেই কাজ করা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেন। যতীন দাস নূতন ধরনের বোমা তৈরি শেখার জন্য এলাহাবাদ ও লাহোর যায়। ঐ একই উদ্দেশ্যে নিরঞ্জন সেন পরে চট্টগ্রাম যায়।

কংগ্রেসের সময় নিরঞ্জন সেন, দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস ও বিনয় রায় এবং ঢাকার সতীন্দ্র রায়, ব্রজেন দাস ও অপর কয়েকজন বিপ্লবী কর্মীর সঙ্গে বাংলাদেশের নিষ্ক্রিয় অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। নিরঞ্জন, যতীন ও তাদের বন্ধুরা আগে থেকেই বৈপ্লবিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়েই ছিল। নূতন কার্যভার গ্রহণের জন্য তারা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে।

এবারকার কংগ্রেস অধিবেশন বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। ভলান্টিয়ারদের কুচকাওয়াজ, জাতীয় পতাকা অভিবাদন, কংগ্রেস নগরে শান্তি রক্ষার সুব্যবস্থা পূর্বের সকল কংগ্রেস অধিবেশনকে ছাড়িয়ে ওঠে। বিপ্লবী যুবক ও নেতারাই হয় জাতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার স্টাফ্।

কংগ্রেস নেতারা স্থির করেন, এবারও স্বাধীনতার দাবি কংগ্রেসে তুলবেন না। বাংলার যুবক এতে সন্তুষ্ট নয়, তারা নিষ্ক্রিয়তার জীর্ণ দুর্গ ভেঙে চূর্ণ করে দিতে চায় তড়িৎ গতিতে। বিপ্লবী যুবকদের জানিয়ে দেওয়া হলো, রাত্রিতে

মিটিং হবে। এক ক্যাম্পে প্রায় তিনশ যুবকের সমাবেশ হল। তাদের দাবি—স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতেই হবে। কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কংগ্রেসে আমাদের সংশোধনী প্রস্তাব হবে—'অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা চাই'। কংগ্রেসী যুবক নেতা সুভাষ চন্দ্র প্রস্তাব তুলতে নারাজ, ভারতের অন্য কোনো নেতাই তাঁকে সমর্থন করবেন না, তাই তিনি সাহস পান না। বিপ্লবী বাংলার নবনেতৃত্বের অবমাননা না করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো। সতীন সেন ও অন্যান্য বিপ্লবীরা বক্তৃতা দিয়ে তাঁকে উদ্দীপিত করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হলেন। পরদিন প্রকাশ্য কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংশোধনী প্রস্তাব উথাপিত হল। সম্ভবত এক হাজারের উপর ভোটে 'স্বায়ত্ত শাসনে'র মূল প্রস্তাব পাশ হয়। আমরা প্রায় ৯০০ ভোট পেয়ে পরাজিত হই। বিপ্লবী বাংলার রুখে দাঁড়াবার শক্তি দেখে গান্ধী ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতারা বিস্মিত হলেন।

কলকাতার মজুর নেতাদের পরিচালনায় প্রায় ত্রিশ হাজার মজুরের এক শোভাযাত্রা পার্ক-সার্কাসে কংগ্রেস অধিবেশনে এসে উপস্থিত হয়। ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে তারা তাদের দাবি জানাতে এসেছিল।

কংগ্রেস নেতারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমাদের বিপ্লবী ভলান্টিয়ারগণ তাদের গেট ছেড়ে দেবে না। শ্রমিকরাও প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প। শেষ অবধি গেট খুলে দিতে হল, সহস্র সহস্র শ্রমিক কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে গিয়ে বসলো। শ্রমিক-নেতারা সংক্ষেপে তাদের কথা বললেন। গান্ধীজী বক্তৃতায় তাদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখবেন বলে আশ্বাস দেন।

এবারকার কংগ্রেসে কমিউনিস্ট সাহিত্যের প্রচুর আমদানী হয়েছিল। তার অধিকাংশই সাম্রাজ্যবাদীদের ও ট্রটস্কি-পন্থীদের লেখা বই। জিনোভিয়েভ, বুখারিনের বইও বিক্রী হয়। 'এ. বি. সি. অব কমিউনিজম্' নামক বইখানি বিপ্লবী দলের কর্মীরা ফ্যাশান হিসাবে তখন কাছে রাখত।

পূর্ববঙ্গ ও ঢাকা

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে "ভারতের ব্রিটিশ সরকার সমগ্র বাংলা দেশ দু'ভাগে ভাগ করে "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করে। শিক্ষায়

ও রাজনীতিক চেতনায় উন্নত বাঙালী জাতিকে দুর্বল করার জন্যই লর্ড কার্জন এ-চাল চালেন। এ নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা একজন লেফটেনেণ্ট গভর্নরের শাসনাধীনে রাখা হল। সারা বাংলা এই বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর কোন কথাই স্বেচ্ছাচারী সরকার শুনে নাই। ব্রিটিশ পরিচালনায় নবগঠিত মুসলিম লীগের সমর্থনে ঢাকার নবাব ও অন্যকিছু মুসলমান জমিদারের সহায়তায় ইংরাজ সরকারের বিভেদনীতি সফল হলে বাংলার এই বিচ্ছিন্ন অংশ মুসলমান প্রভাবাধীনে আনা হয়। সারা বাংলা দেশ এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। বিলাতী পণ্য বর্জন, বিলাতী শিক্ষা বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বেল দেশবাসী সক্রিয় প্রতিরোধে মেতে উঠেন। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতার মাঝে যুবকগণ ইংরাজ রাজত্ব ধ্বংসের কথা চিন্তা করতে থাকেন। যুবনেতা পুলিন দাসের উদ্যোগে কলকাতা অনুশীলন দলের মতো ঢাকাতেও অনুশীলন দলে যুবকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলছিল।

১৯০৬ সালে বিপ্লবী চিন্তা-নায়ক ও সংগঠক ব্যারিস্টার পি. মিত্র কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন অনুশীলন দলকে শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের যুবশক্তিকে অনুশীলন দলে সংগঠিত করার ভার পড়ে পূর্ববঙ্গের কৃতি সন্তান পুলিন দাসের উপর। তাঁর পরিচালনায় ঢাকা কেন্দ্র থেকেই পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে প্রায় এক হাজার অনুশীলন-শাখা-সমিতিতে পনেরো হাজার স্বেচ্ছা-সৈনিকের সংগঠন গড়ে ওঠে ১৯০৭ সালে। সিলেট, কাছাড় ও আগরতলা এ-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিলিটারী কায়দায় কুচ-কাওয়াজ, ছুরি খেলা, তরবারি চালনা ও বাঁশের বন্দুক-বেয়নেট চালনায় যুবকদের অনুশীলন সমিতির জাতীয় মুক্তিফৌজ রূপে দাঁড় করবার চেষ্টা ছিল। যুবকদের উচ্ছ্বসিত আগ্রহ ও কর্মোদ্যোগে বাংলার যুবকদের জীবনযাত্রায় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। অনুশীলন সমিতি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলেও শিকড় গাড়তে পারেনি। ঢাকাতেই তার ভিত্তি শক্ত হয় ও পূর্ববঙ্গের সর্বত্র অনুশীলনের আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজনীতিক আন্দোলন ও যুবক সংগঠনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি বে আইনী ঘোষিত হলে তা সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবার গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হয়। নেতা পুলিন দাসকে গ্রেপ্তারের পর রাজবন্দী করে জেলে পুরে দেয়। পুলিন দাসের পর ঢাকার এক বিশিষ্ট পরিবারের যুবনেতা নরেন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও

প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ দলের কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ দাসত্বের বিরুদ্ধে ঢাকা ও পূর্ববঙ্গে দলের কাজ চালিয়ে যান। দেশের ছাত্র, যুব ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন জোরদার ও বিস্তার করা (তারাই বিপ্লবী সংগঠন বিধ্বস্ত করার জন্য দায়ী), দলের কাজের অর্থসংগ্রহের জন্য অত্যাচারী ধনীর ও সরকারী ভাণ্ডারের টাকা লুঠ, বিদ্রোহোদ্দীপক গোপন ইস্তাহার বিলি, অস্ত্রসংগ্রহ করা এগুলিই ছিল তখনকার কর্মসূচী। অপর দিকে পুলিসী সন্ত্রাস—ধর-পাকড়, তল্লাসী, ইংরেজ শাসন বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলা সাজানো, জেল, দ্বীপান্তর, ফাঁসি, গুলি ইত্যাদি নিরন্তর লেগেই ছিল।

জন-আন্দোলনের চাপে গভর্নমেণ্ট ১৯১১ সালে বঙ্গবিভাগ আদেশ রহিত করেন।

সরকারী নিষ্পেষণে যখন পশ্চিমবঙ্গে গুপ্ত সমিতির কাজ মন্দীভূত হয়ে পড়ে, ঢাকা ও পূর্ববঙ্গই তখন অবিরাম গতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগঠন ও আন্দোলন চালিয়ে গেছে। বাংলার বিপ্লবী ধারা বজায় রেখে দেশবাসীর কাছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতার আশা ও বিশ্বাস জিইয়ে রেখেছে। অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গের বিশেষ করে ঢাকার কর্মীরাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গিয়ে দলের শাখা বিস্তার করেছেন, সংগঠক ও পরিচালকের কাজ করেছেন। বিভিন্ন জেলার সন্ত্রাসবাদী কাজের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত প্রায় সবই ঢাকা থেকেই নেওয়া হতো।

ঢাকা থেকে প্রেরিত যুবকগণ ১৯০৭ সালে গোয়ালনন্দ স্টেশনে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেবকে গুলি করে জনাকীর্ণ স্টেশনের উপর দিয়ে নির্বিবাদে চলে গেলেন। ১৯১৮ সালে ঢাকা কলতাবাজারে পুলিসের সঙ্গে বিপ্লবীদের লড়াই হয়। পুলিস বাহিনীর হাতে রাইফেল বন্দুক, বিপ্লবীদের হাতে মসার পিস্তল। অকস্মাৎ সশস্ত্র পুলিসের আক্রমণে নিদ্রোত্থিত যুবকগণ হাতিয়ার নিয়ে রুখে দাঁড়ায়, ঘণ্টাখানেক লড়াইয়ে গুলিবিনিময়ের পর তারিণী মজুমদার এক হাবিলদারকে গুলিতে হত্যা করে ছুটে যাওয়ার সময় নিজেও সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। আহত নলিনী বাগচী জানালার আড়াল থেকে আরো কিছুক্ষণ গুলি চালিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় ধরা পড়লেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পুলিসের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নলিনী বহরমপুর কলেজ থেকে আই. এস. সি পরীক্ষায় ভাল পাশ করে বিশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। একজনের ৪০-বৎসর কারাদণ্ড হয়। পুলিস বাহিনীর আই বি ইন্‌স্পেকটার বসন্ত চ্যাটার্জী গুরুতর আহত হয়।

১৯৩০ সালে ঢাকা পরিদর্শন করতে গেলে বাংলাদেশের পুলিসের ইন্‌স্পেকটার-জেনারল 'লোমান' সাহেব বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হয়। ঢাকা জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হডসন সাহেব আহত হয়েও বেঁচে যান। বিপ্লবী যুবক বিনয় বসু পরে কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণের সময় মারা যান। বরিশাল, ময়মনসিং, কুমিল্লা ইত্যাদি জেলায় বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্য ঢাকায় পরিকল্পিত।

নদী-খাল-বিলের দেশ পূর্ববঙ্গ গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী বলে আমরা ভবিষ্যতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের কল্পনা করে আনন্দ পেতাম। নদী-খালের আঁকা-বাঁকা পথে দ্রুতগামী মাঝি নৌকার সঙ্গে নৌ-পুলিসের স্টীম লঞ্চ পাল্লা দিয়ে পেরে উঠে না।

জল-পথের 'স্বদেশী ডাকাতিতে' তা প্রমাণ হয়েছে। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী এলাকার চেয়ে এ-অঞ্চলের গেরিলারা কম যাবে না। বরিশাল জেলায় অসংখ্য আঁকা-বাঁকা খালের জাল আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।

পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সর্বসাধারণের সজীবতা ও কর্মতৎপরতা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। এখানে জাতীয় চেতনাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গিয়েছিল। এখানে তার প্রকোপ কিছু কম। রাজনীতিক আন্দোলন এখানেই বেশী প্রসার হয়—বিপ্লবী যুব সংগঠন এখানে সহজেই দানা বেঁধে উঠে, এর উৎসাহ-উদ্যোগ জাতীয়তাবোধে প্রেরণা জুগিয়েছে।

আমার দাদা ঢাকার খ্যাতনামা উকীল আনন্দ পাকড়াশী অনুশীলন দলের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর ছেলে আমার কাকা প্রকাশ পাকড়াশী—লক্ষ্মীবাজার সমিতির সম্পাদক—বিপ্লবীভাবে উদ্দীপ্ত। তাদের শিক্ষা ও কর্মাদর্শ আমাকে কিশোর বয়সে অনুপ্রাণিত করে। ঢাকার পাকড়াশীদের বাড়ির লোক বলে নরসিংদীর সাটীর পাড়া স্কুলে আমার মর্যাদা বেশী ছিল। ছাত্রনেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা অনুশীলন দলের কাজে আমাকে উৎসাহিত করতো। সাটীর পাড়ায় ও আমার নিজ গ্রাম মাধবদীতে যুবকগণ লাঠি ও ছুরি খেলায় মেতে উঠেছিল। প্যারেড করতেও খুব উৎসাহ। সারা মহেশ্বরদী পরগণা অনুশীলন দলের কাজে উচ্ছ্বসিত। সমিতি বে-আইনী হয়ে গেলেও চাপা উচ্ছ্বাস গুপ্ত সমিতির কাজের শক্তি জোগায়। নরসিংদীর সাটির পাড়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনামা উকীল ললিত রায়, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রনেতা ত্রৈলোক্য মহারাজ ঢাকা ইংরাজশাসন বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন; মহারাজ ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। অনুশীলন দলের প্রধান নায়ক ৭ বৎসরের জন্য

দ্বীপান্তরে প্রেরিত হন। বিক্রমপুরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাও এই মামলায় দণ্ডিত হয়। বিক্রমপুরের অনেক ছেলে বিপ্লব মন্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন।

বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২১-২২ সালে জেল খেটে সরকারী নির্যাতন ভোগের গৌরব নিয়ে ফিরে এসে নরসিংদী মুসলমান ব্যবসায়ীদের নবীন নেতা সুন্দরালী মিঞার আহ্বান এল তথায় তাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সংগঠক ও পরিচালকের কাজ করার জন্য। এখানে অধিক সংখ্যক ছাত্রই মুসলমান। আমার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বুঝেই সুন্দরালী মিঞা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মত নিয়ে আমাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেন। কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান যুবকদের সংগঠন গড়ার কাজও আমার উপর এসে পড়ে। যুবকদের আমি বুঝিয়েছিলাম আমাদের স্বাধীনতা কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়, ইহা সমগ্র ভারতের সকল মানুষের জন্য। কাজকর্ম ভালই চলছিল,—উৎসাহী ছেলেদের স্বাধীনতা অর্জনের ঝোঁক বাড়ছিল। পুলিসও গুপ্তচর দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মুসলমান মোড়লদের মন বিষাক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা চালাল। ঢাকা থেকে বড়বড় পুলিস অফিসাররা এসে বুঝাতে লাগলেন গভর্নমেণ্ট মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য স্কুলে প্রচুর অর্থসাহায্য মঞ্জুর করতে পারে। কিন্তু জেলখাটা বিপ্লবীকে স্কুলে রাখলে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। স্কুলেরও বদনাম হবে। ধীরে ধীরে সম্মানের সহিত স্কুল হতে আমাকে বিদায় দিলেন। সুন্দরালী মিঞা ব্যথিত চিত্তে জানালেন আমার কোন কথা টিকে নাই। শুনেছিলাম ঢাকা নবাব বাড়ির প্রভাবও আমার অপসারণের ব্যাপারে কাজ করেছে।

বালুসাইর, বাঘাটা, রহিমাবাজ, বাইপুর এবং আরো কত বিস্মৃত গ্রামে ঘুরে কৃষকদের সভা ও বৈঠক করেছি। ইংরাজ শাসনের শোষণে কৃষকজীবনে যে দারিদ্র্য দুঃখ এসেছে তার বিরুদ্ধে কৃষকসংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেছি। মুসলমান কৃষকদের বাড়িতে থেকেই আমি আন্দোলন করেছি, তাদের সমর্থনে ও আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়েছি। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর যোগসাজশেই আমাদের জমিদাররা প্রজাপীড়ন করে খাজনার জুলুমবাজী করে;—তাও অকপটে বলেছি, কৃষকদের সমর্থনও পেয়েছি।

কলকাতা কংগ্রেসের পরই আমাকে ঢাকায় যেতে হল। সেখানেই কাজ করার নির্দেশ পেয়েছিলাম। ঢাকা জেলায় বাড়ি হলেও ঢাকার সঙ্গে আমার

পরিচয় খুব কম। ছোটবেলার রাজনীতিক শিক্ষা ও কর্ম-সাধনা মহেশ্বরদী পরগনায় মাধবদী, সাটিরপাড়া, নরসিংদী প্রভৃতি গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এ সকল স্থানের মধ্যবিত্তদের ভিতরে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। তারই মাঝে আমার রাজনীতিক চেতনায় উন্মেষ। এর পর স্বদেশী দলের ডাকে ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসা অবধি বাইরে বাইরেই কাটিয়েছি। উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, মালদহ, পরে পূর্ববঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনায় গুপ্ত বিপ্লবী-সমিতির কার্যভার নিয়ে গোপনে ঘুরেছি। প্রায় ষোল বৎসর জেলে ও বাইরে বাস করার পর ১৯২৯ সালে পার্টির নির্দেশে আমাকে ঢাকায় আসতে হল। মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম। বিপ্লবী-আন্দোলনের পীঠস্থান এই ঢাকা, বিখ্যাত পুলিন দাসের পরিচালিত অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র এই ঢাকা, বিপ্লবী বীর নলিনী ও তারিণীর রক্ত রঞ্জিত এই ঢাকা আমার কর্মস্থল হল।

ঢাকায় প্রায় দশ হাজার ছাত্র পড়াশুনা করতো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের পারিবারিক জীবনের অসাচ্ছন্দ্য, বৈচিত্র্যহীন সামাজিক জীবন ও দাসত্বপীড়িত রাজনীতিক জীবন সহজেই তাদের ব্রিটিশ বিরোধী গোপন-সংগ্রামের পথে আকৃষ্ট করতো। স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে তারা এতটুকু পিছু-পা নয়। বার বার থানাতল্লাশ, গ্রেপ্তার, জুলুম-অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ড পেয়ে পেয়ে যুবকদের দৃঢ়তা আরো বেড়ে গিয়েছিল।

স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেসে, হোস্টেলে, শহরের অলি-গলিতে বিপ্লবী যুবকদের প্রতিষ্ঠিত বহু ক্লাব, আখড়া, সঙ্ঘ, পাঠাগার এবং গ্রুপ গড়ে উঠে। সরকারী রিপোর্টে ঢাকা জেলাকে বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডা (hot bed of dangerous terrorists) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শহরের উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরানী প্রভৃতি শিক্ষিত শ্রেণীর লোক বিপ্লবী যুবকদের ত্যাগী, স্বদেশহিতৈষী কর্মবীর বলে মনে করতেন; এরাই যে দাসত্ব পীড়নের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে তা তখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অস্বীকার করতে পারেননি।

আমরা জেল থেকে নূতনভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রেরণা নিয়ে এসেছি। বাইরে এসে দেখি, আবহাওয়া সংগ্রামাত্মক কাজের বেশ অনুকূলে। যুবকরা উন্মুখ হয়ে আছে শত্রুর বুকে ছুরি বসাবার জন্য। 'দাদা'রা কেবল

বলছেন, ধৈর্য ধর—ব্যাপক বিপ্লবের অপেক্ষায় ধৈর্য ধর। কিন্তু যুবক মনে ধৈর্য আর ধরে না। নেতৃবর্গের কথায় তারা আশ্বস্ত হতে পারছে না।

নেতারা এমন কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থাও দেখাতে পারছেন না, যার ভিতর দিয়ে যুবকদের কর্ম-স্পৃহা মূর্ত হয়ে উঠতে পারে।

ঢাকার অগ্রণী যুবকদের সঙ্গে কথাবার্তায় আমি আমাদের জেলের পরিকল্পিত আইরীশ ইস্টার বিদ্রোহের মতো ছোট একটি বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কথাই বলি। যুবকগণ তাদের মনোমতো কথা পেয়ে আমার কাছে বেশী করে আনা-গোনা করতে লাগল—আমাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে একদল যুবক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উদ্যোগী হয়ে অনেক যুবককে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়—আমার নির্দেশ মতো তারা কাজও করে। এত ছেলে আমার কাছে আসে, আমার নির্দেশ মতো চলে এটা ঢাকার নেতারা পছন্দ করেননি। ফলে আমার উপর শুধু জেলা কংগ্রেস অফিসের কাজ করার ভার অর্পিত হল; ছাত্র-সংগঠনের কাজে আমার যাওয়ার প্রয়োজন হবে না একথাও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যুবকগণ এতে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। "যখন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সংগ্রাম করা আবশ্যক, তখন দলের 'দাদা'রা এ কি সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দিচ্ছেন?"—তখন বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকদের মুখে মুখে এই প্রশ্ন। বাধা নিষেধ সত্ত্বেও দলের ছাত্র ও যুবক কর্মীরা আমার সংস্পর্শে আসা ত্যাগ করেনি। ওদেরই চেষ্টায় ঢাকা শান্তি-সমিতি, সিলেট জেলায় ঢাকা দক্ষিণ যুবক সমিতি ও আরো দু'তিনটি সমিতির ও পাঠাগারের বাৎসরিক অধিবেশনে আমাকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। আমার এই ধরনের প্রভাব বিস্তার হওয়াটা নেতারা আপত্তিজনক মনে করলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে তখন সভাপতি বা বক্তা স্থির করার নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হল।

ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির অফিস থেকে অসুস্থ অবস্থায় মেডিকেল মেসে ছাত্র-নেতা কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর আতিথ্য গ্রহণ করলাম। অসুখ সেরে যাওয়ার পরও সেখানে রয়ে গেলাম এবং কতকটা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে শুরু করি। এ সময় ঢাকায় বিভিন্ন দলের কর্মীদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়। বরিশাল, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য স্থানের অনুশীলন দলের কর্মীরা ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে এবং আমার সমধর্মী কর্মীদের সঙ্গে কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। সকলেরই এক কথা—'একটা কিছু করা চাই, আর বসে থাকা চলে না।'

চলতি অবস্থার প্রতি সর্বত্র একটা অসন্তুষ্টির মনোভাব। লক্ষ্যটা ব্যাপক সন্ত্রাসবাদের দিকে।

সন্ত্রাসবাদই তখন বাংলার যুবজনের চিত্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রুশিয়ার বিপ্লব-তরঙ্গে তারা আন্দোলিত হয়েছে, উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ঐ মহান বিপ্লবের আদর্শ ও বাস্তব কর্মপন্থা তাদের মনে কোনো রেখাপাত করেনি। আয়র্ল্যাণ্ডের ইস্টার বিদ্রোহ ও পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রাম তারা অনুকরণীয় বলে মনে করতো; প্রতি লাইব্রেরীতে 'সীনফেন ও ইস্টার বিদ্রোহের ইতিহাস,' 'ডি ভ্যালেরার জীবনী,' ডান ব্রীন লিখিত 'আমার স্বাধীনতা সংগ্রাম' প্রভৃতি বইগুলির চাহিদা বেশী ছিল। সীনফেনদের অনুকরণে ভলাণ্টিয়ার দল গঠনের আওয়াজ ওঠে কলকাতা কংগ্রেসের সময় থেকে। ঢাকায় 'বি. ভি.' (বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠনে মনোযোগী হয়। এ-সকল সত্বেও সে-সময়ের বিপ্লবীরা বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন ছিল না। বুর্জোয়া স্বার্থবুদ্ধি তখনো জাগেনি। মানবতার উদার আদর্শে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সাধনায় তারা মগ্ন ছিল, স্বাধীন অবস্থার স্বরূপ কি তা তারা বিশ্লেষণ করেনি; কাদের স্বাধীনতা, কেই বা লড়াই করে অর্জন করবে তার ধারণা ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শক্ত-শৃঙ্খল ভাঙতে হবে মনের উৎসাহে, হৃদয়ের দুর্জয় আবেগে—এই সহজ সত্যটাই শুধু তারা আঁকড়ে ধরেছিল। এ-সময়ের মধ্যে আরো অগ্রণী এক কর্মীদল স্পষ্টতর লক্ষ্য ও কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করে গণ-বিপ্লবের যুক্তিযুক্ত পথে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। বাংলায় "শ্রমিক-কৃষক পার্টি" এই অগ্রণী কর্মীদের নিয়ে গঠিত। ১৯২৮-২৯ সালে ঢাকায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি যুবক গোপাল বসাকের সঙ্গে মিলে ঐ পার্টির শাখা গঠনের প্রয়াস পায়। ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিকদের মধ্যেও তারা প্রচারকার্য চালায়, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা তখনো গণ সংগ্রামের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি এবং মজুর কৃষকের দলকে কোনো আমল দেয়নি।

অনুশীলন পার্টির হাতে বোমার খোল (Shell, বোমা তৈরীর ফরমুলা, পিস্তল-রিভলভার যা কিছু ছিল, যুবকগণ তা গোপনে সরাবার চেষ্টা করে। সন্দেহ হওয়া মাত্র নেতারা ঐ সব জিনিস অন্য জেলায় পাঠিয়ে দেয়—যেখানে মেরুদণ্ডহীন 'দাদা'-ভক্ত ছেলেদের প্রভাব বেশী। বিদ্রোহী যুবকগণ এরই মধ্যে কিছু কিছু জিনিস সরিয়ে ফেলেছিল। নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল মনের পরিচয় পেয়ে নূতন কর্মীরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে কাজ করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হল।

সংগৃহীত "করমুলার" সাহায্যে যথাযোগ্য লোক দিয়ে বোমা তৈরির ব্যবস্থা হয়, ঢালাই কারখানার এক যুবক মালিকের সাহায্যে বোমার 'খোল' (শেল) প্রস্তুতেরও আয়োজন হয়। টাকা সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকে। বরিশাল, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য কয়েকজন বেরিয়ে গেল। ঢাকায় বি. ভি. দলের সঙ্গেও সংযোগ হয়। কলকাতা থেকে নিরঞ্জন সেন ঢাকায় আসার পর আমরা তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার কথাবার্তা চালাই। শ্রীসঙ্ঘের একটি অগ্রণী অংশ আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা আলোচনা করে। সমস্ত আলাপ-আলোচনাই গোপনে করা হত। সকল দলের ভিতরই উৎসাহী কর্মীরা পুরানো নেতাদের না-জানিয়ে কাজ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠে। দলের নেতাদের সঙ্গে কর্মপন্থা নিয়ে সকল রকম তর্ক-আলোচনার পর যখন বোঝা গেল যে, অনতিবিলম্বে ছোট গেরিলা দল তৈরি করে কাজ করার ইচ্ছা তাদের নাই, তখনই—একমাত্র তখনই আমরা পৃথকভাবে কাজের জন্য মন স্থির করি। অনুশীলন ও যুগান্তর এই উভয় দলের মধ্যেই অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দেয়; অন্যান্য গ্রুপের মধ্যেও ঐ একই বিরোধ। বিভিন্ন দলের সংগ্রামোৎসাহী কর্মীরা দলাদলি ভুলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আগ্রহে এক হয়ে গেল। একদিকে নেতারা বিপ্লবের নামে নিষ্ক্রিয়তায় নিমগ্ন হল, অপর দিকে কর্মীরা আশু বিদ্রোহের নামে সক্রিয় হয়ে উঠল। উৎসাহী ও মেধাবী কর্মীরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। নেতাদের বিধি-নিষেধ, শাসন ও কড়া নজর কিছুই উদ্দীপনার গতিরোধ করতে পারেনি।

ঢাকা থেকে মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ, বরিশাল, কলকাতা ও অন্যত্র যেতাম। বীর শহীদ যতীন মুখার্জীর স্মৃতি উৎসবের দিনে গেণ্ডারিয়ার এক বাগানবাড়িতে আমরা বিভিন্ন দলের কর্মীরা গোপনে সম্মিলিত হই।

নরেন সেনের উপদেশ

ঢাকার নরেন সেন অনুশীলন সমিতির পুরানো নেতা—কিন্তু পরে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু পার্টির সঙ্গে সংস্রব একেবারে ত্যাগ করেননি; সরকারী নিষ্পেষণ যন্ত্রের পেষণে তাঁকে

কিছুদিন পর পরই পিষ্ট হতে হয়। যখন দলের ভিতর নেতাদের সঙ্গে আমাদের কাজ নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল তখন তাঁর সঙ্গে একদিন আমার কথাবার্তা হয়।

তিনি বলতে লাগলেন, "কি হে সতীশ, তোমরা নাকি দলের ভিতর একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছ? এতে কোনো কাজ হবে না; যদি কিছু করতে চাও সকলে মিলে একসঙ্গে করলেই তা কার্যকরী হবে।"

বললাম, "আমরা তো তাই চাই, কিন্তু তা হয় কৈ? নেতারা তো কোনো কাজে এগুতে চান না আর আমরা চাই বলে আমাদের প্রতি তাঁদের ক্রোধ"

তিনি বললেন, "তোমারাই বা পৃথক হয়ে কতটুকু কি করতে পারবে? দ্বন্দ্ব-বিরোধে তোমাদেরই শক্তি ক্ষয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসে দলাদলি, ছাত্র-আন্দোলনে ও শ্রমিক-আন্দোলনে দলাদলি। সন্ত্রাসবাদী দলগুলির বিরোধ তো আছেই। পাশ্চাত্য দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাধনায় ভেদ-বিভেদ এসে তোমাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত করে দেয়। যে-শত্রুর দেহে আঘাত দিতে চাও সে-শত্রুই তোমাকে আঘাত করে। তোমাদের ঐক্য ভেঙে ভেঙে পড়ে।"

বললাম, "হ্যাঁ, আপনার কথা একান্ত সত্য। কিন্তু আমরা তো নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সুমুখপানে এগিয়ে চলতে চাই। যারা পিছনে চলতে থাকে, আগে চলতে চায় না, ঐক্য রক্ষার জন্য আমরা কি পিছনে হটে গিয়ে তাদের সঙ্গে দাঁড়াব? প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য হবে কোথায়? কোন্ সূত্রে? বলে দিন। অনুশীলন পার্টির অতীত ইতিহাসেও তো এমন অবস্থা এসেছিল। সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের ভয়ে ভীত হয়ে তদানীন্তন দলের নেতা মাখন সেবা-ধর্মের ভাঁওতা দিয়ে সন্ত্রাসবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ক্রমে বিপ্লবী-আন্দোলন থেকে সরে পড়েছিলেন। পরবর্তী যুগে পুলিন দাস বিপ্লবী-আন্দোলনের অগ্রগতির পথে আপনাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারেননি বলে আপনারা পুলিন বাবুকে পিছনে ফেলে রেখেই এগিয়ে এসেছিলেন। আমার মনে হয়, অগ্রগামী দলই প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, স্বাধীনতা-সংগ্রামকে তারাই সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারবে। অগ্রবর্তীদের গতির প্রসারতায়, সংগ্রামের তীব্রতায় পশ্চাদ্বর্তী ও নিষ্ক্রিয়ের দল সক্রিয় হয়ে ছুটে আসবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ময়দানে।"

নরেন দা বলেছিলেন, "যা ভাল বোঝ কর; চঞ্চল ও অধৈর্য হয়ে কিছু করো না। একতাবদ্ধ হয়ে চলার যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। দেখো যেন

পাশ্চাত্য-দানবের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ভেদ বৈষম্যে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত না হও। পাশ্চাত্য দানব শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাচ্যের দেব শক্তির জয়ের দিন সমাগত। যেমন করে হোক ঐক্য রক্ষা করে চলাই আজকের দিনের কর্তব্য।

নতুন উদ্দীপনা

১৯২১-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর দেশে ক্রমশ অবসাদ ঘনিয়ে আসছিল। ব্যর্থতা, নিষ্ক্রিয়তা ও সরকারী নিষ্পেষণে সামনে চলার পথ রুদ্ধ করে দেয়। অন্তরের বেদনা পথ খুঁজে পায় না। দেশের কর্মীরা ফাঁসিতে, পুলিশের গুলিতে মরেছে, শত শত বন্দী জেলে পচে মরছে। দেশের জনগণের লাঞ্ছনা, দুর্গতি, অসাফল্য ও জীবনের মর্মবেদনা যেমন ছিল তেমনই আছে। বিদেশে জাতীয় জীবনের অগ্রগতির খবর বাংলার যুবক চিত্তে দোল দিয়ে যায়: রুশরা গণ-বিপ্লবে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়ে আজ পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান নিয়ে জাতি গড়ায় মন দিয়েছে; চীনের জাতীয় বিপ্লব বিজয়-গৌরবে উদ্ভাসিত; তুরস্ক অতীতের মলিনতা ও কুসংস্কার ভেঙে আধুনিক মানুষের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে; ক্ষুদ্র আয়র্ল্যাণ্ড অসীম বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে দুর্ধর্ষ ইংরাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। শুধু আমরা ভারতবাসীরাই কি পিছিয়ে পড়ে থাকবো? কেন আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় ভেঙে ভেঙে যায়? স্বদেশী আন্দোলন গেল (১৯০৫-৭), যুদ্ধের দুর্দিনে বিপ্লবের সুযোগ হারিয়ে গেল (১৯১৫), অসহযোগ আন্দোলন গেল (১৯২১-২২); এতদিনের আঘাতে আঘাতে আত্মবিস্মৃত জাতি আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েছে—পাঁচ বৎসর অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তার পর বাংলার যুবক ধৈর্যের চরমে এসে পৌঁছেছে।

১৯২৯ সাল: নূতন কিছু করার উদ্দীপনা তাদের মনে। পুরানো বিপ্লবী কর্মীরা সব ফিরে এসেছে জেল থেকে। এখন আর ভাবনা কি? এরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। মরণের ভয় আর নেই। বিপ্লবের অগ্নিশিখা স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ যুবককে আজ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ভাবপ্রবণ বাংলার তরুণরা আজ ভেসে যেতে চায়, ফেলে যেতে চায় কিনারায় সব বন্ধন। সত্যই এ-সব অভ্যুত্থিত 'যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে' কে?

এ-শুধু সাহিত্যের ভাষা নয়, কবিত্বের আবেগ নয়, বাংলার অগ্রণী যুবকদলের অন্তরের এইটেই তখন আসল রূপ। সে-সময়ের বিভিন্ন যুবক সম্মেলনের বক্তাদের ও সভাপতির বক্তৃতাগুলি পড়লে এ-মনোভাবের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আয়র্ল্যাণ্ডের ইস্টার বিদ্রোহের কাহিনী ও পরবর্তী বিদ্রোহ-আন্দোলনের সাহিত্য তখন বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। ডান ব্রীন-এর "মাই ফাইট ফর আইরীশ ফ্রিডম" বই পড়েনি বা পড়ে উদ্দীপনা পায়নি এমন যুবক কোনো যুব-সঙ্ঘের মধ্যে ছিল না। যে-জাতি স্বাধীনতার জন্য রক্ত দান না করে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে সে-জাতি স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।—বুকের রক্তে যারা দেশ স্বাধীন করার জন্য ব্যগ্র সেই ভাবুক বাঙালীর ছেলের কাছে আইরীশ বিপ্লবী Lallor-এর ঐ বাণী তাদের হৃদয়েরই কথা।

ক্ষুদিরাম, কানাইয়ের আত্মদানের সময় থেকে যত শহীদ ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেল তার সেই বিশ বছরের রক্তমাখা ঐতিহ্য পেয়ে বাংলার যুবক আর শুধু কথায় মাঝে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় না; রাখতে পারে না। তারা চায় কাজ—প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কাজ। শক্তিমান শত্রুর বুকে আঘাত দিয়ে মরবে তাও স্বীকার; তবু নিষ্ক্রিয়তার জড়তা ঘোচাতে হবে। বুকের রক্তে অবসন্ন জাতীয় জীবনকে প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। এমনই জেদ—এমনই সঙ্কল্প করে বসে আছে বিপ্লবীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি গ্রুপ। কারামুক্ত নেতারা বিপ্লবী যুবকদের, এ-বিপুল আকাঙ্ক্ষার—এ আকুল আগ্রহের কোনো প্রতিবিধান না করে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিলেন। তাদের উত্তরের মর্মটা এই রকম 'ধৈর্য ধরে আমাদের উপর নির্ভর করে বসে থাক, সময় এলে আমরা বলবো। আপাতত কংগ্রেস ইলেক্‌শনে, কাউন্সিল ইলেক্‌শনে আমাদের জন্য এবং পার্টির জন্য ভোট সংগ্রহের কাজ কর'। যুবকের চিত্ত এতে সায় দিল না, ভারত-বিপ্লবের গালভরা কথায় তারা আর ভুলতে রাজি নয়। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাই তাদের এখন কাম্য, ক্ষুদ্র হলেও সে-চেষ্টা হবে তেজোদ্দীপ্ত শক্তিতে উজ্জ্বল, আগুনে উদ্দীপ্ত—আত্মদানের সবল আদর্শ দিয়ে জাগিয়ে তুলবে জনমনে একটা নব চেতনা। যতীন দাস, সূর্য সেন, নিরঞ্জন সেন, গণেশ ঘোষ, প্রমুখ যুবক নেতারা—যুবকদের কাছে নূতন পথের সন্ধান নিয়ে আসে। স্বাভাবিক প্রগতির পথ যেই রূপ নিল নব-নেতৃত্বের নূতন কার্যধারার মধ্যে, অমনি নেতা ও উপনেতাদের এতদিনকার প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মন রুদ্র মূর্তি ধারণ করল।

ভয় দেখানো, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া, দল থেকে বিতাড়ন, ছেলেদের মধ্যে

বিভেদ সৃষ্টি করা এবং পরে প্রকাশ্যভাবে হাসি টিটকারী শুরু হল নূতন সংগ্রাম-প্রয়াসীদের বিরুদ্ধে।

প্রথমে দলের ভিতরে প্রবীণে আর নবীনে বিরোধ-বিতর্ক মন-কষাকষি চলে। পরে ক্রমশ বিভিন্ন দলের নবীন কর্মীরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়ে। কিছু করার জন্য নিজ নিজ দলের বা দল-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয়। যুগান্তর দলের বরিশাল শাখা, চট্টগ্রাম দল, অনুশীলন দলের ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, দক্ষিণ কলিকাতা ও বহরমপুরের প্রধান অংশ অনতিবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য আগুয়ান হয়। ঢাকার বি. ভি. দলও সম্মিলিত এই সংগ্রামোন্মুখ দলে যোগ দেয়। সকল দলের যুবকদের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিল।

রংপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন। পূর্বেই কথা হয়েছিল, সেখানে আমরা মিলিত হয়ে সব পাকাপাকি স্থির করব। নিরঞ্জন সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম), যতীন দাস, বিনয় রায় (দক্ষিণ কলকাতা) এবং আমি—আমরা এই পাঁচজন রংপুরে বসে কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করি। বাংলা দেশে একটা বিদ্রোহ করা একান্ত আবশ্যক। দলাদলিতে দেশ ডুবে গেছে। বিপ্লবী দলগুলি (ছোট বড় মিলে প্রায় ১০টি) পরস্পর বিরোধ করে। বাংলার কংগ্রেস সুভাষ বসু ও জে. এম. সেনগুপ্ত এই দুই দলে বিভক্ত—ছাত্র আন্দোলনও দ্বিধাবিভক্ত (A.B.S.A. ও B.P.S.A.)। শ্রমিক-আন্দোলনে দলাদলি আছে। এই ভেদ-বিভেদ জনগণের প্রাণে নৈরাশ্যের অবসাদ এনে দিয়েছে। তাই তখন দুর্গত বাংলার রাজনৈতিক জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন। একটা বিরাট ধাক্কা না পেলে মোহগ্রস্ত সুপ্ত বাঙালী জীবন ঐক্যের পথে, স্বাধীনতার পথে সচেতন হয়ে উঠবে না। আমাদের রক্তদানে—২।৩শ যুবকের জীবন আহুতিতে বাংলার রাজনৈতিক জীবন সজীব হয়ে উঠবে। সন্ত্রাসবাদের পথ (ব্যক্তিগত সংগ্রামের পথ) আমরাই লোকের সামনে খুলে ধরেছি, অন্যান্য প্রদেশে এখনো আমাদেরই প্রবর্তিত সেই পুরানো অকেজো পন্থা আদর্শ হয়ে আছে। আমরা এবার ছোট ছোট বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম করে বিপ্লবী কর্মধারার উচ্চতর পন্থা প্রতি[illegible] করব। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শত্রুর ঘাঁটি আক্রমণ করে রক্তগঙ্গা ব[illegible] দেবো। হয়তো পরিণামে আমাদেরই বুকের রক্তে বাংলার রাজনৈতিক মরুপ্রান্তর রঞ্জিত হয়ে উঠবে। তার ফলে নিষ্ক্রিয়তার স্থানে শুদ্ধ সক্রিয় এক জাতীয় আন্দোলন দাঁড়িয়ে যাবে। পরে যারা কাজ করবে তাদের সামনে আমাদের মরণের একটা সঙ্গতি রেখে যেতে পারবো।

এমনি ছিল তখন সংগ্রামশীল বিপ্লবী যুবকের চিন্তাধারা :

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'

রবীন্দ্রনাথের ঐ কটি লাইন তখন আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছিল।

সম্মিলিত দলের নূতন নেতারা কোনো একটা কিছু করার প্রেরণাকে একটা নির্দিষ্ট ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য গোপনে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে সিদ্ধান্তে পৌছেন। রংপুর সম্মেলনের সময় আমাদের মোটামুটি একটা কার্যপদ্ধতি স্থির হয়ে যায়। কথা হল পরিকল্পনা অনুযায়ী সত্বর প্রস্তুতির কাজে লেগে যেতে হবে। অম্বিকা চক্রবর্তী চিঠিপত্র নিয়ে চাটগাঁ চলে গেলেন। বিনয় রায় কলকাতায় এবং ব্রজেন দাস প্রভৃতি ঢাকায় ফিরে গিয়ে গোপনে কাজ আরম্ভ করেন।

তিনটি জেলায় অস্ত্রাগার আক্রমণ করা, ঢাকা ও কলকাতায় ছোট ছোট ঘাঁটি আক্রমণ একই দিনে একই সময়ে অভ্যুত্থান—শুধু এই পরিকল্পনা নিয়ে আরম্ভ, তারপর অবস্থানুযায়ী কতগুলি ব্যবস্থা করার কথা হয়। পরবর্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঐ প্ল্যানেরই একটা অংশ যা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে গৌরবজনক পরিণতি লাভ করেছে।

দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসে একত্রে সম্মিলিত হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে এই নূতন কর্মীদের 'রিভোল্ট গ্রুপ' বা বিদ্রোহী দল নামে অভিহিত করা হত, পরে 'এড্‌ভান্স' অগ্রগামী দল বলতো।

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি আমি ও নিরঞ্জন ময়মনসিংহ ভ্রমণের সময় একদিন কাগজে পড়ি, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন দাসকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। এ-সংবাদে আমরা খুবই আঘাত পাই; যতীন দাস মশায় পিস্তল ও রিভলবার ইত্যাদি অস্ত্র সংগ্রহের ভার নিয়েছিল। উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার ভারও পড়ে যতীন দাসের উপরে। যাই হোক, আরব্ধ কার্য আমাদের করে যেতেই হবে।

রাজবন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের দাবি নিয়ে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা অনশন করে। যতীন দাস ৬৩ দিন অনশনের পর লাহোর জেলে মারা যায়। তার হাত পা সর্বাঙ্গ ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ে, তারপর শ্রবণশক্তি লোপ পেয়ে যায়, তারপর দৃষ্টিশক্তি, তারপর বাকশক্তিও যায়। সর্বশেষে জীবনের শেষ নিশ্বাস

ফেলে যতীন তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। গভর্নমেণ্ট কিছুতেই রাজবন্দীদের ন্যায্য অধিকার মেনে নিতে রাজী হল না। সেপ্টেম্বর মাসে যতীনের মৃতদেহ কলকাতায় আনা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক মৃত শহীদের শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। সেদিন কলকাতার শোভাযাত্রায় বিদ্রোহাত্মক এক ইশ্‌তেহার বিলি করা হয়।

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় চটকলের লক্ষ লক্ষ মজুরদের বিরাট ধর্মঘট হয়। এত বড় ধর্মঘট পূর্বে আর হয়নি। বাংলার মজুর শ্রেণীও তখন নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, সংগ্রাম ও সংগঠনের পথে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। গভর্নমেণ্ট বাংলা দেশ থেকে দশজন শ্রমিক নেতাকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে তখনকার মতো শ্রমিক-আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়। আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মেম্বার রূপে প্রাদেশিক সভায় শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জী ও রাধারমণ মিত্রকে দিনের পর দিন বক্তৃতার সময় হাসি, বিদ্রূপ ও টিট্‌কারি সহ্য করে নিজেদের বক্তব্য বলে যেতে দেখেছি। কংগ্রেসী যুবক সভ্যগণ বারবার চেঁচিয়ে বলতেন: 'শ্রমিক দাদা যথেষ্ট বলেছেন, আর কেন, বসুন বসুন।' প্রেসিডেণ্ট সুভাষ বসু শ্রমিক নেতাদের বলবার অধিকার দিতেন, কিন্তু তাঁদের কথা অপরকে শুনবার সুযোগ দিতেন না। মধ্যবিত্তের জাতীয় দলের গণ্ডগোলে শ্রমিকদের কণ্ঠধ্বনি চাপা পড়ে যেত।

কিছুদিন পর কয়েকজন কংগ্রেসী নাগপুর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে বলে যে, শ্রমিক-আন্দোলনে যে-বিপুল জাগরণ দেখা দিয়েছে তাতে জাতীয় কংগ্রেসের চেয়েও শ্রমিক কংগ্রেস শ্রেষ্ঠতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। এ-সংবাদে আমরা পুলকিত হয়েছিলাম। বৎসরের প্রথম ভাগে আমি মজুর কৃষক পার্টির আপিসে স্প্রাট সাহেবকে দেখতে যাই—চটকল মজুর ইউনিয়ন আপিসেও গিয়েছিলাম। শ্রমিক কর্মীদের কর্মতৎপরতা ও শ্রমিক কৃষক সম্পর্কিত বইয়ের লাইব্রেরী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস কর্মীদের দলাদলি সঙ্কীর্ণতার মতো এ আন্দোলনেও দলাদলি ছিল বলে আমরা শুনি। আমরা মনে করতাম, এক দল যুবকের আত্মদানে এ-অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। আমাদের প্রাথমিক কার্যসূচী শেষ হয়ে গেলে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থায় জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। কংগ্রেস ও শ্রমিক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে হাতে হাত মিলিয়ে চলবে। এই নিশ্চিত ধারণার বশবর্তী হয়েই তখন আমরা কমিউনিস্ট পরিচালিত 'ইয়ং কমরেড লীগ'-এর সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারিনি। রক্তশোষক

বিদেশী শত্রুর রক্তে দেশের মাটি রঞ্জিত করার নেশা তখন আমাদের পেয়ে বসেছে। বিনিময়ে আমাদের জীবন দিতে হয় সেও ভাল। শত্রুর শেষ চাইই।

একটা সশস্ত্র অভিযান করার জন্য তখন আমাদের নেশা পেয়ে বসেছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের ইস্টার বিদ্রোহ আমাদের আদর্শ—বাংলা দেশেও অনুরূপ কিছু একটা চাই, যুবকগণ সেই নেশায় মশগুল, মধ্যশ্রেণীসুলভ রোমান্টিক সংগ্রামের মনোবৃত্তি তখন তাদের আচ্ছন্ন করেছিল। দেশের পরাধীনতা ও রাজনীতিক অবস্থা এ-মনোবৃত্তিকে জাগ্রত, সম্প্রসারিত ও পুষ্ট করে তুলেছিল।

নভেম্বর মাসে সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ কলকাতায় আসেন। মেছুয়াবাজারে নিরঞ্জন সেনের বাসায় আমাদের গোপন পরামর্শ হয়। একবার কাজ আরম্ভ করলে এবং সাহসোচিত সাফল্য দেখাতে পারলে সকল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদলের কর্মীরাই আমাদের পথে আসবে, এ বিশ্বাস নিয়েই আমরা আলোচনা করি। বিদেশী শাসন-বিরোধী মনোভাব এত প্রবল যে দু'চার জন নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী ছাড়া দেশের জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি আমরা পাবই—এ কথাও জানা ছিল। কিন্তু অস্ত্রের অভাবটা আমরা খুবই অনুভব করতাম। প্রচুর অস্ত্রের সংস্থান হলে কী না করা যায়। তবে অভাব বোধ আমাদের হতাশ করতে পারেনি; যতটুকু শক্তি তা নিয়েই কাজে নামতে হবে এই সঙ্কল্প করেই চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশাল অস্ত্রাগার আক্রমণের কথা হয়েছিল।

নভেম্বর মাসে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক "লাল ইশ্‌তেহার" বিতরণ করে যুবকদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করা হয়েছিল।

১৮ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রিতে মেছুয়াবাজারের বাড়িতে অকস্মাৎ ঘুম থেকে চোখ মেলে চেয়ে দেখি, সার্জেন্টদের হাতের টর্চ আমাদের চোখে মুখে জ্বলজ্বল করছে। তাদের খোলা রিভলবার আমাদের বুকের উপর। 'হাত তোল—হাত তোল' বলে চেঁচাচ্ছে। হাত আর তুলবো কি? হাত-পা তো পুলিসের বুটের তলায় চাপা পড়ে আছে। কাগজ-পত্র, ঠিকানা, লাল ইশ্‌তেহার, বোমা তৈরির ফরমুলা সহ আমি, নিরঞ্জন সেন, রমেন বিশ্বাস ধরা পড়লাম। ভোর হতে না হতেই পূর্ব কথানুযায়ী সুধাংশু বোমা ও রিভলভার নিয়ে সেই বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হয়। সুধাংশুকে পুলিস বহু অত্যাচার করে ও ভয় দেখিয়ে তার মুখ থেকে কোনো কথাই বের করতে পারেনি। পর পর খানাতল্লাশীতে আরো কয়েকটি বাড়ি থেকে বোমা তৈরির সরঞ্জাম সহ যুবকগণ ধৃত হয়। বরিশালের যুবক কর্মী মুকুল সেন, শচীন কর, জগদীশ

চ্যাটার্জী, খুলনার নির্মল দাস প্রভৃতি অনেক যুবক ধরা পড়ে। বিভিন্ন জেলার ৩২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।

১৯৩০ সালে আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে আমি ও নিরঞ্জন ৭ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হই। সুধাংশু দাশগুপ্ত, রমেন বিশ্বাস ও অন্য কয়েক জনের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আমাদের ধরা পড়ার পর চট্টগ্রামের দল খুব কর্মতৎপর হয়ে তাড়াতাড়ি কাজের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তাদের আশঙ্কা হয়, পাছে পুলিস তাদেরও ধরে ফেলে সকল চেষ্টা পণ্ড করে দেয়। আমাদের ধরা পড়ার দিন থেকে ঠিক চার মাসের মধ্যে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে সূর্য সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি বিদ্রোহী বীরগণ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ করে এবং বহু পিস্তল, বন্দুক, কামান হস্তগত করে। শহরে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। সেইদিনই বাংলার সমস্ত বিপ্লবী দলের নেতাদের পুলিস ধরে ফেলে। কর্মীরা সকলে চাটগাঁর প্রদর্শিত সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর যে সংগ্রামের উদ্দীপনা আসে তাকে বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল না নেতাদের।

সেদিন জালালাবাদের পাহাড়ে মেশিনগানের গুলিতে নিহত স্বদেশহিতৈষীর বুকের রক্তে স্বাধীনতার পথের রেখা রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। বাংলা বিপ্লবী দলের প্রতিটি যুবক স্বাধীনতার এই বীর যোদ্ধাদের সেদিন রক্ত-অভিবাদন জানিয়েছিল। নূতন কর্মপ্রবাহের এই দুর্নিবার গতি কেউ রোধ করতে পারেনি। সংগ্রামোন্মুখ বাঙালী যুবকদের এখন আর থামায় কে! সারা বাংলায় সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বাংলা দেশের 'ইন্সপেক্টার জেনারেল অফ পুলিস' বিপ্লবীর গুলিতে নিহত ও ঢাকার 'পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট' সাহেব আহত হলেন। মেদিনীপুর জেলার তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট পর পর নিহত হল। কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেল নিহত হন। বাংলার দুজন গভর্নর পর পর বিপ্লবীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন ও পরিপোষক "স্টেটসম্যান" পত্রিকার সম্পাদক, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক, ঢাকার পুলিস সাহেব, রাজশাহীর জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুনালের জজ সাহেব, ইত্যাদি অনেক রাজকর্মচারী সন্ত্রাসবাদীদের কোপে পড়ে। দুটি স্কুলের ছাত্রী পিস্তলের গুলিতে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেবকে হত্যা করে। কলকাতায় পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

বাংলায় বিপ্লবীরা ক্রমাগত পাঁচ বৎসর সন্ত্রাস-উৎপাদক কার্যকলাপ দ্বারা বাংলা গভর্নমেণ্টকে সন্ত্রস্ত করে রাখে—নিজেরাও ফাঁসিতে, গুলিতে মরে, দ্বীপান্তরে যায়। চাটগাঁর দল, ঢাকার শ্রীসঙ্ঘ ও বি. ভি. দল এবারকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। অনুশীলন দলের কর্মীরা ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে দল গঠন করতে গিয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়।

দু'বৎসর ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন করে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়ে; সন্ত্রাসবাদীরা ১৯৩৫ সালের গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট পাস না হওয়া অবধি তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায়।

যে-সকল বড় ও ছোট নেতারা বিগত দু'বছর ধরে যুবক আন্দোলনের স্বাভাবিক সংগ্রাম-প্রবণতাকে বাধা দিয়ে এসেছেন—প্রগতির পথ রোধ করে প্রতিক্রিয়ার দুর্গ সুদৃঢ় রাখতে চেষ্টা করেছেন—সরকারী নিষ্পেষণের নির্মম পীড়নে তাঁরাও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। এঁরা নূতন বিপ্লবীদের সমর্থন করেননি, নিজেরাও বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার কোনো প্রকৃষ্ট কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করে যাননি। বিপ্লবের কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও তাঁদের ছিল না। গান্ধীবাদী অহিংস নীতির প্রতি মোটেই বিশ্বাস রাখতেন না, কিন্তু তবু তাঁরা বিনা প্রতিবাদে অহিংস আন্দোলনের মাঝে নিজেদের সশস্ত্র বিপ্লবী সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ধরা পড়ার পূর্বে কংগ্রেসের অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে তাঁদের বলার কিছু ছিল না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করে তরুণ বিপ্লবীরা রক্তের অক্ষরে অহিংস সংগ্রামে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যর্থ প্রয়াসের জবাব দেয়। প্রগতিশীল বিপ্লবী আন্দোলনে ত্যাগ ও বীরত্ব দেখিয়ে যারা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল, সকল সংগ্রামাত্মক কাজে যাদের উদ্যোগ ছিল তারা এতদিনে গতানুগতিক ধারায় ভেসে গেল। মনে প্রশ্ন জেগেছে—তাঁদের যা দেওয়ার তা দেওয়া শেষ হয়ে গেছে কি? প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতারাও এমনি করেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেছে। বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিন দাস, এমন কি সর্বজনবরেণ্য নেতা অরবিন্দ ঘোষের দানও আজ ম্লান, নিষ্প্রভ। দ্বিতীয় যুগের বিপ্লবী কর্মীরা প্রায় বিশ বৎসরের কঠোর সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় যে-নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছিল ১৯২৯-৩০ সালের সংগ্রামের অভিনবত্বে তা হারিয়ে গেল। তখন যারা সংগ্রামের অগ্রগতির পথে এসেছিল তারা জেল থেকে বেরিয়ে

এসে দশ বছর পরে ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। প্রগতির পথে চলতে গিয়ে তারা বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক পথের সন্ধান পায়। যারা তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল তারা সেই যে-পথ হারিয়েছিল সে-পথের সন্ধান আর পেল না। প্রতিক্রিয়া বাসা বাঁধলো তাদের মজ্জায় মজ্জায়—শুরু হলো দলে দলে বিরোধ,—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মত-পার্থক্য। নিজের মনের মধ্যেই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি। ভাবপ্রবণতায় তৈরি উজ্জ্বল জীবনের কি বিস্ময়কর পরিণতি!

১৯২৮-২৯ সালে বাংলায় যাঁরা বিপ্লবী নেতা এবং খাঁটি জাতীয় আন্দোলনকারী হিসাবে সুপরিচিত এ সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হল; তাঁদের ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সাম্রাজ্যবাদের কারাগারে কঠোর কারাদণ্ড ও অশেষ লাঞ্ছনায় মাঝেও অনড় অটল থাকার সাধনা অতুলনীয় —নরেন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, রমেশ আচার্য্য, ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি, সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, সতীশ চক্রবর্তী, পূর্ণ দাস, বিপিন গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, অনিল রায় প্রভৃতি।

আমাদের পিছিয়ে পড়া দেশে সব কাজই পিছিয়ে চলে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঔপনিবেশিক বন্ধন-মুক্তি পথে কৃষক ও শ্রমিকের গণ-সংগঠন গড়ে সংগ্রামে এগোবার চেষ্টায় আমরা পার্শ্ববর্তী চীন দেশ থেকে কত পিছিয়ে ছিলাম সেদিনে।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহ

চট্টগ্রামের বিদ্রোহ, বাংলার বিপ্লবী স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি ফলপ্রদ রক্তঝরা অভিযান; ইংরাজ শাসনের বড় ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ। বিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান—ক্ষুদ্র হলেও তা দুর্জয় প্রয়াস, বীরত্বে সংগ্রামী সাফল্যে ও নির্ভীক আত্মদানে মুক্তিপথে সার্থকতা লাভ করল ভারতের পূর্বপ্রান্তে। তাদের সাময়িক সাফল্যে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি শিথিল হয়ে যায়। দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আশা দানা বেঁধে ওঠে।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের চরম উৎকর্ষ এ বিপ্লবী অভিযান সারাভারতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিপ্লবী জীবনের রক্তলেখায় বিপ্লব ইতিহাসের রক্তঝরা পাতায় চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ ও জালালাবাদের লড়াই দেশপ্রেমিক বীর যুবকদের বুকের রক্তে উজ্জ্বল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০। ৩০।৩৫ জন সশস্ত্র বিপ্লবী সৈনিক গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের অধিনায়কত্বে পুলিস লাইনে অস্ত্রাগার আক্রমণ করেন। সামরিক পোশাকে সজ্জিত বিদ্রোহী সেনাদলকে আসতে দেখে রাইফেল কাঁধে প্রহরী। অকস্মাৎ রিভলভারের গুলিতে প্রহরীর জীবনান্ত হল। "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" এই সমবেত রণধ্বনি ভীতি উৎপাদন করল পুলিস বাহিনীর—তারা ছুট দিল চারদিকে। অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে তারা বহু মাসকেট বন্দুক রিভলবার কার্তুজ পেলেন, সকলে এক লাইনে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে রাইফেল ফায়ার করে শহর কাঁপিয়ে তোলেন।

চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখলের অধিনায়ক ছিলেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেন। প্রথমেই পাহারার সান্ত্রীকে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেল সাহেব অস্ত্র হাতে দৌড়িয়ে আসামাত্র সেও বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হয়। অতঃপর তারা অস্ত্রাগারের ফটক ভেঙে দেখেন বহু রিভলভার পিস্তল, রাইফেল ও একটি লুইস গান ওর ভিতরে আছে। বিপ্লবীরা অনেক অস্ত্র হস্তগত করেন। অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বহু অস্ত্র পুড়িয়ে তারা চলে যান।

শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা খোঁজ নিতে এসে তাদের মধ্যে মিঃ কলেন আহত হয়ে পড়ে যেতেই অপর সকলে ছুট দিল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গাড়িতে ড্রাইভার ও আরদালী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক ধ্বনি দিতে দিতে অধিনায়ক লোকনাথ বল তার দল নিয়ে পুলিস লাইনে গিয়ে সেখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হয়।

অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একদল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার জন্য যায়। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বোর্ড তারা চুরমার করে দেন ; রেল লাইন ভাঙা ও তার কাটার ব্যবস্থাও হয়।

বিভিন্ন কাজ শেষ করে সকল দল গিয়ে একত্রে সমবেত হন। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক, ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি ওঠে সংগ্রামজয়ী বিপুল কণ্ঠে—।

সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের উপস্থিতিতে বিউগল বাজনার মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হল। মাসেকট্রি রাইফেল গর্জে উঠল আকাশের দিকে।

ভারতের এই রিপাব্লিকান আর্মি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবং সর্বাধিনায়ক-

রূপে সূর্য সেনকে (মাস্টারদা) গার্ড অব অনার দেওয়া হয় সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে।

হিমাংশু সেন অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং তাকে আশ্রয় স্থানে নিয়ে যায়; ফিরে এসে বিপ্লবী বন্ধুদের আর খুঁজে পেলেন না। তারা তখন জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে ধাবমান।

আক্রমণ ও দখলের সঠিক রণকৌশল থাকা সত্বেও একটি ত্রুটি থাকার জন্য বিপ্লবীদের শহর দখলের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে যে একটি লুইস গান ছিল তা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। পলায়মান ব্রিটিশ পুলিস অফিসাররা তাড়াতাড়ি সমবেত হয়ে ঐ লুইস গান নিয়ে একটি উঁচু জলের ট্যাঙ্কের ওপর উঠে বিপ্লবীদের উপর মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করতে থাকে। বিপ্লবীরা মাসেকট্রি রাইফেল দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিলেন। লুইসগানের বিরুদ্ধে ম্যাসেকট্রি রাইফেল দিয়ে বেশীক্ষণ লড়াই চলে না। তাই তারা শহর ছেড়ে পল্লীপথে ক্রমাগত তিন দিন পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে অনাহারে কাটিয়ে ক্ষুধার্ত ও শ্রান্ত দেহে জালালাবাদ পাহাড়ে পৌছলেন। বিকালবেলায় একদল সৈন্য সঙ্গীন উঁচিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছিল। বিপ্লবীরা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালে, শত্রু সৈন্য বাহিনী নিকটে আসা মাত্র অধিনায়কের নির্দেশে গুলি বর্ষণ শুরু করলেন। এদের গুলি বর্ষণে সৈন্য বাহিনী প্রথমটায় পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। পরে সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে শুরু করে। উভয় পক্ষের গুলি বিনিময় চলতে চলতে অকস্মাৎ লুইস গানের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। লুইস গানের তীব্র গুলি বর্ষণের ফলে একে একে বার জন তরুণ বিপ্লবী যোদ্ধা নিহত হলেন। শক্ত হাতে গুলি চালাতে চালাতেই তারা রক্তাক্ত দেহে দেশপ্রেমিক বীরের মৃত্যু বরণ করলেন। শত্রু পক্ষে কজন নিহত হল তা তারা জানতেও পারলেন না। সন্ধ্যার আঁধারে শত্রুপক্ষ গুলিবর্ষণ বন্ধ করে দ্রুতগতিতে পলায়ন করল। বিপ্লবীদের ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে জালালাবাদ পাহাড় কম্পিত হয়ে উঠল।

যারা বেঁচে রইলেন সূর্য সেনের নেতৃত্বে তারা রাত্রির অন্ধকারে মৃত শহীদদের প্রতি সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলেন। স্বাধীনতাকামী তরুণ শহীদের রক্তে জালালাবাদের মাটি লাল হয়ে রইল। নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তীকেও মৃত মনে করে রেখে আসেন। তিনি কিন্তু পরে বেঁচে ওঠেন এবং সরে যেতে সক্ষম হন।

এরপর নায়ক সূর্য সেনের নির্দেশে তারা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। শত্রু-সেনার আক্রমণ প্রতিরোধ করায় ও গেরিলা কায়দায় শত্রুবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করার কাজে দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন বলিদান বিপ্লবীদের বেশ পেয়ে বসেছিল। শত্রুকুলের ধ্বংসই তাদের কাম্য।

৬ই মে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে চট্টগ্রাম শ্বেতাঙ্গপাড়া আক্রমণ করতে যাওয়ার পথে একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এখানে চারজন বীর যুবক লড়াই করে শত্রুর গুলিতে নিহত হন ও দুজন গ্রেপ্তার হন।

১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) পলাতক বিপ্লবীদের সন্ধানে পুলিস চন্দননগরে হানা দেয়। একটি বাড়ীতে প্রবেশকালে পুলিস বাধা পায়। এখানেও একটি খণ্ডযুদ্ধে জীবন ঘোষাল পুলিসের গুলিতে নিহত হয়। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত গ্রেপ্তার হয়। বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুটুদি) ধরা পড়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নির্ভীক চিত্তে তিনি কারাবরণ করেন। ২৮শে বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক অনন্ত সিং পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। ১৯৩২-জুন :—ধলঘাটে খোঁজ পেয়ে সৈন্যবাহিনী ও পুলিস বিপ্লবীদের খোঁজ করতে গেলে সংঘর্ষ হয়। পুলিসের মেশিনগানের গুলিতে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। বিপ্লবীদের রিভলবারের গুলিতে ক্যাপটেন ক্যামেরন নিহত হয়। নায়ক সূর্য সেন ও আরো ২।৩ জন গোলমালের মধ্যে কৌশলে সরে পড়তে সক্ষম হন।

১৯৩২-সেপ্টেম্বর :—পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণে একজন স্ত্রীলোক সহ বারো-তেরো জন শ্বেতাঙ্গ আহত হন। এই দুঃসাহসিক অভিযানের নেত্রী প্রীতিলতা আহত হয়ে পড়ে যান। তৎক্ষণাৎ বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৩৩। ১৬ই ফেব্রুয়ারী—গৈড়ালা গ্রামে বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেনের গোপন আশ্রয়স্থল পুলিস ঘেরাও করে ফেলেন। বহুক্ষণ সংঘর্ষের পর কেহ কেহ আহত হন। সূর্য সেন ও অন্যান্য কয়েকজন সরে যাবার সময় সশস্ত্র পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যান। সূর্য সেনের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয় তখনই। অস্ত্রাগার আক্রমণের অভিযোগে সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসীর আদেশ ও কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। সূর্য সেনকে ইংরেজ সৈন্য ও মিলিটারী পুলিস কঠোর দৈহিক পীড়ন করে করে অচৈতন্য করে ফেলে। ১২ই জানুয়ারী (১৯৩৪) ভোরে বীর বিপ্লবী নায়কের মৃতপ্রায়

দেহটি ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে দেয়। নীরবে একটি স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাপ্রাণ বিপ্লবীর জীবন শেষ হয়ে গেল।

২৮শে জুন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক অনন্ত সিং স্বেচ্ছায় পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ইন্‌স্পেকটার জেনারেল অব পুলিসকে চিঠি লিখে তিনি কলকাতা পুলিস কেন্দ্রে উপস্থিত হন। তাঁর চিঠিতে তিনি লেখেন, "it is my personal matter and absolutely private." যখন বিপ্লবীরা মরণ পণে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তখন এই আত্মসমর্পণ একটি অভূতপূর্ব ঘটনা রূপে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। জানি না অনন্ত সিংহ তাঁর দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই আত্মসমর্পণ করেন কিনা। কিন্তু এইরূপ ঘটনা বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে বিরল। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ বিংশ শতাব্দীতে ভারতে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ। পঁচিশ বৎসর ধরে বাংলাদেশে বিপ্লবী দলের যে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছিল তার চরম উৎকর্ষ এই চট্টগ্রামের অভ্যুত্থান। এর বীরত্ব, রণকৌশল ও কর্মোদ্যোগ অতি অপূর্ব। শহর দখল করার পর প্রবল শত্রু পক্ষের প্রতি-আক্রমণের মুখে পাহাড় অঞ্চলে বিপ্লবী বাহিনীর সরে পড়া, সুশৃঙ্খলভাবে জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরাজ সেনা দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিপ্লবী যুবকদের-মৃত্যুবরণ, গেরিলা কায়দায় লড়াই চালাবার পণ নিয়ে অধিনায়কের নির্দেশে শৃঙ্খলার সহিত বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়া—এ সবই অপূর্ব নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের পরিচায়ক। দুর্গম পথের ক্লান্তি, ক্ষুধা তৃষ্ণা অনিদ্রা তাদের মনোবল হ্রাস করতে পারে নাই। চট্টগ্রামের ছোট্ট একটি বিপ্লবী দলের উদ্যোগে বাংলা তথা ভারতবর্ষ এ সংগ্রামী গৌরবের উত্তরাধিকারী। গুলিতে ফাঁসিতে যারা মরে গেলেন সেই মৃত্যুঞ্জয়ী যোদ্ধাদের স্মৃতি জাতিকে উজ্জীবিত রাখবে। দেশপ্রাণ শহীদদের রক্তে জালালাবাদের পাহাড় রঞ্জিত থাকবে।

বিপ্লবী নেতা যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বুড়িবালামের তীরের যুদ্ধ, গৌহাটি পাহাড়ের যুদ্ধ, কলতাবাজারে নলিনী-তারিণীর যুদ্ধ, সকলের উপর চট্টগ্রামের বিদ্রোহ ও জালালাবাদের যুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারও পরে বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ, সারাভারতে আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন ও জনগণের অভ্যুত্থান ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের প্রধান অবদান বলে দেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের কোন সঙ্কীর্ণ চিন্তা তাদের ছিল না। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের সকল নরনারীর দাসত্ব মোচন।

৩৫ বৎসরের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ অধ্যায়

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর সারা বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কাজের হিড়িক পড়ে যায়। সরকারী দমননীতিও চরমে ওঠে। কারাদণ্ড, ফাঁসি, গুলি ছাড়াও পুলিসী সন্ত্রাসে কত লোকের চাকরি গেছে কত ছাত্র বিতাড়িত হয়েছে, ইলিসিয়াম রো পুলিস অফিসে, দালান্দা হাউসে কত শাসন পীড়ন চলেছে সংগোপনে, জেলবন্দী ও থানায় থানায় আটক সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। বিপ্লবী-দলের আক্রমণাত্মক নীতি তাতে হ্রাস পায় নাই। বাংলার লাটসাহেব জজ-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আক্রান্ত হয়েছে; 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক, ইওরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক আক্রান্ত হয়েছে; মেদিনীপুরের পর পর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুলিতে নিহত হয়েছে, কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পুলিসের ও জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলদের হত্যা করা হয়েছে। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতা মেয়েরাও এ-কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দুজন গভর্নরকে হত্যার চেষ্টায় বীণা দাস ও উজ্জ্বলা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন; কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে হত্যা করে শান্তি ও সুনীতি কারাদণ্ড পেয়েছেন। কিছু-সংখ্যক মহিলা বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে জেল খেটেছেন। অনেক মহিলা রাজবন্দী হয়েছিলেন। পূর্বে চট্টগ্রামে কল্পনা দত্ত যাবজ্জীবন কারদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। প্রীতিলতা বিলাতী সাহেবদের ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে।

এই সব দুর্ধর্ষ কার্যকলাপ দেশের লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। একদিকে নির্ভীক চিত্তে বিপ্লবীদের ফাঁসি ও গুলিতে জীবন দান, অপরদিকে অহিংস আইন অমান্যকারীদের উপর পুলিসের লাঠিচার্জ ও গুলি, জেলবন্দীদের উপরও তেমনই বর্বর অমানুষিক আক্রমণ জনগণকে অহিংস বিপ্লবী প্রভাবের মাঝেও সংগ্রামে উৎসুক করে তোলে। দুঃখের বিষয় চট্টগ্রামের বিরাট অভ্যুত্থানের শিক্ষা এইসব সংগ্রামী বিপ্লবী নেতাদের মনে কোন রেখাপাত করে নাই। অতীতের পরিত্যক্ত ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পথই তারা বেছে নিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের

মতো আরো দু'একটা আক্রমণাত্মক অভিযান ইংরাজ শাসনের ভিত্তি নড়বড়ে করে দিত।

আন্তপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা ও টিটাগড় মামলার বন্দীরা সে-পথে নাকি কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সংগঠন বিস্তারের নেশায় তাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে দাঁড়াবার কতটুকু উৎস বজায় থাকত তার নিশ্চয়তা ছিল না। পুরানো নেতারাও বড় সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাই বলতেন। তাতে সক্রিয় সংগ্রামের দিন সুদূর পরাহত হয়ে যেত।

দুঃসাহসিক ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কাজ লোকের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, অত্যাচারী শাসকের নিধনে উল্লাস জাগায়। কিন্তু তা সাময়িক মাত্র। ১৯৩০ সালের দেশব্যাপী আইন অমান্য ও গান্ধী পরিচালিত জাতীয় অভ্যুত্থানের যুগে এর মূল্য খুব বেশী নয়। শতাব্দীর প্রথম দু'দশক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে মুক্তি প্রেরণা ও বিপ্লবী কর্মোদ্দীপনা জাগাতো তৃতীয় দশকে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বিদ্রোহ ও সংগ্রামের পর সে-ধরনের ব্যক্তিগত কাজ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। চট্টগ্রামের মতো আরো দু'তিনটি জিলার অস্ত্রাগার আক্রমণ হলে তা আরো ঢের বেশী কার্যকর (effective) হত। দেশের লোকের কাছে আদৃত হতো, গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের প্রভাব হ্রাস পেত; শাসক শক্তির শাসনের ভিত্তিমূল টলে যেত।

১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর থেকে তিন-চার বৎসর একটি ছোট দলের চেষ্টায় বাংলায় যে প্রচণ্ড ধরনের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চলেছিল, যে-পরিমাণ বিপ্লবী কর্মী ও অস্ত্র এ কাজে নিয়োগ করা হয়েছে, এবং যত বিপ্লবী বীরের রক্ত দিতে হয়েছে, তার তুলনায় আরো দুটি বা তিনটি জিলা শহর আক্রমণ করে দখল করা খুব কঠিন কাজ হত না বলেই মনে হয়।

জনবল, অস্ত্রবল ও অর্থের অভাব ছিল না বা হত না। অভাব ছিল পরিচালকদের তেমন কিছু করার দৃষ্টিভঙ্গির ও তার উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার ধৈর্য।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি অহিংস আন্দোলনের নেতা গান্ধীর বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রতিবাদ হিসাবে ও ইংরেজ শাসনাধিকারের উপর শক্ত সশস্ত্র আঘাত হানায় প্রয়োজন ছিল। পাঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির আদেশ রদ করার অনুরোধ গান্ধী নাকি করেছিলেন কিন্তু তা' গ্রাহ্য হয় নাই।

ঐ সময়ে তিনি ভারতের বড় লাট সাহেবের সঙ্গে বসে আপসের চুক্তি সম্পাদন করলেন। (Gandhi Irwin Agreement 1931)। এর চেয়েও দেউলিয়া নেতৃত্ব প্রমাণিত হল যখন তিনি জনবিক্ষোভ ভীতু ইংরাজ সরকারকে বিপ্লবী নেতাদের ফাঁসির সময়ে যাতে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ ফেটে না পড়ে, ভারত গভর্নমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী ইমারসন সাহেবকে তা প্রশমনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আসল কথা হল দেশের মুক্তিকামী জনগণের সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দমনে গান্ধী পুলিসকে সাহায্য করার আশ্বাস দেন।

করাচী কংগ্রেসের সময় গান্ধী আরউইন আপস চুক্তির পর পাঞ্জাবের ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু এ-তিন বিপ্লবী নেতার ফাঁসি হয়। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রতিনিধিরা হাজারে হাজারে কালো পতাকা নিয়ে শোক মিছিল করেন। সকল ছাত্র ও যুব সংগঠন গান্ধীর আপস প্রত্যাখ্যান করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস ডেলিগেট বক্তৃতায় বলেন গান্ধী ছাড়া অন্য কোন নেতা যদি এ-রকম চুক্তি করতেন তবে তাকে করাচীর সাগরে নিক্ষেপ করা হতো। এর পরেও কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে গান্ধী আশ্বাস দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের ফাঁসি হলে তিনি বিক্ষুব্ধ জনতাকে সংযত রাখবেন। তখন এ-কথা জানা ছিল না। সরকারী চিঠির ফাইলে গান্ধী ইমারসন পত্রাবলীতে তা সুরক্ষিত আছে। ১৯২২ সালের চৌরিচোড়ায় গোরক্ষপুর বিক্ষুব্ধ কৃষকদের থানা আক্রমণের পর তিনি ভারতব্যাপী গণ-আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। এরপর থেকে তিনি যে কতবার জাতীয় সংগ্রামের বুকে শেলবিদ্ধ করেছেন আর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস করতে গেছেন অনেকেই জানেন। শেষ অবধি গান্ধী দেশবাসীর আনুগত্য পেয়েও অবাস্তব নীতি ও পথের জন্য ব্যর্থ হলেন। সশস্ত্র সংগ্রামী দলের লোকেরা কখনো স্বাধীনতা সংগ্রামে আপসের চিন্তা করেন নাই। পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনেও স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম-আমূল পরিবর্তনে ৩৫।৩৬ বৎসর পর নতুন পথের পথিক হয়। বুর্জোয়া বিপ্লব কল্পনা পরিহার করে জনগণের মহান লক্ষ্য সাধনের আর দ্বিতীয় পথ নাই বুঝেই বিপ্লবীদলের অগ্রগামী অংশ সানন্দে নতুন পথের যাত্রী হলেন।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় বন্দী

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ৩০।৩২ জন আলিপুর জেলে আছি বিচারাধীন বন্দীরূপে। আলিপুর বিশেষ আদালতে আমাদের নামে মেছুয়াবাজার বোমার মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রতিদিন আমরা সশস্ত্র পুলিস ও ও সার্জেন্ট পরিবৃত হয়ে কয়েদ-গাড়িতে শ্লোগান দিতে দিতে কোর্টে যাই, আবার জেলে আসি। জেলের ভিতর আমাদের সোয়াস্তি ছিল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর সোম মোটেই সুবিধার লোক নন; দিন দিন অসুবিধা সৃষ্টি করাই তাঁর কাজ। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর অখাদ্য খেতে হয়। প্রতিকার প্রার্থী হলেই তিনি চটে যান। চিঠিপত্র দেওয়া এবং পাওয়ার গণ্ডগোল হচ্ছে; তিনি বলেন, can't help (উপায় নেই); মাথার তেল চাই—can't help (উপায় নেই); ময়লা কাপড় কাচার সাবান চাই—can't help (উপায় নেই); খবরের কাগজ চাই;—can't help. (উপায় নেই)। আবার নিয়মমতো সারবন্দী দাঁড়ানো, সাহেবকে সেলাম ঠোকা, সন্ধ্যার আগেই নিজের নিজের ঘরে ঢুকেই সেপাইকে তালাবন্ধ করার সুযোগ দেওয়া—এসবের একটুও ত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারেন না। ক্রমশ বুঝা গেল, সমস্ত রাজবন্দীর ওপরেই তিনি খড়্গহস্ত।

একদিন সকালবেলা অকস্মাৎ পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল। আমরা অবাক হয়ে ভাবলাম, 'কি এমন হল'। চারদিকে প্রাচীর পরিবেষ্টিত। কোনো ইয়ার্ড থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই। ছেলেরা চঞ্চল হয়ে দেখছে কোথায় কি হল। সামনের ইয়ার্ডের ৮।১০ জন রাজনীতিক বন্দী—এর মধ্যে জে. এম সেনগুপ্ত, আর সুভাষ বসুও আছেন। এঁরাও কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছেন, অকস্মাৎ একদল সশস্ত্র সেপাই ও সার্জেণ্ট সহ মেজর আমাদের ইয়ার্ডে প্রবেশ করেন এবং ছেলেদের উপর লাঠি চার্জ শুরু হল। আমারা সেখানে ছুটে যাই; তখন তারা আমাদের সকলের উপরেই লাঠি, বেটন এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত শুরু করে। মেজর সোম কতগুলি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির পাঠান কয়েদীকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন। তারা নির্মমভাবে আমাদের মুখে ঘাড়ে পিঠে কিল ঘুঁষি মারতে লাগলো। আমাদের কারুর মাথায়, কারুর পিঠে, কারুর বা হাতে লাঠির আঘাতে কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। সুভাষ, সেনগুপ্ত, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য

গুপ্ত এবং আরো ৫।৬ জন রাজবন্দী পাশের ইয়ার্ডের সিঁড়ি থেকে এ-দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁরা চিৎকার করে জেলকর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতি সহানুভূতিসূচক ধ্বনি দিতে থাকেন। নিশাকান্ত, নিরঞ্জন সেন, নির্মল দাস, শচীন কর, সুধাংশু দাস, জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, আমি এবং আরো ৫।৬ জন বেশী রকম আহত হই। মারতে মারতে আমাদের সেলে ঠেলে দিয়ে তালাবন্ধ করে দেয়। তারপর পাশবিক উত্তেজনায় সার্জেণ্ট ও সেপাই দল মেজর সোমের পেছন পেছন পাশের ইয়ার্ডে গিয়ে প্রেমসিং প্রেম নামে এক শিখ যুবককে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। প্রেমসিংহ আমাদেরই বন্ধু। যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুর পর শোভাযাত্রা করায় গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সুভাষ বাবু, সেনগুপ্ত ও নৃপেনবাবুকেও সার্জেণ্টরা ঘুষি মেরে ধাক্কা দিতে দিতে সেলে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে। ত্বপুর বেলা রক্তাক্ত দেহে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আমাদের আলিপুর কোর্টে নিয়ে যায়। জেলগেট, কোর্টগৃহ, কোর্টের প্রবেশপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। জেলের লাঠি চার্জের খবর বাইরে রটে যায়। মামলা স্থগিত রেখে সেদিন জেল হাঙ্গামা সম্পর্কে কোর্ট আমাদের বিবৃতি নেয় এবং আহত স্থান দেখে। অপরাহ্নে জাতীয় পত্রিকাগুলি জেলের বিবরণ সম্বলিত বিশেষ সংখ্যা বের করে। রটে গিয়েছিল—রাজবন্দীদের কেউ কেউ লাঠির আঘাতে মরে গিয়েছে। কয়েদী গাড়িতে বিকাল বেলা ফিরবার সময় জেল গেটে সহস্র লোকের ভীড় দেখতে পাই। শত শত সিপাই—বন্দুক ঘাড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। জেলের ভিতরকার অত্যাচার চঞ্চল শহরবাসীকে আরো বেশী চঞ্চল ও উত্তেজিত করে তুলেছে। তখন মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি মার্চ আরম্ভ হয়েছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ এসেছে। এমনই সঙ্কট সময়ে কলকাতার বুকের উপর আলিপুর জেলে এই ভয়াবহ অত্যাচারের ঘটনা ঘটে।

মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সাজা হল। আলিপুর জেলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী রূপে আছি। আইন অমান্য আন্দোলনের কয়েদীতে জেল ভর্তি; রাত্রিতে তালাবন্ধ করা হয় না। কয়েদীরা সকলেই ঘুরে বেড়ায়, জেলে মহোৎসব। বোমা-ইয়ার্ডের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, এখানে আমরা বোমার দলের সাংঘাতিক কয়েদীরা থাকি; তালাবন্ধ সার্জেণ্টের পাহারা, কঠোর বিধি-বিধান—সবই আছে। এরই ফাঁক দিয়ে সার্জেণ্টকে ভুলিয়েভালিয়ে ত্ব'চারজন বেরিয়ে আসে, ত্ব'চারজন ভিতরে এসে দেখা করেও যায়। মজুর-কৃষক পার্টির নেতা হালিম আসতেন প্রায়ই। দেখাশোনা, মেলামেশা, ত্ব'চারটে গণ-আন্দোলনের

কথা, মজুর-কৃষক পার্টির কথা বলে চলে যেতেন। সুভাষবাবুও জাঁদরেল গোছের কোনো সার্জেণ্টকে হাত করে মাঝে মাঝে আমাদের আঙিনার দিকে চলে আসতেন। দেখাশোনা, মেলামেশা করতেন; দু'চারটে রাজনৈতিক কথা, বিপ্লবীদের কথা বলে যেতেন। সুভাষবাবু নিজেই দয়া করে আসতেন। হালিমকে আমরা ডেকে আনতাম। সতীশ দাশগুপ্ত সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমাদের কাছে গীতাপাঠ করতে আসতেন। আমাদের আপত্তি ছিল না। প্রাচীর পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে আমরাই শুধু কয়েকটি প্রাণী থাকি —এর বাইরে থেকে কেউ এলে আমরা সাদরে তাঁকে গ্রহণ করতাম। সতীশ বাবু আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনকারী যুবকদের ত্যাগ, সাহস ও স্বদেশহিতৈষিতা সন্ত্রাসবাদী স্বদেশহিতৈষী যুবকদের চেয়ে কম নয়। কাঁথি সমুদ্রতীরে লবণ জ্বাল দেওয়ার সময় পুলিসের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে কেমন বিক্রমের সঙ্গে তপ্ত কড়াইয়ের চারপাশ ঘিরে রক্ষা করেছেন সে-সব সতীশবাবু মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করতেন। আমরা ছিলাম প্রায় ২০ জন বোমার দলের বন্দী—অধিকাংশই তরুণ বয়সের বিপ্লবী। সুস্থ সবল দেহ, বলিষ্ঠ মন, সতেজ দৃষ্টি; পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। অনেকের ধারণা পুরানো নেতারা আর কিছু করবে না, এই নূতন বিপ্লবী দলই ভবিষ্যতে উঠে দাঁড়াবে। সুভাষ বাবু তাই আমাদের সঙ্গে খাতির জমাতে চান। আমরা সকলে তাঁকে ঘিরে বসলে তিনি একদিন বললেন—'স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট ডিসিপ্লিন ও সংগঠন—এই তিনটি হবে আমার ভবিষ্যতের কার্যধারা। আশা করি এই পদ্ধতিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারব।' আমরা স্পষ্ট কিছু না বলে এ বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করি।

কথাপ্রসঙ্গে সুভাষ বাবু বলেছিলেন, ভারতের বিশিষ্ট ধারায় গড়ে উঠবে ভারতীয় স্বাধীনতা; রুশিয়া থেকে আমরা গণতন্ত্র, মুসোলিনীর কাছ থেকে নেব দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা (ডিসিপ্লিন) ও সংগঠনের কায়দা। তখনো হিটলারের নাৎসীশক্তি তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি, ইটালীর ফ্যাসিস্ট নেতা ও ফ্যাসিস্ট পার্টির শক্তিমত্তায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলতেন, ভারতের মতো ভেদ বৈষম্যপূর্ণ দেশে মুসোলিনীর মতো শক্ত নেতা ও শক্তিশালী দল তৈরি না হলে চলবে না। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, ফ্যাসিবাদ—এই তিনটির কিছু কিছু অংশের তিন মিশালী দিয়েই সুভাষবাবু স্বাধীন ভারতের বনিয়াদ গড়তে চেয়েছিলেন, তখনকার নবজাগ্রত শ্রমিক আন্দোলনকারীদের

খুশী করার জন্য তিনি রুশিয়ার কথা বলতেন—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুষ্টির জন্য ইতালীর যুব-সংগঠন, মিলিটারী ডিসিপ্লিন ইত্যাদির কথা বলতেন; সকলকে খুশী করার জন্য বলতেন ভারতে উদ্ভূত ভারতের নিজস্ব স্বাধীনতার কথা।

একদিন তিনি আমাদের দু'জনকে চুপি চুপি আড়ালে ডেকে বললেন, কিছু অস্ত্রের সন্ধান বলে দিতে পারেন? তা হলে বাইরে খবর দিয়ে কিছু কাজ করানো যেতে পারে। গান্ধীজীর অহিংস পথে কিছুই হবে না। আমরা সুভাষবাবুর কথায় উৎফুল্ল হয়েছিলাম। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে সহযোগিতা না করে কোনো নেতাই নেতৃত্ব করতে পারতেন না।

মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্রকারী নূতন বিদ্রোহী দলের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের মূলে ছিল সুভাষবাবুর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বিপ্লবীদলের সমর্থন ছাড়া বাংলা দেশে নেতা হওয়া যায় না।

জে. এম. সেনগুপ্ত রাশভারী লোক, তিনি নিজে কখনো আসতেন না।

হালিমকে আমরা আমাদের বিশেষ বন্ধু মনে করতাম। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নানারকম দেশী-বিদেশী পুস্তিকা, মাসিকপত্র গোপনে আমদানী করে আমাদের পড়তে দিতেন। আমরা সেগুলি অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম। তখন থেকেই আমাদের কমিউনিস্ট হওয়ার ইচ্ছার উন্মেষ হয়। সেদিন ছিল এসব ভবিষ্যতের কথা, সে সাত বৎসর পরের কথা—কে জানে কবে মুক্তি পাব; সেনগুপ্ত বলেছিলেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই আমাদের প্রথম কাজ হবে আপনাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া। আমরা কিন্তু সাত বৎসর জেল খাটার পরও মুক্তি পাইনি। সেনগুপ্ত বা কংগ্রেসী দল বাঙলায় মন্ত্রিত্বও পাননি।

আগস্ট মাসে রাজসাহী জেলে নিয়ে আমাকে এক ক্ষুদ্র সেলে ফাঁসির আসামীর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে পৃথক করে রাখে। আর কোনো রাজবন্দীর সঙ্গে আমাকে মিশতে দিত না। জেল থেকে পালাব এই সন্দেহে তারা আমাকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। বিশ্বের সকল সংস্রবের বাইরে আলো-বাতাসহীন নির্জন কক্ষে একাকী প্রায় এক বৎসর থাকি। প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হত। একখানা বই অবধি সঙ্গী হিসেবে পাইনি। 'রেপ কেসে' (Rape case) শাস্তিপ্রাপ্ত এক মণ্ডলভাকে পাশের কক্ষে আমার সাথী হওয়ার জন্য দেয়। লোকটি জেলার সাহেবের গুপ্তচর বলে সকল কয়েদীর ঘৃণ্য ছিল। যেমন করেই হোক, সকল দুরবস্থার মাঝে সব কিছু জয় করে আমি একটা পরিপূর্ণ আনন্দের অনুভূতিতে

নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। কোনো দুঃখ বোধই ছিল না। শরীর মন সব যেন সবল হয়ে উঠেছিল।

"মন আমার ভয়ে ছিল কোন গন্ধে
হৃদয় আমার নেচেছিল কোন আনন্দে"—

সেদিনের কথা স্মরণ করে এ-কথাই আমার আজ মনে পড়ে। প্রায় এক বৎসর পরে অন্য ওয়ার্ডে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে মিলিত হই।

সকলের সংস্রব থেকে আমাকে পৃথক করে রাখার সময়টুকুর মধ্যে অনেক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেছে দেশে ও বিদেশে। গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে বিলাত থেকে কংগ্রেস বাদে অন্যান্য ভারতের নেতারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের আশ্বাস নিয়ে এসেছেন। কারামুক্ত কংগ্রেস নেতা গান্ধী দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে সন্ধির আলাপ-আলোচনা করে গান্ধী-আরউইন চুক্তিপত্র সই করেন। (মার্চ ১৯৩০) অহিংস সংগ্রামের সৈনিকগণ হাজারে হাজারে মুক্তি পেতে লাগলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সশস্ত্র সংগ্রামের সৈনিক ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হল। করাচী কংগ্রেসে এবার এই প্রথম মজুর-কৃষকের কতকগুলি সাধারণ দাবি স্বীকৃত হল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্ট সৈনিকদের বিচার তখনো চলছিল।

এদিকে বাংলার বিপ্লবী বন্দীরা—দণ্ডপ্রাপ্তই হোক আর নির্বিচারে বন্দীই হোক—জেলে ও ক্যাম্পে আটক হয়েই রইলেন। মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেব সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে নিহত হলেন। বিপ্লবী নেতাদের ফাঁসির পর বিক্ষুব্ধ শোকার্ত শত শত কংগ্রেস ডেলিগেট কৃষ্ণপতাকা নিয়ে কংগ্রেস নগরে মৌন শোকযাত্রা করলেন। গান্ধীর মোহমন্ত্রে সব কিন্তু শান্ত ও সুশৃঙ্খল—। নেতা গান্ধী ভারত সরকারকে কথা দিয়েছিলেন যে ফাঁসির পর অবস্থা শান্ত রাখার ব্যবস্থা করবেন। জাতীয় নেতা বিপ্লবী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামীদের ফাঁসি স্বীকার করেই আপস রফা করলেন। এ আপস যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তাতো সহজবোধ্য, হলও তাই।

যে আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যাপকতর ও তীব্রতর হয়ে কৃষক ও গণশ্রেণীকেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চঞ্চল করে তুলেছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে সারা ভারতের সে আন্দোলন দমে গেল।

একদিন খবর এল হিজলী বন্দী ক্যাম্পে মিলিটারী পুলিসের গুলিতে অনেক রাজবন্দী হতাহত হয়েছে। বিপ্লবী নেতা সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত

হন। ন্যায্য দাবির ফলে ব্রিটিশ-শাসিত কারাগারে আটক বন্দীদের প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। এই ব্যাপারে আমরা খাওয়া বন্ধ করে দিই বলে পরে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

১৯৩১ সালের শেষ ভাগে হাজারীবাগ জেলে আমাকে বদলী করে দেয়। নতুন অবস্থায় নতুন অসুবিধা অনেক ভোগ করতে হল। ১৯৩২ সালের প্রথমেই দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। এবার আন্দোলনের আগেই নেতারা সব জেলে। বিহার ও উড়িষ্যায় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ হাজারীবাগে সরকারী অতিথি হয়ে এসেছেন। সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়। সহিংস ও অহিংস আন্দোলন নিয়ে বাদানুবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, গান্ধীবাদ নিয়ে একটু আধটু আলোচনা জেলে বসে হত। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন: "গান্ধীবাদ সকলের প্রতি সকলের প্রীতি সৌহার্দ্য জাগিয়ে দেয়; সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের নীচ মনোবৃত্তিগুলি উসকিয়ে তোলে।" যাই হোক রাজেন্দ্র বাবুকে আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করতাম। মনে হত, এঁর মতো ত্যাগী একনিষ্ঠ নেতা বাংলার কংগ্রেসে থাকলে আরো শক্তিশালী হত—দলাদলি দূর হত। শ্রীকৃষ্ণ সিং শ্রেণীসংগ্রাম চান না, কিন্তু জমিদারগুলির দোষে শ্রেণী-সংগ্রাম এসে পড়বে বলে তিনি শঙ্কিত। আবদুল বারী সাহেব আমাকে লাপিডাসের "পলিটিক্যাল ইকনমি" পড়তে দেন, আরও কিছু সমাজতন্ত্রবাদমূলক সাহিত্য পড়তে দিবেন বলে ভরসা দেন। মুঙ্গেরের নেতা নিরাপদ মুখার্জী আমাকে খুব প্রশংসা করেন। দুঃখ করে বলেন আমার ছেলেটা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, সে যদি আপনাদের দলে যেত তবু সুখী হতাম!··· তাঁর ছেলের নাম সুনীল মুখার্জী, পরে (১৯৪৬) বিহার প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী হন। এখন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট।

ডাঃ খান সাহেব ও তাঁর ভাই গফ্‌ফর খাঁ (সীমান্ত গান্ধী) এ জেলে 'স্টেট প্রিজনার' হয়ে আছেন। তাঁরা দু'ভাই আমাদের বাংলার বিপ্লবীদের খুব প্রশংসা করেন। সীমান্তের পাঠানরা নাকি আমাদের খুব শ্রদ্ধা করে। তাদের ধারণা, কলকাতায় ইংরেজরা আমাদের গুলির ভয়ে রাস্তায় বের হতে পারে না। আবদুল গফ্‌ফর খাঁন তাদের বলেন: 'ঐ বিপ্লবীরা তো হিন্দু'। পাঠানরা নাকি উত্তর দেয়: 'তা কখনো হতে পারে না—তারা বাঙালী'। হিন্দু বলতে পাঠানরা পেশোয়ারের সুদখোর ধনী ও বেনেদের বোঝেন, আবদুল গফ্‌ফর খান স্বয়ং আমাকে এ গল্প বলে। পুরুলিয়ার নিবারণ দাশগুপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বলে সকলের শ্রদ্ধা পেতেন। তিনি আমার ঘরে এসে প্রায়ই হেগেলের

দর্শনতত্ত্ব বুঝাতেন। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদে (ডায়ালেকটিক) আর মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদে রাতদিন তফাৎ। ধনতন্ত্রবাদী পীড়নে পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ মান হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ ভিত্তি করে দাঁড়াবে এই তার মত। নিবারণবাবু পরম গান্ধীভক্ত। চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদে তিনি মর্মাহত হন এবং আমাকে বলেন: 'এত বড় একটি স্বদেশপ্রাণ কর্মীর গ্রেপ্তারে আজ খেলাধুলা বন্ধ রাখা ভাল মনে করি। আমিও এতে আপনাদের সঙ্গে থাকব।' স্বয়ং রাজেন্দ্রপ্রসাদ যেখানে আছেন সেখানে হিংসাপন্থী একজনের জন্য এত দরদ দেখাবার সাহস অন্য কোনো কংগ্রেসী নেতার ছিল না। উড়িষ্যার নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী মালতী দেবী ঐ জেলেই বন্দী। তাঁদের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়। উড়িষ্যার ছেলে ও মেয়ে সংগঠন নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হত। সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে কথা হলে নবকৃষ্ণবাবু বলতেন, এসব আইডিয়া মন্দ নয়। পরে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কট্টর সমাজতন্ত্রবাদী হন। হরেকৃষ্ণ মহাতব বাংলার যুবক আন্দোলনের নীতি-পদ্ধতিও কৌশলে লিখে দেওয়ার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন। বাঙালী বিপ্লবীর মতো একনিষ্ঠ ত্যাগী ও সাহসী কর্মীদল উড়িষ্যায় গঠন করার জন্যই তিনি আমার কাছ থেকে আমাদের কর্মধারা নোট করে নেন। অধ্যাপক আবদুল বারী, বেনীপুরী, কিশোরী প্রসাদ, ধনী যুবক নেতা মিছির প্রভৃতির সঙ্গে আমার সদ্ভাব হয়। তাঁরা তখন সমাজতন্ত্রবাদের বুলি আওড়াতেন। মতিহারী জেলার প্রজাপতি মিশ্র খাঁটি গান্ধীবাদী হলেও স্বভাবগুণে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। আচার্য কৃপালনী বলতেন: আপনাদের মতবাদ ভাল। আমিও বিশ্বাস করতাম। গান্ধীজির মতবাদ এসে সকল মত ও পথ ডুবিয়ে দিয়েছে। আন্দামান যাওয়ার সময় তিনি আমার নামে ২০'০০ টাকা জমা দিয়েছিলেন। বলে দেন: 'কোনো বিপদে টাকার দরকার হলে সিন্ধু দেশে আমার বাড়িতে লিখবেন।' এই আচার্য কৃপালনী ফেরারী বিপ্লবী নলিনী বাগচীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিহার প্রদেশের বিপ্লবী বন্দীরা আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে কমিউনিজমের পক্ষপাতী হয়ে উঠে। ওখানে তাদের ঝগড়া বিরোধ মেটাবার জন্য, হিংসা অহিংসা মতের সমস্যা সমাধানের জন্য, ক্লাস করে রাজনীতিক আলোচনার জন্য আমাকে ডাকত। তখন আমি সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে কমিউনিজমের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি মাত্র এবং কমিউনিজম সম্বন্ধে আমার ধারণা তখন ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট। হাজারীবাগ জেলে রাজবন্দী মহলে অহিংসারই প্রবল প্রভাব।

যখন খবর এল যে, কলকাতা রাইটার্স বিলডিংস্-এ কারাগার সমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল গুলিতে নিহত হয়েছেন তখন অনেকেরই চোখেমুখে পুলক ভাব। বিনয় বসু ও দীনেশের প্রতি প্রশংসাসূচক উক্তিও শোনা গেল। বিনয় ও সুধীর গুলি করে পরে আত্মহত্যা করে। দীনেশ ফাঁসিতে মরে। দীনেশের ফাঁসির দিনে কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রথম লাইনে লেখা হয়:

Dauntless Dinesh Dies at Dawn

জেলের ভিতর গোপনে ঐ কাগজটুকু দেখে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। এরকম লেখা কি চলে! তবে সত্যিই কি দিন ফিরেছে? ঐ সময় বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার চলছিল, তার জন্যই ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের উপর গুলি হয়।

বিহার উড়িষ্যার নেতাদের রাজনীতিক জ্ঞান বাঙালী নেতাদের চেয়ে কম; আমি সাধারণভাবে এ কথাটি বলছি। প্রথমোক্ত নেতৃবৃন্দের রাজনীতিক সারল্য, গান্ধীবাদের প্রতি একনিষ্ঠা, ঐকান্তিক ধর্মবিশ্বাস ও মধ্যযুগীয় মনোভাব দেখে আমার এমন ধারণা জন্মে। আইন অমান্য আন্দোলনে অনেক বিহারী কৃষক হাজারীবাগ জেলে আসে। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেখা মাত্র তারা ফাইল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করেন। সেদিন আমিও রাজেন বাবুর পায়চারি করার দলে ছিলাম। মথুরা প্রসাদ গর্বভরে বলছিলেন: "দেখেছেন সতীশবাবু, বিহারের কৃষক-প্রজারা নেতাদের কেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখে! দূর থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেখামাত্র সমস্ত কয়েদী কেমন নতমস্তকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। এখানে আপনাদের সমাজতন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নাই। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত মধুর যে, কৃষক শোষিত হচ্ছে বলে মনেই করে না।" —একটু পূর্বেই শ্রেণী-সংগ্রামের কথা হয়: নেতারা এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাই সুযোগ পেয়ে মথুরা বাবু শ্রেণী-সমন্বয়ের এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়ে দিলেন। মুচকি হেসে তাদের অনুসরণ করলাম। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নীরব ছিলেন। সকল নেতারই অল্পবিস্তর জমিদারী আছে, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার মধ্যে তাঁদের রাজনীতি সীমাবদ্ধ ছিল। আমি কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবী মতাবলম্বী হলেও ঐ জেলে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলাম। অহিংস-পন্থী নেতারা আমাদের বিপথগামী বললেও আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য, ত্যাগ ও সরল আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ করতেন না।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সীমান্ত গান্ধী, গফর খাঁ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় নিবারণ দাশগুপ্ত ও

অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে হাজারীবাগ জেল থেকে বিদায় নিতে হল। বন্ধুরা কেঁদে ফেললেন। আমি দ্বীপান্তরের যাত্রী।

আন্দামান দ্বীপের কারাকক্ষে

১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে হাতে হাতকড়া ও পায়ে পাঁচ সের ওজনের বেড়ি পরে হাজারীবাগ থেকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হওয়ার জন্য যাত্রা করি। জেলের সমস্ত রাজবন্দীরা মালা দিয়ে বিদায় দেয়। বেড়ি পরে আলিপুর জেলে পৌছি। আন্দামানের যাত্রীদের একে একে সবাইকে এখানে এনে জড়ো করা হচ্ছে। নিরঞ্জন সেন, ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বসুকে আমার পূর্বেই বোম্বাই ও পাঞ্জাবের জেল থেকে আনা হয়েছে। বর্ধমান থেকে হরেকৃষ্ণ কোঙার নামে একটি উনিশ বছরের ছেলেও আন্দামানের যাত্রী হয়ে আসে। হরেকৃষ্ণ এখন বাংলা দেশের মার্কসিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও সারাভারত কৃষক সমিতির সভাপতি। নিরঞ্জন মার্কসিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির মন্ত্রী থাকাকালে মারা যান। স্বদেশী কাজে সবেমাত্র ব্রতী হয়েছিল সে। আমাদের সকলেরই অপরিচিত। স্বদেশী সমস্যা জানার আগ্রহে সকলের প্রীতির পাত্র হয়ে ওঠে। একটি যুবকবন্ধুর ছোট্ট একটুকরো চিঠি একদিন দেখলাম আমার নিভৃত কক্ষে: "দাদা, আপনার মতামত কি? আমরা আপনার উত্তরের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি।" আমি শুধু লিখেছিলাম: "নূতন মতবাদ আমি পড়ি ও পছন্দ করি। পুরানো যে-পথ ছেড়ে অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি আর সেখানে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাও নাই—ইচ্ছাও নাই। আমি ক্রমশই সমুখপানে চলেছি। তোমরাও পড়াশুনা, আলাপ-আলোচনা করে নূতন বিপ্লবী হবে—এইটাই আশা করি। আগামী যুগ গণ-আন্দোলনের যুগ।" এর বেশী কিছু তখন আমার বলার ছিল না। বক্সা বন্দীশিবির থেকে পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী তাকেই এরূপ উত্তর দিই। পরে তিনি কমিউনিস্ট হন।

আলিপুর জেল থেকে আমরা ১৬ জন সরকার প্রদত্ত ছেচা লোহার এক এক জোড়া বেড়ী পরে সাগর-তরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য যাত্রা করলাম। সিপাই

শাস্ত্রীরা বন্দুক নিয়ে এসেছে দলে দলে—জাহাজে চড়ে সাগরের বুকে নাচতে নাচতে আমরা যাব কালাপানি—আন্দামান দ্বীপে, যেখানে কলকাতা থেকে মাসে একদিন একখানা জাহাজ কয়েদী নিয়ে যায়। অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল: "সমুদ্রের ওপরও কি বন্দীদের পায়ে বেড়ী দেওয়ার প্রয়োজন আছে? যদি বৈশাখের ঝড়ে জাহাজ ডুবে যায় তা হলে বাঁচার চেষ্টা করারও কোনো উপায় তাদের থাকবে না। জাহাজ ডুবলে বাঁচার চেষ্টা করা যদি অবৈধ না হয় তবে হতভাগ্য বন্দীদের সে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।" "মহারাজা" স্টীমার ডায়মণ্ড হারবার ছেড়ে যতই দক্ষিণে সাগরাভিমুখে যেতে থাকে ততই মনে অভূতপূর্ব পুলক, বিস্ময় ও কৌতূহল হচ্ছিল। কোথায় কোন অজানা রাজ্যে যাচ্ছি! গেল যুদ্ধের সময় যারা আন্দামানে ছিল তাদের বন্দীজীবন বড় আরামে কাটেনি—নিদারুণ লাঞ্ছনার ভিতর তারা রাজবন্দীর মাহাত্ম্য বজায় রেখেছিলেন। ভারতের জনসাধারণের কাছে আন্দোমান বন্দীশালা একটা অত্যাচারের প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলে সরকার ওখানে স্বদেশী-বন্দী রাখা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন আবার সে অন্ধকূপের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। সাময়িক উদারতার ভান করে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী রাজ আবার নিজের স্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করেছে। তাই আমাদের "বিপজ্জনক বন্দীদের" ভারতের বাইরে—দূরে—দ্বীপান্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা। রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্ট বরফের দেশ সাইবেরিয়ায় রাজবন্দীদের নির্বাসনে পাঠাত। ইংরেজ পাঠায় দ্বীপান্তরে—যেখানে স্বাস্থ্যে নাই, খাদ্য নাই, বিশ্বজনের সঙ্গে সংযোগ নাই।

দুস্তর জলরাশির মাঝখানে বন্দী স্টিমারেও আমরা বন্দী—ডেকের একটি তালা-বন্ধ প্রকোষ্ঠে আমাদের স্থান। শোয়া-খাওয়া এখানে। মলমূত্র ত্যাগের ঝঞ্ঝাট কম নয়, বেড়ির উপরে আবার হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধা চাই। সিপাই দড়ি ধরে পায়খানায় নিয়ে যাবে। সকালে বিকালে সকলকে উপরে নিয়ে যেত হাওয়া খাওয়ার জন্যে। বিশাল সমুদ্রের কূল কিছুই দেখা যায় না। চারদিকে গোলাকার হয়ে আকাশ ঢলে পড়েছে সমুদ্রের গায়। দক্ষিণ সাগরের দিকে তাকিয়ে কল্পনায় মানচিত্রে দূর মেরু সাগর চোখে ভাসে। বিস্মিত হয়ে ভাবি—সে কত দূর! সন্ধ্যাবেলা রাঙা সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে যায় অগাধ জলরাশির মাঝখানে, সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য আঁধারে হাহাকার করে উঠে; আমাদের টেনে নিয়ে যায় সিপাইর দল। ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হই উপরে ওঠার আশায়। সমুদ্রের বুক থেকে প্রকাণ্ড সূর্য লাল হয়ে ধীরে ধীরে ওঠে। তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি। ভুলে

যাই বন্দীজীবনের কথা। সিপাইর দল আবার টেনে নিয়ে যায়—ডেকে—আলোবাতাসহীন গরম প্রকোষ্ঠে। প্রতিদিন বিপদসংকেত (Alarm) পড়ে। চারটে বয়া বুকে কাঁধে বেঁধে লাইন করে দাঁড়াই, ক্যাপটেন সাহেবও গলায় কি একটা সুন্দর জিনিস লাগিয়ে আসে পরিদর্শন করতে। পরে জানলাম, ক্যাপটেন সাহেবের গলায়ও বয়া। জাহাজ ডুবলে ওতে ভর করেই সাহেব মরণের বিরুদ্ধে লড়বে। আমাদের গলার বয়া এত বিশাল কদাকার কেন? ভাবলাম মরণেরও শ্রেণীভেদ আছে নাকি? চারদিনের পর আন্দামানে পৌছলাম।

সশস্ত্র পুলিস পরিবেষ্টিত হয়ে ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ১৬ জন পোর্ট-ব্লেয়ার সেলুলার জেলে প্রবেশ করি। কয়েক মাস পূর্ব হতেই প্রতি জাহাজে বাংলা থেকে বন্দীদের আনা হচ্ছিল। প্রথম দল জেল গেটে পৌছলে আন্দামানের ডেপুটি কমিশনার সাহেব বলেছিলেন: দেখ খুব শান্তভাবে থাকবে গোলমাল কর তো কঠোর শাস্তি; এ বাংলা নয়—আন্দামান, এখানে অনেক বাঘকে আমরা পোষ মানিয়েছি। সাহেবের উদ্ধত বাক্যের প্রতিবাদ করেন কয়েক জন: আমরা বাঘ নই, বাঙালী বিপ্লবী; বিপ্লবীরা কখনো পোষ মানে না—মারে অথবা মরে; ন্যায় ব্যবহার পেলে তারা ভদ্রতার পরিচয় দিতে জানে।

বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের সেরা বিপ্লবীদের এখানে এনে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। বাঙালী ছিল শতকরা নব্বুই জন। তিন শ' রাজবন্দীকে নির্বাসন দিয়েও একত্রে থাকার সুযোগ না দেওয়াতে মনটা দমে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা বিভক্ত—দেখা করা বা সংবাদ আদান প্রদানের সুযোগটুকু অবধি নাই। কবুতরের খোপের মতো সারবাঁধা ছোট ছোট খোপ, তারই একটিতে গিয়ে প্রবেশ করলাম। বাতি নাই ভিতরে। পায়খানার কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রস্রাবের জন্য একটি মাটির টোপা আছে। খেলা বা ব্যায়ামের ব্যবস্থা নাই। জাল বুনার এবং নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি পাকানোর কাজ আছে। তিনটে বাজার পরেই জমাদার এসে মুশাক্কৎ মুশাক্কৎ বলে চেঁচাতে থাকে। মানে যার যার খাটুনি নিয়ে এস। আমরা কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী। খবরের কাগজের অভাবটাই আমাদের বড় লাগে,—এ দিকে নিষ্প্রদীপ, সাপ্তাহিক স্টেট্সম্যান ওভারসি সংস্করণ পড়তে পাই বটে, তা ছিল ক্ষীণ আলো দিয়ে নিষ্প্রদীপের দুর্নাম ঢাকার চেষ্টা মাত্র। বিকালে ৪টা বাজতেই নিজ নিজ সেলে (cell) গিয়ে তালা বন্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার ঘণ্টা বাজে। গ্রীষ্মকালের বেলা তখনও অনেক বাকি থাকে।

পরদিন সকাল প্রায় ৭টায় তালা খুলে দিত; দীর্ঘ ১৪ ঘণ্টা তালা বন্ধ আলোবাতাস-হীন ক্ষুদ্র কক্ষে দিনগুলি কাটত। লেখার কোনো বিধান নাই বলে খাতাপত্র পাওয়া যায় না। পড়াশুনার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বিলাতী নভেল কিছু কিছু ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব যুগের ধর্মগ্রন্থ ছিল—কিন্তু তার পাঠক ছিল না। স্বাস্থ্যের কথা—মশা আছে, মশারী নাই, ম্যালেরিয়া বেশ আছে। পানীয় জল খারাপ, কাজেই আমাশয় লেগেই আছে। বিষাক্ত পোকা-মাকড়, তেঁতুল বিচ্ছু, বিছেতে সেলগুলি ভরা। ঘর ধুয়ে ঝেড়ে কিছুই প্রতিকার হয় না, পুরানো দেয়ালের মাঝে তাদের বাসা। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি। জলের অভাব নিদারুণ। অনেক দিন স্নান না করে অথবা মাথায় খানিকটা জল দিয়ে রয়েছি, তাও বহুক্ষণ বসে থাকার পর সুযোগ পাওয়া যেত। কোনদিন খাওয়ার জল নাই, কোনদিন বা জল না-পাওয়ায় রান্না হতে দেরি হয়ে যেত। এ নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ লেগেই থাকত। তারা মনে করত, কয়েদীর আবার এত দাবি-দাওয়া কেন? চৈত্র মাসের রোদে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম একটু জলের জন্য। খাবার তরিতরকারী ভাল নয়। আলু মাসে একবার আসে কলকাতা থেকে, সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। ওখানে ভাল চাষ হয় না, কাজেই ভাত ভাল জুটবে কোত্থেকে? সমুদ্রের বড় বড় মাছ পাওয়া যেত; তা দেখে খাওয়ার রুচি থাকে না, খেলেও স্বাদ লাগে না। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের খাদ্য মানুষের খাওয়ার উপযোগী ছিল না। ফ্যানের মতো ভাত, ঘাসের তরকারী, অসিদ্ধ বিস্বাদ ডাল আর তেতো আটার রুটি। তাতে স্বাস্থ্য কেউই ভাল রাখতে পারেনি। আবেদন, নিবেদন ও নালিশের পর অনশন করাই স্থির হয়। ১৯৩৩ সালের মে মাস। সমগ্র ভারতের রাজনীতিক নেতারা জেলে বন্দী। আইন অমান্য আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শ্রমিক-আন্দোলন সরকারী নিষ্পেষণে সবই দুর্বল। এমনি সঙ্কটের সময়ে আন্দামান সেলুলার জেলে শুরু হল অনশন ধর্মঘট। খাদ্যাভাব, শিক্ষা ও সংবাদের অভাব, স্বাস্থ্যাভাব, এত সব অভাব দুর্গতি নিয়ে তিল তিল করে মরণের চেয়ে জীবনের সাধনায় এমনি করে একবারে মরাই ভাল, এমনি দৃঢ়তা নিয়ে সকলে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজবন্দীর দুর্বহ জীবনযাত্রা পরিবর্তনের চেষ্টায় যতীন দাস লাহোর কারাগারে জীবনাহুতি দিয়েছে। যতীন দাসের আত্মদান ব্যর্থ হতে দেব না। বন্দীর জেল-সংগ্রাম স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই অপরিহার্য অঙ্গ। এখানেও আমরা সংগ্রাম-পথযাত্রী। সুতরাং এ বিষম অবস্থায় অনশনই একমাত্র সংগ্রামের উপায়। অনশনকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর

বন্দীদের জামা-কাপড় কেড়ে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী, আমাকেও অনশন করামাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়। সারা দিন একজনকে এক-এক কুঠরীতে তালাবন্ধ করে রাখে। যাতে আমরা মরে না যাই সেজন্যে জোর করে রবারের নল দিয়ে পেটে দুধ প্রবেশ করিয়ে দিত। সীমান্তের দীর্ঘকায় দুর্দান্ত প্রকৃতির পাঠান কয়েদীরা আমাদের দু-পায়ে দু হাতে, মাথায় ও বুকে চেপে ধরত; ডাক্তার দীর্ঘ একটি নল নাসারন্ধ্র দিয়ে গলার খাদ্য নালি অবধি প্রবিষ্ট করিয়ে নলের মুখে দুধ ঢেলে দেয়। একটু মাথা নাড়লেই ব্যথা পাই। ডাক্তারের তাড়াহুড়াতে কতজনের নাসারন্ধ্রে ঘা হয়ে যেত। এমনি নিষ্ঠুরভাবে খাওয়ানোর ফলে আমাদের তিনটি বন্ধু একে একে মারা যায়—মোহিত মৈত্র, মোহনকুমার দাস এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার মহাবীর সিং। তাদের মৃত্যুর পর অনশনকারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। সরকারী অবহেলায় তিনটি স্বদেশপ্রাণ যুবকের জীবন শেষ হয়ে গেল। কেউ জানল না, কেউ তাদের পবিত্র দেহের সৎকার করল না, বিদেশে বিভুঁইয়ে কালাপানির কালো জলে তারা ডুবে গেল। মুক্তি-সংগ্রাম-বিজয়ের দিনে বীর শহীদের বেদীমূলে এদের আত্মদান অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আন্দামান জেলে তিনজন রাজবন্দীর মৃত্যু-সংবাদে ভারতে বিপুল আন্দোলন হয়। ভারত গভর্নমেণ্ট তদারক করার জন্য লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল বার্কারকে পাঠান। এরই মধ্যে আমাদের উপর অত্যাচার চরমে ওঠে। অনশনের মধ্যে একবার দুবার জল পান করতাম। কারুর বা দেড়মাস, কারুর বা একমাস অনশনে থাকার পর সরকারী নির্দেশে জল দেওয়া নিষিদ্ধ হল। নিরঞ্জন সেন ও সুধেন্দু দাসের নাড়ী পাওয়া যাচ্ছিল না বলে তাদের চিকিৎসার নামে পৃথক স্থানে নিয়ে যায়। হীরামোহন নামে একটি ছোট্ট ছেলেকে নীরব ও নিস্পন্দ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ডাক্তার সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করেন: 'কেমন—এবার অনশন ছাড়বে?' ছেলেটি উত্তর দেয়: 'কেন? জল বন্ধ করেছেন বলে মরণও বন্ধ করতে পারবেন কি?' আমি নিজেও তখন জীবনের আশা ছেড়ে দিই। কিন্তু ধর্মঘট শেষ অবধি জয়যুক্ত হবে—এ বিশ্বাস খুবই ছিল। প্রায় দু'মাস পর কর্নেল বার্কার সাহেবের বিবেচনার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অনশন ভঙ্গ করি। এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের প্রায় সকল দাবিই পূর্ণ করে দেওয়া হয়। তিনটি অমূল্য জীবনের বিনিময়ে রাজবন্দীর মহার্ঘ দাবি আদায় করা সম্ভব হয়। এরপর স্বাস্থ্যরক্ষার ও জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির প্রসারের পথ

উন্মুক্ত হল সুদূর দ্বীপান্তরের কারাগারে। শাস্তির আগার নবচেতনার শিক্ষাগারে পরিণত হল—আঁধার ঘরে জ্বললো। নিরঞ্জন সেন, ডাক্তার নারায়ণ রায়, লাহোরের ধন্বন্তরী, শিউ বর্মা প্রমুখ কয়েকজন মার্কসিষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা আন্দামান বন্দীজীবনে এক নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেন। মার্কসবাদী শিক্ষায় ছোট ছেলে হলেও হরেকৃষ্ণ কোঙারের উৎসাহ ছিল অপূর্ব। ডাঃ নারায়ণ রায়ের সুন্দর শিক্ষাপ্রণালী, জটিল ব্যাপারকে সরল করে বুঝাবার অপূর্ব ক্ষমতা এবং জীববিদ্যার ও শরীরবিজ্ঞানের ব্যাখ্যান যুবকদের মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শেষ অবধি আন্দামান জেলের শতকরা নব্বই জন রাজবন্দী কমিউনিজম্ মতবাদ গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে এ মতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এখানে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন (জেলের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন) গঠিত হয়।

যাই হোক, বন্দীজীবনের দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছনার শেষ কিন্তু হয়নি। আমাদের একদিকে যেমন সুবিধা হয়, আবার নিত্য নূতন অসুবিধা সৃষ্টি করাই ছিল চীফ কমিশনার সাহেবের কাজ। জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খুঁটিনাটি বিরোধ লেগেই থাকত। সময় সময় কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে অনশন করতে হত। শাস্তিও ভোগ করতে হত। একবার একজনকে ১০ ঘা বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়। অসুখ হলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ৩।৪ জন পাগল হয়ে যায়। ভারতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে একমাত্র সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী পড়তে পেতাম; তারও অনেকাংশ কাঁচি দিয়ে কেটে দিত। বন্দীদের কৌশল-বুদ্ধিতে মার্কসীয় সাহিত্য জেলের ভিতর যা এসে পড়েছিল তা কম নয়। আন্দামানের বন্দী-জীবনের কাহিনী বিচিত্র।

কেন কমিউনিজমের প্রতি অনুরক্ত হলাম—ইংরেজ গভর্নমেন্টের অনুকম্পায় চারবার ধরা পড়ে অনেক বৎসর জেল খাটার পর চল্লিশ বৎসর বয়সে কমিউনিস্ট হওয়ার মতি হল কেন? পুরানো বন্ধুরা কেউ কেউ এরকম প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে বলেছি, যে-কারণে আপনারা অতীত নীতি-পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে নূতন সমাজতন্ত্রের মতবাদ গ্রহণ করেছেন, সেই কারণেই আমি অতীত নীতি পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবের যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছি। আপনারা যেখানে এসে থেমেছেন সেখানে আমার নূতন চিন্তার উন্মেষ। প্রথম বয়সে দেশের দুঃখ ও দাসত্ব মোচনের জন্য বোমা পিস্তল নিয়ে

জীবনের পথে বের হয়েছিলাম; সেদিন মৃত্যুগর্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মতো। দেশের দুঃখ মোচন কথাটার কোন সংজ্ঞা ছিল না, মৃত্যুবরণ করারও কোন সংজ্ঞা ছিল না। একজন বীরপণার রোমান্স দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিল, আর একজন হয়তো গভীর প্রেরণা ও মানবতার অনুরাগে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। একজন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানই সকল দুঃখের অবসান বলে মনে করত, অন্যজন বুঝেছিল দেশের প্রতিটি নর-নারীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার ভিতর দুঃখ মোচনের উপায়! সুস্পষ্ট কোন আদর্শ না থাকায় বিভিন্ন বিপ্লবী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আদর্শের কল্পিত ছাঁচ তৈরি করে নিজেকে চালিত করত। সেই জন্যেই এক পথের পথিক হয়েও মাঝপথে এসে আমরা পরস্পর বিছিন্ন হয়ে পড়েছি; বিভিন্ন খাতে আমাদের বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। আমার পথ চলেছে সুদূরপ্রসারী গণমুক্তির সাধনায়—আপনাদের পথের দৃষ্টি ওখানে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় দীর্ঘকাল কারাজীবন যাপন করার সময় বহু চিন্তা ও আলোচনার ভিতর দিয়ে কমিউনিজমের প্রতি কেমন করে অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম তা এখন আর মনে পড়ে না; যা মনে পড়ে তাও বিশদভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। '৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল অবধি ছয় বৎসর দেশে ও বিদেশে ইতিহাসের কত রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটে গেছে তারই উপর ভিত্তি করে আমার সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা কমিউনিজমের প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বাংলার অস্পষ্ট অবৈজ্ঞানিক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন—যা শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আকৃষ্ট করেছিল। বর্তমানে যা অচল, সেই অকেজো অতীত আদর্শ ও কর্মধারার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। তবে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামই দেশবাসীকে জাগিয়েছে, সচেতন করে তুলেছে তা স্বীকার করতেই হবে।

বিদেশে রুশিয়ার গণ-বিপ্লব স্বদেশে গান্ধীজীর পরিচালিত পর পর দুটি বিরাট জাতীয় আন্দোলন আমাদের ক্ষুধার্ত শোষিত জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় চেতনা বিকাশের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। কল্পিত উজ্জ্বল আদর্শে বুকের রক্ত দিয়ে দেশজননীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করলেই দেশের দুর্গত জনগণের দুর্গতি আর ঘোচে না: চাই নতুন গণতান্ত্রিক আদর্শ, নতুন কর্মপদ্ধতি, নতুন গণ-সংগঠন—বিপ্লবের বাস্তব লক্ষ্য ও গণসমষ্টির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সুপরিকল্পিত কর্মসূচী। জেলে কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে এবং বাইরের বিপ্লবী কর্মী মহলে আসন্ন

পরিবর্তনের ধারা নিয়ে তুমুল আলোচনা, বাদানুবাদ চলতে থাকে ; জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজম—প্রধানত এই তিন রকম মতবাদই ছিল আলোচ্য বিষয়। এ নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপ গড়ে উঠে সর্বত্র। একদল প্রগতিশীল যুবক কমিউনিজমের উচ্চ আদর্শ পথে বিপ্লবের সফল পরিণতি দেখে। দ্বিতীয় দল জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে কিছুটা দৃষ্টি রেখে প্রথম বিপ্লব সমাধা করে দ্বিতীয় বিপ্লবের জন্য প্রতীক্ষা করতে চায়। তৃতীয় দল জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐতিহ্য ব্যতিরেকে আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন মনে করে না। তখন মার্কসবাদী তত্ত্ব ও মার্কসবাদী সমাজ বিপ্লব সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। গণ-শ্রেণীর সংগ্রাম, শ্রমিক নেতৃত্ব এবং সমাজের শ্রেণীবিন্যাস বুঝেছিলাম মার্কসীয় সাহিত্য পড়ে। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস ও স্পেনের রক্তাক্ত শ্রেণী সংগ্রামে, যা ১৯৩৬ সালে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল,আমরা তাতে যথেষ্ট আকৃষ্ট হই এবং কমিউনিজমের প্রতি আমাদের অনুরাগ বেড়ে যায়। আন্দামানে বসে মার্কসীয় সাহিত্য পড়ায় মনোনিবেশ করি। পড়তে পড়তে পড়ায় অনুরাগ বেড়ে যায়। একা এক মনে পড়েছি—ডাক্তার নারায়ণ রায়ের ক্লাসে পড়েছি—অপরকে পড়িয়েছি। মার্কসীয় দর্শন, মার্কসীয় অর্থনীতি, বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করেছি ;—নিভৃত কক্ষে রাত্রি জেগে চিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। বদ্ধমূল কতকগুলি ধারণা এ-বয়সে ছেড়ে দিতে আমার মন প্রথমে কিছুতেই সায় দিতে চায়নি। পুরানো চিন্তা ও বুদ্ধির বিরুদ্ধে নূতন যুক্তি-বুদ্ধি অবিরত যুদ্ধ করেছে, হেরেছে, জিতেছে, আবার হেরেছে, জিতেছে। এমনি করেই মনের ঘাত-প্রতিঘাত মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আমার জ্ঞান বুদ্ধিকে মার্জিত করেছে, শাণিত করেছে। বহু দিনের শান-বাঁধানো পথ ছেড়ে সহজে নূতন পথে যাইনি ? অর্থনীতিক বিপ্লবের পথ গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয়নি। বিত্ত সম্পদ একজনের না হয়ে দশজনের হবে, কলকারখানায় স্বত্ব পরশ্রমভোগী মালিকের না হয়ে উৎপাদনকারী শ্রমিকের হবে, জমির মালিক জমিদার না হয়ে কৃষক হবে—এক কথায়, ব্যক্তিগত মালিকানা-সম্পত্তির পরিবর্তে সমাজের সমস্ত বিত্ত সমাজের গণ-সমষ্টির অধিকারে আসবে—এ তো একান্তই কাম্য। সমাজ-ব্যবস্থায় এ-পরিবর্তন একমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারাই কার্যকরী হতে পারে।

জেলে সাধারণতঃ দার্শনিক মনোভাব বৃদ্ধি পায় মার্কসবাদী বিপ্লব দর্শন পড়ার দিকে আমাদের ঝোঁক হয় কিন্তু যত কিছু না বুঝার গলদ তা রয়ে গেল দ্বন্দ্বমূলক

বস্তুবাদের ভিতর। গতি ও দ্বন্দ্বের ছন্দে গড়া "দ্বন্দ্ববাদ" সাধারণভাবে বুঝা যায়। কিন্তু বস্তুবাদ মাথায় ঢোকে না বলে সব গুলিয়ে যেত। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ মাথায় চেপে বসে আছে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শে, গীতার আধ্যাত্ম সাধনায় যাদের রাজনীতিক কর্মজীবনের শৈশব দোলাখানি দুলেছিল, তারা অতি-প্রাকৃতের ধারণা (idea of a supernatural being) সহজে ভুলতে পারে না ;—আমি তাদেরই একজন। সমবয়সীদের দল ছেড়ে, শতাব্দীর প্রথম দশকের সহযাত্রীদের সঙ্গ ছেড়ে, মনের সঙ্গে বুদ্ধির, সংস্কারের সঙ্গে যুক্তির তীব্র লড়াই করে তবে আমাকে নূতন পথের যাত্রী হওয়ার মনোবল অর্জন করতে হয়েছিল। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী না হলে অন্য যা কিছু করা যাক কমিউনিজম-এর আদর্শে গণবিপ্লব করা যায় না ; ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির প্রাধান্য, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার অস্বীকার করা যায় না ; সমাজের চিরাচরিত কাঠামো ভেঙে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা আনয়ন করার সাহস হয় না ; সমাজ-জীবনের নীতি- আদর্শ, সত্যাসত্য, ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। বস্তুবাদ বোঝার জন্য ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বসুর সঙ্গে কথা বলে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। ডাক্তার বসু বস্তুবাদে বিশ্বাসী নন—তা হলেও তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা নিজে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। ইলেকট্রন প্রোটন থেকে solar system, solar system-এর ওপর দিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীগ্রহে নেমে এসেছি। পৃথিবীতে এমিবার জন্ম থেকে Evolution theory ও Mutation theory অতিক্রম করে ক্রমবিকাশের পথে পথে বর্তমান যুগে এসে পড়েছি। তারপর অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেছি। আলোচনা করেছি। Tribal Communism, Authoritarianism, Feudalism, Industrial Capitalism—এই সমাজ-গতিধারার যৌক্তিক পরিণতি যে সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম তা বুঝতে কোথাও ঠেকেনি। ডাঃ ভূপাল বসু ও ডাঃ নারায়ণ রায়—এঁরা ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার ষড়যন্ত্র মামালায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। উভয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি, পাশ—সুশিক্ষিত এবং সুমার্জিত বিদ্যা বুদ্ধি-সম্পন্ন। কিন্তু এঁরা আন্দামান বন্দীশালায় রাজনীতিক চিন্তাজগতে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করেন। একজনের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও জেলখানায় অর্জিত দার্শনিক চিন্তাধারা তাঁকে প্রগতিপন্থী মার্কসবাদী করে তোলে।

দেশের কোটি কোটি দুঃস্থ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিতর তিনি ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রসার দেখেন—জীবনের জয় ঘোষণা করেন। অপর জনের চিন্তা, বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ উল্টো খাতে প্রবাহিত। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রগতি তিনি চান না। ভারতের অতীত গৌরব ও ভারতের বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি একান্ত আস্থাবান। তরুণ সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের মার্কসীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বাংলার সন্ত্রাসবাদী দলের যুবকদের শিক্ষা এতো অসম্পূর্ণ, ভাসা ভাসা এবং এতো অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রগতিশীল ছিল যে, মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা তাদের কাছে এক নূতন জ্ঞানালোক নিয়ে আছে। জেলের ভিতরে এই নূতন চিন্তার ব্যাপক উৎস তাদের কাছে বিপ্লবের সুদূর-প্রসারী রূপ ঝরে দেয়। ফলে আন্দামান জেলের তরুণ বিপ্লবী বন্দীদের শতকরা ৯৫ জন কমিউনিস্ট হয়ে পড়েন। ভূপাল বাবুর মত তারা গ্রহণ করেনি। স্ব স্ব দলের প্রতি আনুগত্যের দোহাই দিয়ে—দলের পুরানো প্রবীণ নেতাদের দোহাই দিয়ে তিনি কিছুকাল যুবকদের আকৃষ্ট করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষ অবধি বালির বাঁধের মতো সব ধ্বসে যায়। দুই ডাক্তারের জীবনধারা এমন বিপরীত খাতে প্রবাহিত হল কেন, মনোবিজ্ঞানীয় বিশ্লেষণে তার কারণ নির্ণয় অসম্ভব নয়।

ভারত মহাসাগরের বুকে আন্দামানের, পাষাণ বালি চড়ায় শিক্ষা ও সাধনার মাঝে কমিউনিজমের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠল। তবু মনের পুরানো বন্ধন কাটতে চায় না। পুরানো দল ছেড়ে এবং দলের বন্ধুদের জন্মের মতো ছেড়ে আসতে যেন বাধ বাধ ঠেকে। দলের কর্ম-পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েই জেলে এসেছি—আমাদের দলও আমাকে বিদ্রোহী বলে স্বীকার করেছে। নেতৃত্বের লোভে দল ছেড়েছি—এরূপ প্রচার করে কেউ কেউ আমার বিপ্লব-প্রচেষ্টার অমর্যাদা করেছে। সবই তো অতীতের কথা—এখন তো সেই পার্টি আবার আমাকে ফিরে পেতে চায়। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ত্রৈলক্য "মহারাজ" স্নেহ প্রীতির আকর্ষণে আবার আমাকে টানেন। আমার অন্তরে গভীর দ্বন্দ্ব চলেছিল। কম বয়সের বিপ্লবী বন্দীরা মার্কসবাদী সাহিত্য পড়ে অতি সহজেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার সংকল্প নিতেন। যখন আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সীমা পেরিয়ে যেতে পারিনি, ছোটরা তখন সকল দ্বিধা সঙ্কোচ ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিজের পার্টি বলে গ্রহণ করে ফেলেছেন। অতীত জীবনের সংস্কার আমাকে পিছন দিকে টানে—নব বিপ্লব-আদর্শের প্রেরণা

আমাকে সামনের দিকে ডাকে। শেষ অবধি কমিউনিস্ট পার্টির জয় হ'ল। গণ-বিপ্লবের মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায় ভারতের লাঞ্ছিত গণ-মানবের মুক্তি সাধনায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকেই আমি বেছে নিলাম। একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব প্রচেষ্টাই ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে—এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হওয়ার পর আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম।

ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পথে পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল; ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সুখ শান্তি আসেনি; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিচালন ব্যবস্থার অপপ্রয়োগে শোষিত জনগণ নিঃস্ব; মুষ্টিমেয় ধনিকের রাক্ষসী ক্ষুধায় মানব-সভ্যতা ক্লিষ্ট, ভেদবিভেদে ও মালিক-শ্রমিকশ্রেণী বিরোধে ধ্বংসোন্মুখ। ভারতবর্ষ স্বভাবতই ব্যর্থ ধনতন্ত্র দিয়ে নূতন ভারতে অকল্যাণ ডেকে আনতে ইচ্ছুক হবে না। তা ব'লে অতীতের হস্ত-শিল্প ও ধর্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে সুখী ও স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাও বৃথা। পঞ্চায়েতী শিল্পোৎপাদন এবং পঞ্চায়েতী শাসন উভয়ের সমন্বয়ে যে-সমাজ গড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতে সেই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোই হবে আমাদের জীবনের জয়যাত্রা পথের ভিত্তি। বাস্তব সত্যকে খুঁজে বার করার চেষ্টা না করে আমরা কল্পনা দিয়ে আমাদের সুখের স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলেছিলাম। এখন কমিউনিজম-এর সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত আদর্শে সমাজ গড়ার বুদ্ধি ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বিপ্লবী পথে জোর কদমে চলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল ও সার্থক করে তুলতে পারব।

আমরা বিভিন্ন প্রদেশের লোক আন্দামান সেলুলার জেলে জমায়েত হই। একমাস দু-মাস পর পর নূতন বন্দীদল এসে আমাদের নূতন খবর দিত। সাগরের মাঝেও আমরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা ওয়াকিবহাল ছিলাম। দেশে নাকি তখন নূতন নূতন সমাজতান্ত্রিক দল গজিয়ে উঠেছিল। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কর্মীরা ধরা পড়ার পূর্বে কর্ম-পন্থা নিয়ে, সন্ত্রাসবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে বাদানুবাদ করেন। কলকাতায় জওহরলালের 'সোশ্যালিজম' সম্বন্ধে বক্তৃতা পড়ে আমরা উল্লসিত হই। কেবল বন্দীশালায় নয়, সমগ্র দেশেই নবচেতনায় উন্মেষ হয়েছে ভেবে আমাদের উল্লাস। গান্ধীবাদ, সন্ত্রাসবাদ আর টিকছে না। বর্তমান সময় যুগ-পরিবর্তনের সময়, এমন ধারণা জন্মে। রুশ বিপ্লবের গণমুক্তির হাওয়া বইছিল পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে। ঔপনিবেশিক

পরাধীন দেশের জন-মনে বুর্জোয়া শাসন শোষণ অবজ্ঞাত। এশিয়ার ছোট বড় দেশগুলিও উদ্বুদ্ধ—নতুন বিপ্লবী দলও মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সর্বত্র—চীন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া মালয়, ব্রহ্ম এবং ভারতেও এ-বিপ্লব বাণীই এখন গণবাণী! আগের মতো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বিপ্লবচিন্তা অনাদৃত, অচল। আমরা New York Times কাগজের এক কোণে ছোট অক্ষরে প্রকাশিত কয়েক লাইন পড়ে উৎফুল্ল হই; ইন্দোচীন বা ভিয়েতনামে এক অজ্ঞাত নেতা "হো" লিখেছেন, দেশরক্ষা ও জাতিকে মুক্ত করার জন্যে শ্রমিক বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। স্পেনের শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহেও "আন্তর্জাতিক" বাহিনীতে ইংলণ্ডের সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক, ও কডওয়েল প্রমুখ বিপ্লবীরা জীবন দিলেন। চীনের নেতা মাও সে-তুং চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম চালাচ্ছে ঐ একই ধারায়। আমরা আন্দামান জেলের বন্দীশালায় এ-সব খবর বিদেশী কাগজের ভিতর থেকে খুঁটে খুঁটে বার করতাম। মার্কসবাদী বিপ্লব পথের নিশানা পেতাম এর মধ্যে।

তিন নম্বর ওয়ার্ডের তিন তলার বারান্দায় বসে দুটি বন্ধুর কথা হচ্ছিল। একজন বলে:

ওরা সব ফাসিস্ট; বাইরে গিয়ে এরাই গড়ে ফাসিস্ট দল।

—কেন, ওরা তো বলে আমরা সোশ্যালিজম চাই।

—তা বলুক, এ একটা ভ্রান্ত ধারণা; আসলে ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের মাঝে আর কিছুই নেই। হয় মুষ্টিমেয় ধনীর ধনতন্ত্র, নয়, গরিব জনসাধারণের গণতন্ত্র।

একটু অদূরে বসে আমি দূর সাগরের পানে চেয়ে দুই বন্ধুর কথা শুনছিলাম। তখন বেলা শেষ—সন্ধ্যা ঘনায়মান। আমি ওদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বলি: 'কেন, কমিউনিজম না হলেই কি ফ্যাসিজম হবে?'

'হ্যাঁ দাদা, তাই। ধনতন্ত্র মিশ্রিত যে গণতন্ত্র—বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বিজ্ঞানের উন্নতিতে উৎপাদন-প্রণালী ও যানবাহনের অভিনব বিকাশে তথাকথিত সে-গণতন্ত্র আর বাঁচে না; গণকে বঞ্চিত করে ধন আজ ফেঁপে উঠছে সঞ্চিত সম্পদের উত্তাপে। ধনিককে উপেক্ষা করে দরিদ্র বেকার জনগণ মেতে উঠেছে ঐক্য ও চেতনার উদ্দীপনায়'।

কে কাকে থামায়? স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে ধনশক্তির ফ্যাসিজমকে আশ্রয় করা ছাড়া উপায় নেই। শ্রমিক কৃষক ও সকল মেহনতী জনগণের শ্রমিকের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া উপায় নাই।

আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে গণশক্তিকেও কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে সংহত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ফ্যাসিজম ও কমিউনিজম—এ দুয়ের মধ্যবর্তী যে-অবস্থা তা সমস্যা সমাধানের অবস্থা নয়—"টাগ অব ওয়ার" বা টানাটানির অবস্থা। ধনী মালিক তার সঞ্চিত ধনসম্পদ কায়েম করার চেষ্টায় একদিকে টানে—বঞ্চিত শোষিত শ্রমজীবী জনসমষ্টি তাদের নিজেদের হাতে তৈরি ধনসম্পদ সমষ্টিগতভাবে ব্যবহারের চেষ্টায় আর একদিকে টানে। সমাজের ধনসম্পদ মাঝপথে রাখা যায় কোন বিধানে? ভোগীর দল আর বঞ্চিতের দল যে-রশি ধরে টানে তা যদি ক্ষণেকের তরেও স্থির থাকে, সে হবে যুদ্ধের মাঝে ক্ষণস্থায়ী সন্ধির মতো। মনের কোনো পরিবর্তনেই শোষক আর শোষিতে পাকা সন্ধি হবে না। ধনতন্ত্র ফ্যাসিজমের স্বেচ্ছাচারিতাকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে চায়। গণতন্ত্র সাম্যবাদের (কমিউনিজম) আশ্রয়ে মুক্তি পেতে চায়। মধ্যপন্থা নাই।

কথাবার্তার সময় সিপাই চাবি হাতে উপস্থিত অর্থাৎ এখন আমাদের আপন আপন খোপে ঢুকতে হবে।

তালাবদ্ধ নির্জন কক্ষে বসে দেশের স্বাধীনতার কথা, লোকের দুঃখ দুর্গতি মোচনের কথাই ভাবছিলাম। কিশোর বয়সে মনে জিজ্ঞাসার উদয় হত—'এ জীবন নিয়ে কী করব'। দীর্ঘকাল পরে আজ আবার সেই একই প্রশ্ন—'এ জীবন নিয়ে কী করব'। মানবের দুঃখ-অশান্তি কুসংস্কার দূর করবার জন্য যুগে যুগে কত ভাবে কত পথে মানুষ তপস্যা করে গেছে। মহামানবের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে আমরাও জন-কল্যাণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছি। ভারতবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য ভারতের পরাধীনতা কিশোর বয়সেই আমাকে সংগ্রামের পথে টেনে নেয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মপথ ছেড়ে বিপ্লব-সংগ্রামের পথে আসার পূর্বেও ভেবেছিলাম—'এ জীবন নিয়ে কী করব?' কোন মতে, কোন পথে জীবন-সাধনা সার্থক হয়ে উঠবে। পরবর্তীকালে জীবন-সংগ্রামের পথে বার বার এই কথাটাই নিভৃত মনের কোণে আঘাত করেছে—আসবে কি সর্বমানবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ আমাদের অর্জিত স্বাধীন ভারতে? কোনো সদুত্তর পাইনি। কমিউনিজম যেন জীবন-সমস্যার একটি বাস্তব সমাধান দিয়েছে। ক্রমশ যেন নতুন মতবাদের নতুন আলোকে গণ-মানবের কল্যাণের প্রশস্ত রাস্তাটি চোখে ভেসে ওঠে। মানবমঙ্গলের এই পরশপাথরই কি সন্ধান করছিলাম এতদিন? যেখানে বিশেষ প্রভু কেউ থাকবে না, গোলাম কেউ থাকবে না, শোষক ও শোষিত থাকবে না,

যেখানে 'সকলে আমরা সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' তবু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মূল প্রশ্ন থেকেই যায়—'কেন এ জীবন,' 'কেন এ সংসার', 'কেন এ-সৃষ্টি'? এরূপ চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি—সে ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসের কথা। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে অন্তরের কথা বন্ধুদের প্রকাশ করে বলি—আমি কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করব। মুক্তির পর ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় শাখার সভ্য হওয়ার গৌরব ও সম্মান লাভ করি। ১৯৪০ সালে আবার জেল। এবার কমিউনিস্ট বন্দী। জেল ও অন্তরীণে প্রায় আড়াই বৎসর কাটিয়ে এসে আবার কাজ আরম্ভ করি। বিপ্লবের তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়ে সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পথ চলেছি—আজো পথের শেষ হয়নি। গণ-মানবের মুক্তির সম্ভাবনায় রাতের আঁধার কেটে যাচ্ছে, মুক্তির দিন সমাগত। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির জয় হোক।

প্রায় ৪০ বৎসর জীবনের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের কত না পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু মূল পথের সাধনায় আমরা আজও সফলকাম হইনি। তারই জন্য নানাবিধ পরিবর্তনের পরও আসল অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখি না; একটি অপরিবর্তিত পুরানো একঘেয়ে দুর্গত জীবন আমাদের সমাজদেহ আচ্ছন্ন করে আছে। ১৯০৬-০৭ সালে যে পরাধীনতা ছিল, আজ ১৯৪৭ সালেও সেই পরাধীনতা; তখন যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ছিল, আজও সেই একই সংগ্রাম। স্বাধীনতা তখনও কাম্য ছিল, আজ চল্লিশ বৎসর পরও সে স্বাধীনতা কাম্য বস্তুই রয়ে গেছে। কোন অতীতে (১৯০৫) রব উঠেছিল স্বাধীনতা আসছে, তারপর কতবার স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবিত আশায় দেশবাসী আশাতীত হয়ে উঠেছে, উদ্দীপনা পেয়েছে। কেবল শুনি—'সে যে আসে, আসে, আসে'; কিন্তু স্বাধীনতা আসেনি আজো।

স্বাধীনতার পর প্রায় আরো দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর আমরা যেমনকে তেমনই আছি। দেশে গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের ঢেউ বয়ে গেছে। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস দেশব্যাপী সংগ্রাম শুরু করেন 'আগস্ট বিপ্লব' নামে অভিহিত এ-সংগ্রাম ফলপ্রসূ হয় নাই। কংগ্রেস এবার 'গণ-সংযোগ' ঘোষণা করে শ্রমিক কৃষকের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। কমিউনিস্টরা শ্রমিক ও কৃষকদের তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন ও সংগঠিত করে তুলেছিলেন। তার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে অনাদৃত হয়ে প্রত্যাখ্যাত হল। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র প্রত্যক্ষ

করে কমিউনিস্টরা দলে দলে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন। আমিও ১৯৪৫ সালে ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসি।

১৯৪৫-১৯৪৬ সালে জাতীয় আন্দোলন দেশের নীচের স্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং তীব্র হয়ে ওঠে। 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন, বোম্বাই বন্দরে নৌ বিদ্রোহ, ভারতের বড় শহরগুলিতে স্ট্রাইক, হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিল, পুলিস-বাহিনীর বিদ্রোহ, বিমান-বাহিনীর বিদ্রোহ সারা ভারত প্রকম্পিত করে তোলে। ইংরাজ সৈন্য গুলি ও মেশিনগান চালিয়ে শত শত লোককে হত্যা করেও সংগ্রামী জনগণকে দমাতে পারে নাই। কংগ্রেস নেতারা কৌশলে আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে ইংরাজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এমনি সঙ্গীন পরিস্থিতিতেতে বিপ্লব-ভীতু বিদেশী গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সীমিত স্বাধীনতায় তাদের পুরস্কৃত করেন। ভারত বিভাগ হল; ব্যবসা বাণিজ্যের ও অর্থাগমের অবাধ অধিকার রইল সাম্রাজ্যবাদীর হাতে। পুঁজিপতি জমিদার ও বুর্জোয়া কংগ্রেস পার্টি অনতিবিলম্বে ভারতে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করে নেয়; তাদের গণ-অভ্যুত্থানের ভয় ছিল। ইংরাজের নিকট থেকে যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে গণ-জাগরণ গণ-অভ্যুত্থান স্তব্ধ করে দিতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব খর্ব করতেই হবে।

এ সময় কংগ্রেস নেতৃত্বের ইঙ্গিতে সারা দেশব্যাপী কমিউনিস্ট বর্জন ও দলন আন্দোলন উসকিয়ে দেওয়া হয়, বাংলা দেশের কমিউনিস্টরা পথে প্রান্তরে ও নিজেদের ঘাটিতে আক্রান্ত ও নির্যাতিত হয়।

কংগ্রেসী শাসনের একাধিপত্য দীর্ঘ বিশ বৎসর চলার পর কিছু কিছু ভাঙন ধরেছে বাংলা, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আজো সংগ্রাম অপরিহার্য। সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য পুষ্ট, শাসন-শোষণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অস্ত্রবলে বলীয়ান প্রতি-বিপ্লবী শক্তি পঞ্চাশ কোটি শোষিত দুর্গত নর-নারীর মুক্তিপথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি বিপ্লব বর্তমানে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, তাকে সাম্রাজ্যবাদী শিবির বা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হতেই হবে। আমাদের অতীত যুগের বিপ্লবী সংগ্রাম আর আজকের দিনের বিপ্লবী ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। আন্দামান জেলের পড়াশুনায় আমরা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম কিন্তু তা ছিল নিতান্তই ভাসাভাসা, কাল্পনিক। আন্দামান দ্বীপের স্মৃতিমাল্য ম্লান। কিন্তু সেখানে যে ক্ষীণ আলোক

পেয়েছিলাম আজ এতকাল পরে তাই উজ্জ্বল হয়ে কত না রশ্মি বিকীরণ করছে।

আন্দোলনের তীব্রতা ও প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ আমরা উপলব্ধি করেছি, টেররিস্ট আন্দোলনের কর্মসূচীকেও অবস্থার সঙ্গে পরিবর্তন করে নেওয়ার কল্পনা করেছি। সর্বশেষে টেররিজমের নীতিকেই বরবাদ করে বৃহত্তর ও উচ্চতর গণ-সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করেছি।

বাংলার সংগ্রামের ইতিহাসের বিকাশ-পথে স্বাধীনতার ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, স্বাধীনতার সংগ্রামের ধারার পরিবর্তন হয়েছে, সেই সংগ্রামের সংগঠনের পরিবর্তন হয়েছে।

শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথমটায় যা ছিল দৈহিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, তাই বর্তমানে উজ্জ্বল আদর্শে বৈজ্ঞানিক নীতি-পদ্ধতির সচেতন কর্মপথে রূপান্তরিত হয়ে মুক্তি-সংগ্রামে জয় সুনিশ্চিত করে তুলেছে।

সশস্ত্র-বিদ্রোহপ্রয়াসী যুবকদল বুকের রক্তে জাতীয় স্বাধীনতার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে—মৃত্যুভীত জাতিকে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার পথ দেখিয়েছে। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল অবধি বাংলা ও ভারতের ইতিহাস টেরোরিজমের রক্তরঞ্জিত ইতিহাস বই আর কি? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কতবার আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে—বাস্তব সত্যের গতিপথে সে বাঁধ ভেঙে গেছে, কোনো বাধা টেকেনি। প্রথম যুগে কথা উঠেছিল গুপ্ত-সমিতি ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ আমাদের পথ নয়। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, এখানে ধর্মপথেই স্বরাজ আসবে। রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য বহু সাধু-সংগঠন ও ধর্মাশ্রম তখন বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ত্যাগী ও চরিত্রবান যুবকেরা তখন এ-সকল আশ্রম ও ধর্মসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করতেন। কত নেতৃস্থানীয় যুবক সশস্ত্র বিপ্লবী দল ছেড়ে সাধুসংঘে যোগ দিয়ে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। অরবিন্দ ঘোষও গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়িয়ে পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে যোগ-সাধনায় মগ্ন হন।

প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে বিড়ম্বনাও দেশবাসীর নিকট বিপ্লবীদের কম ভোগ করতে হয়নি। প্রথম দশ বৎসর উক্ত রূপ আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং ফাঁসি ও কারাদণ্ড বরণ করে প্রথম বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় বার ১৯২১-২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আন্দোলনের বন্যায় গান্ধীজীর কথিত 'হিংসা' বা 'ভায়োলেন্সে'র ধারণা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সশস্ত্র বিদ্রোহপন্থীদের সেদিন লাঞ্ছনার

সীমা ছিল না। যুদ্ধোত্তর যুগের নূতন সম্ভাবনায় সমগ্র জাতি তখন বিশ্বাসবান হয়ে ওঠে—সশস্ত্র রুশ বিপ্লবের সুফল এদেশে বুদ্ধ নানক-নিমাইয়ের অতীত আদর্শে রূপায়িত হয়ে উঠল গান্ধীজীর প্রভাবে। ১৯২০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় অহিংসার প্রভাব অনেকটা ক্ষুন্ন হয়। তখন প্রশ্ন ওঠে কোন পথে ভারতের মুক্তি আসবে—চট্টগ্রামের পথে, না, ধরসনার পথে। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে সাফল্যের পথ কী? চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার আক্রমণ করে, ধরসনায় অহিংস সত্যাগ্রহীরা গান্ধীর নেতৃত্বে লবণ-গোলা আক্রমণ করে।

১৯৩০-৪০—এই দশ বৎসরে আমাদের চিন্তাধারায় বিপুল পরিবর্তন আসে। বিদেশী ইংরেজ রাজত্বের অবসানে ভারত স্বাধীন হতে পারলেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে না, বিদেশী ধনিক শাসনের পরিবর্তে স্বদেশী ধনির শাসন প্রবর্তিত হবে মাত্র। সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত ধনিক-বণিকের শাসন ও শোষণের অবসান হবে না, রাজা-জমিদারের মধ্যযুগীয় বর্বর নীতির শেষ হবে না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবী দলের যুবক এবার নূতন অবস্থার সম্মুখীন। বিদেশে রুশিয়ার গণ-বিপ্লবের প্রভাব, স্বদেশে বিক্ষুব্ধ গণশক্তির নব চেতনার উন্মেষ তাদের আকুল করে তোলে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের বাঁধা পথে আর এগোনো চলবে না, জনসাধারণকে সঙ্গে নিতে হবে, জনসাধারণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। যাদের গভীর বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা আছে, নিপীড়িত গণ-মানবের মুক্তিতেই যারা সামাজিক কল্যাণ ও সুখ-শান্তির সম্ভাবনা বুঝেছে, তারা, একমাত্র তারাই, কমিউনিস্ট মত ও নীতিকে গ্রহণ করে নিল—কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিজেদের সংযোগ স্থাপন ক'রে নিল। আর যাদের চিন্তা-বুদ্ধির দৌড় বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারল না, তারা সোশ্যালিজম-এর মধ্যপথে আপস ও কল্পিত সামঞ্জস্যের মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে নিল। অতীত যুগের মতো এ যুগেও আমাদের সম্মুখে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হয়—কমিউনিজম-এর পথ ভারতের পথ নয়। রামমোহনের যুগ থেকে আজ অবধি বাধার পর বাধা এসে নতুন পথের গতিরোধ করার চেষ্টা করেছে—প্রতিবারই বাধার বাঁধ ভেঙে প্রগতির দুর্নিবার গতি এগিয়ে চলেছে জনজীবন বিকাশের পথে, জীবন-সমস্যার সমাধানের পথে।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে বাধা, সমাজসংস্কারে বাধা, রাজনীতিক কর্মপথে বাধা। গতানুগতিক পথে চলায় কোন বাধা পড়েনি। ভারতের প্রথম ও

প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'কংগ্রেস'কেও একদিন বিদেশের অনুকরণ ব'লে বিদ্রূপ করা হ'ত।

ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট পথে চলার নীতি উপেক্ষা করে আমরা সর্বান্তঃকরণে কমিউনিস্ট মত ও পথ গ্রহণ করলাম। কমিউনিজম আমাদের কাছে এল একটি বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা রূপে যা বর্তমান সামাজিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। ইতিহাসের পথে বর্তমান সমাজ যেখানে যে-সমস্যায় এসে পৌঁছেছে, কমিউনিজমই তার একমাত্র সমাধান। তাই আমরা কমিউনিস্ট—আমাদের বিপ্লবের রূপ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব।

আমরা বুঝেছিলাম: 'কমিউনিজম' একটা বাঁধা-ধরা বিধান নয়, 'অন্ধ শাস্ত্রবাক্য নয়,' অথবা যার বিধানগুলি নির্বিচারে বিদেশ থেকে আমদানি ক'রে ভারতের জনসমাজে প্রবর্তিত করতে হ'বে। কমিউনিজমকে দেখেছিলাম বিজ্ঞান রূপে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়—দেশ-কালপাত্র ভেদে তার রূপান্তর ও ক্রমবিকাশ ঘটে। মানবকল্যাণের মূলনীতি ও লক্ষ্য অবলম্বন করে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উন্নতির পথে, সাম্য ও স্বাধীনতার পথে চলতে হয় কমিউনিস্টদের। ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের ভারতীয় দর্শন ও গান্ধীজীর মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থাদি পড়ে আমরা কমিউনিজমের সমাজ-আদর্শের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

মার্কস-এঙ্গেলস্ এক বৈজ্ঞানিক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা মানবজাতির কাছে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদেরই প্রবর্তিত পথে চলেছিলেন লেনিন। তারপরও ১৯ বৎসর অতীত হয়ে গেছে। স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কত উন্নতি ঘটেছে, সোভিয়েতের আদর্শে পৃথিবীর গণ-আন্দোলনের শক্তি কত সুদৃঢ় হয়েছে, গণতান্ত্রিক চেতনায় কত সম্প্রসারণ হয়েছে। আগামী ভারতীয় বিপ্লব আরো কত সুন্দর কত মহান উচ্চতর জীবনধারা নিয়ে আসবে, তা ভেবে আমার কারাকক্ষে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছি। ১৯১৭ সালের গণ-বিপ্লব মানব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় স্থান পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের গভীর-আঁধারে প্রজ্জ্বলিত মশালের মতো এ-বিপ্লব মানবজাতিকে মুক্তি-পথের সন্ধান দিয়েছে। আমাদের সম্মুখে আজ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা—মানবজাতি আর দুঃখের মাঝে ডুবে থাকবে না, দিন আগত ঐ।

সাগরবুকে আন্দামান দ্বীপ। দ্বীপচরের মাঝে এক পাহাড়ের উপর সেলুলার

কারাগার। জেলের পাশেই পাহাড়ের গায়ে ফেনান্বিত ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে পড়ে। কি তার তর্জন গর্জন! কবুতরের খোপের মতো সার-বাঁধা ক্ষুদ্র কক্ষের একটিতে বসে আমি চেয়ে থাকতাম দূর সাগরের পানে। দিনের পর দিন ভগবানকে খুঁজতাম আতিপাতি করে। দক্ষিণ সাগরের অসীমের পানে চেয়ে বিশ্বাতীত মূল বস্তুর সন্ধান করতাম। চোখের দৃষ্টি থেমে গেছে সাগরের নীল জলে —যেখানে ঢলে-পড়া আকাশ মিশে আছে সাগরের গায়ে ; মনের দৃষ্টি ভেসে গেছে দক্ষিণ সাগরের অসীমে। খুঁজেছি, কেবল খুঁজেছি—বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের মাঝে প্রকৃত সত্য কোথায় নিহিত আছে। জীবন-মৃত্যুর বাইরে কোথাও কিছু পাইনি।

কিশোর বয়সে ভাবের আবেগে অন্তরে জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল—'এ জীবন নিয়ে কী করব'? সেই জিজ্ঞাসার একটা উত্তর পেলাম এই সাগর-দ্বীপে— "সংসার-জীবনযাত্রার পথে ভগবানের কোনো স্থান নেই"। বিজ্ঞান ছেড়ে বৃথাই আমরা অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেছিলাম। সুসংগঠিত, সমষ্টিগত প্রীতিময় সাম্যময় সমাজজীবন সাধনাই মানবের মুক্তিসাধনা। কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায় যার যথার্থ পরিণতি। এই নব বিপ্লবই সত্যিকার বিপ্লব।

সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামে যেমন মৃত্যুর গর্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মতো কমিউ-নিজম-এর পথেও মৃত্যুকে তেমনি করেই বরণ করে নিতে হবে—নইলে মুক্তি সুদূর-পরাহত।

মরণের রক্তরঞ্জিত পথেই বিপ্লবের রক্তপতাকা উড্ডীন হয়।

মধ্যবিত্তের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের বন্দীরা, মেছুয়াবাজার, ডালহৌসী স্কোয়ার, ও আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা এবং আরো শতশত রাজনৈতিক বন্দীরা জেলে থাকার সময়েও বাইরের বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ হয় নাই, সরকারী নিষ্পেষণে ও অত্যাচারে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের মহান লক্ষ্য স্তব্ধ করা যায় না।

ব্রিটিশ অধীনতার বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের গৌরব-মণ্ডিত বিদ্রোহের পর ঢাকার বি. ভি. (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) ছোট্ট দলটি অমিতবিক্রমে পাঁচ বৎসর বীরত্বের সহিত দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী কার্য চালিয়ে ইংরাজের বুকে ত্রাস ও ভীতি সঞ্চার করে।

১৯৩২-৩৪ সালের দুটি বড় ঘটনার এখানে উল্লেখ করছি :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব। চ্যান্সেলার বাংলাদেশের গভর্নর স্টানলী জেকসন সাহেব বক্তৃতা দেবেন। সাহেব এসেছেন, বক্তৃতা আরম্ভ করবেন। সিনেট হাউসের সভা নীরব, লাটসাহেব উঠে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেই বিপ্লবী ছাত্রী বীণা দাস গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। জেকসন সাহেবের বুক পকেটের নোট বইয়ে গুলি লেগে প্রতিহত হয়। লাট সাহেব বেঁচে গেলেন। তৎক্ষণাৎ বীণা গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

দ্বিতীয় : দার্জিলিং শহরে ঘোড়দৌড়ের মাঠে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে পুরস্কার দিবেন বাংলার লাট কুখ্যাত এণ্ডারসন সাহেব। আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের অত্যাচার করে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন। তারই পুরস্কার স্বরূপ তিনি বাংলায় বিপ্লব দমনের কাজে নিযুক্ত হন। পুরস্কার বিতরণের সময় এক যুবক লাট সাহেবকে লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলি করেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অন্য একজনের গুলিও ব্যর্থ হয়। এই হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য অনেককে ধরে সাজা দেওয়া হয়। ভবানী ভট্টাচার্য বীরোচিত সাহসের সহিত ফাঁসির রশি গলায় পরেন। উজ্জ্বলা মজুমদারের ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হয়। বি. ভি. দলের আরো তিন জনের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

এ-ছাড়াও পাঁচ বৎসরে বি. ভি. দলের প্রচেষ্টায় অনেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুলিসের ইন্স্পেক্টর জেনারেল, জেল সমূহের ইন্স্পেক্টর জেনারেল, জজ্ গুলিতে নিহত হয়। মেদিনীপুর জেলায় তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট পরপর গুলিতে নিহত হয়।

কলকাতায় বড় সাহেবরা ক্লাব ও সিনেমায় যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ইংরাজ সরকার ফাঁসি, গুলি ও অন্যরকম অত্যাচার চালিয়ে এর জবাব দেয়।

স্বাধীনতা লাভের জন্য একদিকে ক্ষাত্র শক্তির সাধনা অপরদিকে অহিংস অসহযোগের নির্ঝঞ্ঝাট মসৃণ পথের পালা চলে। অবশেষে নৌ-বিদ্রোহে দেশব্যাপী শ্রমিক, কৃষকসহ ব্যাপক গণবিদ্রোহের সূচনা হলে ইংরেজ জমিদার ও

বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি কংগ্রেসের হাতে শাসনভার অর্পণ করে ভারত ছাড়ে। কিন্তু ভারতের বুকে তাদের আর্থিক শোষণের জাল পূর্বের মতোই বজায় রাখে।*

যাক্ এখন আবার নিজের কথা বলি। স্বাধীনতার শত্রু ইংরাজ শাসকদের উচ্ছেদের চেষ্টার অপরাধে গেলাম জেলে—আন্দামান দ্বীপের নির্জন কারাগারে। ফিরে এলাম বিপ্লবের নতুন আলো নিয়ে। রুশ বিপ্লবী বন্দীরাও বরফাচ্ছন্ন সাইবেরিয়ার নির্জন প্রান্তরে বিপ্লবের উজ্জ্বল আলোক শিখায় উদ্দীপিত হয়ে এসেছিলেন।

বিপ্লবী সংগ্রামের জয়যাত্রাপথে জেল, নির্বাসন পথের অন্তরায় নয় বরং সহায়। আমাদের সংগ্রামের প্রথমযুগে ইংরাজের জেলে আমরা যে কঠোর পীড়ন ও অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছি তার সঙ্গে আমার ঐ কথার সামঞ্জস্য নাই। ইংরাজ সরকারের আদালত, বিচার ও আইন সবই অতি জঘন্য ছিল। দীর্ঘকাল দেওয়াই রেওয়াজ ছিল আর জেল থেকে কেউ স্বাস্থ্য ও যৌবন নিয়ে ফিরে আসতেন না। পড়াশুনা শিক্ষা আলোচনার কোন উপায় ছিল না। তা সত্ত্বেও বিপ্লবের অগ্রগতি প্রতিহত হয় নাই। চীন, ইন্দোচীন, কোরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসেও ঐ একই ধারা, কণ্টকাকীর্ণ পথও ছিল—পথের কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে রক্তসিক্ত দেহে জয়ও অর্জন হয়েছে।

*অতীতে পূর্ববাংলা ছিল আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের উর্বর কর্মকেন্দ্র। আজ ৪০ বৎসর পরে সেখানে আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবর রহমান 'বাংলাদেশে'র স্বাধীনতা ঘোষণা করে সারা পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারীর বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পূর্ব বাংলার বাঙালী যে বীরোচিত সংগ্রামে অস্ত্রশক্তিতে শক্তিমান শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে তা অভূতপূর্ব। আমাদের স্বপ্ন আজ দীর্ঘকাল পরে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তবে রূপায়িত করে তুলছে। পূর্ববাংলাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

তারও পরের কথা। বছর পঁচিশ আগে আমাদের জাতীয় নেতারা—কংগ্রেস নেতারা—ভারত বিভাগ স্বীকার করে নিয়ে ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে আপস করে রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেন। তখন কিন্তু মুজিবর রহমানের মতো কোন নির্ভীক নেতা দাঁড়িয়ে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিতে রুখে দাঁড়ালেন না। তা হলে হয়তো পূর্ববাংলার অধিবাসীদের এ-বিদ্রোহের প্রয়োজন হত না।

রুশ বিপ্লব যে নতুন বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিল সে মশালের আলোতে আমাদের জেলের অন্ধকার কক্ষেও প্রবেশ করে বন্দীজীবন উন্নত করেছে, আগে-চলার পথে প্রেরণা দিয়েছে। মুক্তির পর বাইরে এসে আরো পরিষ্কার বুঝা গেল রুশবিপ্লব শ্রমিক-কৃষকের নতুন চেতনা জাগিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এক বিশেষ শক্তির উৎস সঞ্চার করেছে। নবচেতনা-লব্ধ শ্রমিক শক্তির অভ্যুদয়ে জাতীয় মুক্তি-বিপ্লব আন্দোলন বেশী ব্যাপক, গভীর ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। সমাজবাদী শিবিরের দিকেই তাদের ঝোঁক। এতে বুর্জোয়াদের জাতীয় মুক্তির উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়ে। যদিও মূলতঃ জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক, জাতির মুক্তি-বিপ্লব এ যুগে আর বুর্জোয়া বিপ্লবের সামিল হতে পারে না—হবেও না। জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তারা দ্বিধাগ্রস্ত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে তারা লাভবান হবেন না, এই তাদের আশঙ্কা। তার ফলে এ-যুগের জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজবাদী শক্তির উপর নির্ভরশীল। রুশ বিপ্লবের পূর্বে আমরা একযুগ ধরে বুর্জোয়া বিপ্লব চিন্তা নিয়েই ছিলাম। জেলখানার বাধ্যতামূলক অবসর আমাদের কাছে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের নবপর্যায় নিয়ে এল।

১৯৪৭ সন। বিলাত থেকে শলাপরামর্শ করে লর্ড মাউণ্টবেটন ভারতে ফিরে এসেছেন, ৩রা জুন ভারতে স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ। সকলেই জানার জন্য উদগ্রীব। কি বাণী নিয়ে এসেছেন। রাষ্ট্রক্ষমতা কতটুকু পাওয়া যাবে,—সাম্প্রদায়িক সমস্যার কি সমাধান তিনি দিবেন। ৩রা জুন তারিখে বরানগর বাজারে লাটসাহেবের ঘোষণা বাণী শুনতে গেলাম, রেডিওতে মাইক্রোফোন ফিট করা হয়েছে। চৌ-রাস্তার মোড়ে প্রায় হাজার লোক জড় হয়েছে। আমিও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছি। ইংরাজ-রাজ ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাগও করা হবে। শুনামাত্র আমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। আমি খুবই ব্যথিত। সত্য সত্যই ভারত দ্বিধা বিভক্ত হল আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ দু-ভাগ হয়ে গেল। ভারত বিভাগের কথা শুনা মাত্র কতগুলি লোক আনন্দ ধ্বনি করে উঠলেন। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের যে আপসের কথা শুনা গিয়েছিল, তাই ঠিক হল জেনে কংগ্রেস ভক্তরা আনন্দিত। ব্যথিত চিত্তে ঘরে ফিরলাম।

১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট। ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করলো কংগ্রেস। আর পাকিস্তানে মুসলিম লীগ।

১৯৪৮, ফেব্রুয়ারী, ২৮। পঃ বাংলার কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী করে দিলেন। অফিস সিল করে দিল। পার্টি পত্রিকা 'স্বাধীনতা' বন্ধ হল। আমরা দলে দলে জেলে বন্দী হলেম। দমদম জেলে আমাদের ৩ জন কমরেডকে গুলি করে হত্যা করা হল আমাদেরই সম্মুখে।

বক্‌সা শিবির থেকে পাঁচ বৎসর পরে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় এলাম। ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর পার্টির কাজকর্মে কিছু বাড়াবাড়ি হয়। কংগ্রেস রাজত্বে লোকের মোহ কেটে গেছে বলে তখন ধারণা হয়, ফলে কংগ্রেসী শাসন অবজ্ঞাত—তাতে ধর-পাকড় জেলে আটক ও পার্টি বে-আইনী ঘোষণার সুযোগ নেয় তদানীন্তন কংগ্রেসী শাসকগণ।

ক্রমাগত বিশ বৎসর কংগ্রেসী শাসন ভারতে অপ্রতিহতভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পুঁজিপতিদের মুনাফা লুঠ বেড়েই চলেছে। মজুর-কৃষক ও জনসাধারণের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে, রাজনীতিক দলের কর্মীরা জেলে বন্দী হয়েছেন। কিন্তু অবস্থার প্রতিকার হয় নাই। কংগ্রেসী স্বৈরাচারী শাসন যেমনকে তেমনই চলেছে।

নির্বাচনের পর নির্বাচন হয়েছে—কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা বেশী বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট (মার্কসিস্ট) পার্টি সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পেয়ে বাংলা বিধানসভায় সকলের চেয়ে একা একপার্টি সংখ্যাধিক্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন শ্রমিক কৃষক কেরানী মধ্যবিত্ত ও সর্বসাধারণের মধ্যে এখন প্রসারিত। কমিউনিস্ট শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে কংগ্রেস ও অন্যান্য সকল মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া পার্টি এবং শাসক গোষ্ঠী সকলে কমিউনিস্ট পার্টিকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। বাংলার পত্র-পত্রিকা, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ও গ্রামাঞ্চলের জোতদার সকলেই কমিউনিস্ট পার্টিকে অপাংক্তেয়, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করায় উৎসাহী। কিন্তু নির্বাচনে ফল দাঁড়াল অন্যরূপ। কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক কেরানী মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি স্থান করে নিয়েছে, তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। অন্যান্য দল দিনে দিনে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে জনসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে—

একদিকে ধনী মালিক, তাদের রাজনীতিক পার্টি কংগ্রেস পার্টি।

অপর দিকে শোষিত বঞ্চিত দরিদ্র্য অগণিত জনসাধারণ।

শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সর্বহারা মানুষ। একদিকে ধনশক্তি অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ জনশক্তি।

ইতিহাসের নিয়মেই এর শেষ পরিণতি।

ইতিহাসের গতিপথে কমিউনিজম এক নূতন অবদান। ভারতের পঞ্চাশ কোটি নরনারীর সুখ-শান্তির জন্য এই নববিধান আবশ্যক। নিজের শ্রেণী স্বার্থ ত্যাগ করে, মধ্যশ্রেণীসুলভ মানসিকতা বিসর্জন দিয়ে, মজুর কৃষকের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে আমাদের অতীত বিপ্লবী ঐতিহ্য। পৃথিবীতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তার হিংস্র প্রভাব বিস্তার করে দেশে দেশে মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী ঐক্য ও সংহতি গড়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবই একমাত্র সমাধান। ভারতের মানুষ যতশীঘ্র তা বুঝবেন ততই ভারতের কল্যাণ।

প্রথমে বাড়িঘর ছেড়ে, তারপর 'অনুশীলন-সমিতি' ছেড়ে বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। অসংখ্য ভুল-ত্রুটি বিচ্যুতির মাঝে আমার জীবনের চলার পথ রচিত হয়েছে। কমিউনিজম গ্রহণ করা উচিত ছিল আরো অনেক পূর্বে—দেরিতে গ্রহণ করতে পারার আনন্দ আমার আছে। দেশের, জাতির ও জনগণের ভবিষ্যৎ গঠিত হবে যে-নীতি ও কর্মধারায়, আমি তারই বেদীমূলে আশ্রয় নিয়েছি। দীর্ঘ একুশ বৎসর জেল খাটার পর এই সত্য পথই হ'ল আমার পথ।

১৯৩৫-৩৬ সালে আন্দামান দ্বীপের কারাকক্ষের চিন্তা ধারায় লেখা এ-প্রবন্ধ।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা

বাংলা, বিহার ও আন্দামান জেলে এবং অখ্যাত পল্লীতে অন্তরীণ থেকে প্রায় দশ বছর পর ১৯৩৮ সালের শেষ ভাগে মুক্তি লাভ করি। দশ বছরে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নিজ বাড়ির অসচ্ছল অবস্থাও বেড়ে গিয়েছে; ধনী দরিদ্রের পার্থক্যটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে দেশের সর্বত্র। স্পেনে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ব্যর্থতা, জার্মানীতে ধনতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট দানবের অভ্যুত্থান সমগ্র পৃথিবী-টাকেই যেন ধনী ও দরিদ্রের দুটো সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করে দিয়েছে। গণ-

বিপ্লবের নূতন পথে চলার যৌক্তিকতা ও প্রেরণা মনকে করে তুলছে ইস্পাতের মতো শক্ত। ব্যক্তির দারিদ্র্যের চিন্তাও সমস্যা সমাধানের পথ-নির্দেশ করেছিল গণ-বিপ্লব।

কাজেই বাইরে এসে পরিচিত কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে দেখা না করে, নিজের পুরানো বিপ্লবী দলের প্রিয় বন্ধুদের নিকট না গিয়ে, সোজা বাংলা দেশের কমিউনিস্ট পার্টির স্বনামধন্য নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের কাছে উপস্থিত হলাম। আমার মত ও পথ পরিবর্তনের কথা স্পষ্টভাবে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অল্প কথায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যোগদানের অনুমতি দিলেন সন্তুষ্ট চিত্তে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বে-আইনী গুপ্ত সমিতি। পূর্বেও গুপ্ত সমিতিতে ছিলাম; গুপ্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুক্তি-আন্দোলন করার সুযোগ সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশে হয় না। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের পথ ছেড়ে গণ-বিপ্লবের পথে পা বাড়ালাম। আমার মতো আরো শত শত বাঙালী বিপ্লবী যুবক এ-সময় জেল থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লব পরিহার করে গণবিপ্লবের পথে আসেন। জেল জীবনের চিন্তা আলোচনা ও শিক্ষা আমাদের নতুন বিপ্লবের সন্ধান দেয়। কমিউনিস্ট নেতারা আমাদের সাদরে গ্রহণ করেন। আবার মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদলের লোক বলে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তখন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের অবস্থা খুবই খারাপ। থাকা-খাওয়ার সংস্থান তেমন কিছুই ছিল না—রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল না। অভাব ছিল, অখ্যাতি ছিল—সব চেয়ে কঠিন ছিল মজুর-শ্রেণীর চেতনা জাগানো ও সংগঠন গড়া। পুলিসের উৎপাত, মালিকের নির্যাতন ও মজুর শ্রেণীর ঔদাসীন্যের মাঝে যখন পার্টির মুষ্টিমেয় কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা পার্টিতে যোগ দিই। লাভের আশা ছিল না, লাঞ্ছনার আশঙ্কা ছিল প্রচুর। টেরোরিস্ট বিপ্লবী কর্মী, কংগ্রেস কর্মী এবং ঐ সকল মুক্ত বন্দী সমাজে যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতেন কমিউনিস্ট কর্মীদের বা মুক্ত বন্দীদের কারো তেমন মর্যাদা লাভের সৌভাগ্য হয়নি। রাজনীতিক চেতনা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সমাজে কমিউনিস্টদের সমাদর ছিল না। শুধু কমিউনিজম-এর নীতি ও পথে, গণ-বিপ্লবের যৌক্তিকতায় এবং বিজ্ঞানসম্মত পরিণতি সম্বন্ধে একান্ত আস্থাবান ছিলাম বলেই আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছি। সংগঠিত মজুর শ্রেণীর পরিচালিত সংগ্রাম ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য-

মণ্ডিত হওয়ার কোন উপায় আমরা খুঁজে পাইনি। তাই আমরা অনেকে জেলে থাকতেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ায় সংকল্প করি।

কলকাতায় এসে দেখি দলে দলে টেরোরিস্ট আন্দোলনের বন্দীরা মুক্তি পেয়ে পার্টিতে যোগদান করছেন—বাইরেরও ভাল ভাল কর্মীরা পার্টিতে আসছেন। ১৯২৯ সালের উদ্দাম সন্ত্রাসবাদী উদ্দীপনার মতো দশ বৎসর পর আবার আরো ব্যাপক কমিউনিজমের উদ্দীপনা সারা বাংলায় কর্মীদলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। এমন সময় পার্টির ভিতর একটি স্বতন্ত্র গ্রুপ থাকার কথা জানতে পারলাম। পরে পার্টির রাজনীতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে এই-সময়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল চক্রস্তর ছাড়িয়ে পার্টি স্তরে আমরা উঠছি, কিন্তু চক্রগত অভ্যাস ও দুর্বলতা তখনও রয়ে গেছে। মুক্তির পর কলকাতায় গিয়ে আমি তা স্পষ্ট অনুভব করি। কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে লেবর পার্টি, বেঙ্গল, নামে একটা আলাদা দল গঠিত হয়েছিল। এই দলের নেতা ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার। ১৯৩৬ সালের শেষের দিক দত্ত-মজুমদার তাঁর সমস্ত দল সহ, অবশ্য সন্দিগ্ধ লোকদের বাদ দিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও তিনি একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী ধারার সঙ্গে তিনি কিছুতেই খাপ খাইয়ে চলতে পারছিলেন না। লেবর পার্টি ছিল "অর্থনীতিবাদ"-এর পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেও দত্ত-মজুমদার 'অর্থনীতিবাদ'কে ছাড়িয়ে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর রাজনীতিক চালচলন কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলায় বাধছিল। তাই নিয়ে বেধে ওঠে গোলমাল ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। দত্ত-মজুমদার মনে করেছিলেন পার্টি থেকে তিনি বহিষ্কৃত তো হবেনই, যদি একটা বড় রকমের ভাঙন ধরিয়ে বহিষ্কৃত হয়েও যান। তিনি বহিষ্কৃত হতে পারেন সেটাই হবে তাঁর পক্ষে ভালো। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ সালে তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সহ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তিনি বহিষ্কৃত হয়েও যান। তাঁর অধিকাংশ সঙ্গীই অবশ্য পরে তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং ভুল স্বীকার করে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে এসেছেন।

কলকাতায় যখন আমি ফিরে আসি তখন এ সব কিছু আমার জানা ছিল না। দত্ত-মজুমদারের উপদল নানান যুক্তি তর্কের অবতারণা করে আমায়, শুধু আমায়ই বা কেন, অন্য অনেককেও বোঝাতে লাগলেন যে তাঁরাই আসল কমিউনিস্ট, অন্যেরা সব ভুয়ো। আদর যত্নও আমায় খুবই তাঁরা করলেন। নতুন দলে নতুন এসে এই অবস্থায় পড়ে অস্বস্তি বোধ যে করিনি তা নয়। মনে মনে ভাবি মুজফফর আহমদ যেদিকে আছেন সেদিকই ঠিক। আবদুল হালিমকে

দশ বৎসর পূর্বে থেকেই জানি, হালিমও নেতা মুজফ্‌ফরের সঙ্গে আছেন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কর্মীরাও এদিকে। সত্যিকার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার সংগ্রামের পথে এরাই দাঁড়িয়ে আছেন ও দাঁড়িয়ে থাকবেন —তাঁদের সম্বন্ধে এমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। মনে পড়ে, নতুন দলে নতুন ভর্তি হতে এসে এ পরিণত বয়সেও যুক্তির চেয়ে ভক্তিটাকেই বড় করে নিয়েছিলাম। ভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিকে বিচার করেছি, পরে বুঝা গেল ভুল করিনি।

১৯৩৯ সালে পার্টি থেকে ঢাকায় প্রেরিত হই। ঢাকায় তখন সন্ত্রাসবাদের বদলে সমাজতন্ত্রবাদের কথা চলছে; কমিউনিস্ট পার্টি মজুর কৃষক সংগঠন গড়া সবে মাত্র শুরু করেছে। অপর সকল দল বা গ্রুপ কমিউনিস্ট পার্টির নিন্দায় মুখর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর প্রচার বিভাগের কপ্‌চানো বুলি তাদের মুখে মুখে: "কমিউনিস্টরা পরিবার মানে না, ধর্ম মানে না, নীতি মানে না, নৈতিক চরিত্রের কোন মর্যাদা দেয় না।"

ছাত্র ও যুব সংগঠনে, কংগ্রেস কমিটি গঠনে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে প্রতিপক্ষ এই সকল কুৎসার অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে আমরাই ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকি। আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা জিলা কমিটির সভ্য হিসাবে কাজ করি। তরুণ বিপ্লবী রণেশ দাশগুপ্তের সহায়তায় 'ঢাকা জেলা প্রগতি সঙ্ঘ' গঠন করি। বিপ্লবী শহীদ সোমেন চন্দও আমাদের সঙ্গে প্রগতি সাহিত্যের প্রসার ব্রতে যোগ দেয়। সাহিত্যে তার অনুরাগ ছিল। ফাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে লাল পতাকা হাতে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা পরিচালন করে যাওয়ার সময় বিরুদ্ধবাদী দলের প্রতিক্রিয়াশীল গুণ্ডাদের নৃশংস আক্রমণে সোমেনের জীবনান্ত ঘটে। প্রিয় সাথী বীর বিপ্লবী সোমেনের মৃত্যু-সংবাদে আমি মর্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করি। কলকাতা 'সোভিয়েট্ সুহৃদ সঙ্ঘে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তার মৃত্যুবার্ষিকী সভায় আমি যে বক্তৃতা দিই এবং পরে যা "পরিচয়" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরিশিষ্টে তা লিপিবদ্ধ করা হল।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন হয়। যুদ্ধ সময়ের 'অর্ডিনান্স' অমান্য করে সভাপতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে উক্ত সম্মেলন পরিচালন করার অপরাধে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করি। এই মামলায় গোপাল বসাক, নেপাল নাগ, ব্রজেন্দ্র দাস, জ্ঞান চক্রবর্তী প্রভৃতি ১৬।১৭ জনের কারাদণ্ড হয়। এইবার নিয়ে আমার পাঁচবার জেল বাস হল। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব

থাকা অবধি আমাদের জেল-বাসের যোগ্যতা ক্ষুণ্ন হওয়ার কোন কারণ দেখি না। ছয় মাস জেল খেটে বাইরে পা বাড়াতেই পেলাম পুলিস প্রহরীর সাদর অভ্যর্থনা। তাদেরই হেফাজতে সোজা বাড়ি গিয়ে বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে আটক থাকার নির্দেশ পেলাম। পূর্বেও একবার বাড়িতে আটক ছিলাম।

১৯২১ সালে প্রথম জেলে যাই—'৪১ সালের সেই জেল, অন্তরীণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে বাংলায় ১৯০৫ সাল থেকে কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি উৎপীড়নের অধ্যায় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে!

বাড়িতে আটক থাকাকালেই আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল। বর কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী জেল ফেরতা স্বদেশী কর্মী। তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছে। বিয়ের রাত্রিতে বাড়ির চারপাশে পুলিস গুপ্তচরের আনাগোনা; বন্ধুরা মনে করল বিয়ের দিনে দলের কে কে আসে চরেরা তার সন্ধান নিতে এসেছে।

রাত্রি ভোর হতে দেখি, নতুন বরের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিস বাড়ি ঘেরাও করেছে। বাবা-মা বিষণ্ণ মুখে বললেন: "স্বদেশী ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে এ দুর্গতি।" বর পক্ষ থেকে কথা উঠল: "স্বদেশীওয়ালার বাড়িতে বিয়ে করতে গিয়েই এ-দুর্ভোগ।" পুলিসী শাসনের বিরুদ্ধে উভয় পক্ষই তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। বিয়ের লৌকিক অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। পুলিসের হেফাজতে বর, বধূ ও বরযাত্রী দল বাড়ি ফিরে গেল। পুলিস কৃষ্ণপদকে বিশেষ আইনে বাড়িতে আটক থাকার নির্দেশ দিয়ে যায়। স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কলকাতার জাতীয় পত্রিকাগুলি কঠোর মন্তব্য করেছিল।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত হওয়ার পর মুক্তি পেয়ে কলকাতা আসি।

শতাব্দীর প্রথমে স্বাধীনতার অরুণালোকে জাতীয় জীবনের উচ্ছ্বাস বৈধতা ও ভীরুতার সীমা ছাড়িয়ে অগ্নিযুগের সৃষ্টি করেছিল। দাসত্ব, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সুন্দর মনোহর এক কল্পিত স্বাধীনতা তখন কাম্য। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বোমা-পিস্তলের সাহায্যে দুর্জয় অভিযানই তখন মনে হতো অত্যাচার প্রতিকারের উপায়। "পরাধীনা শৃঙ্খলিতা ভারত জননীর দুঃখ মোচনের উদাত্ত আহ্বান" এসেছিল সে দিন মধ্যবিত্ত যুবকের মনের দুয়ারে; সর্বত্যাগী মরণজয়ী যুবকের দল এগিয়ে এল যুগের আহ্বানে, ফাঁসি, গুলি, কারাদণ্ড, নির্বাসন, পুলিসের অমানুষিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা বরণ করে নিল অম্লান বদনে।

আত্মবিস্মৃত জাতি চোখ মেলে "নূতন উষার নূতন সূর্যের পানে"। স্বাধীনতা

সংগ্রামের রোমান্স ও স্বাদশিকতার আবেগ অতীতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনার অমোঘ পরিকল্পনায় পরিপ্লুত হয়ে রুদ্ধ পঙ্কিল জাতীয় জীবনকে অগ্রগতির পথে প্রবাহমান করে তুলেছিল অগ্নিদিনের আলোকচ্ছটায়। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও লোকমান্য তিলকের আশীর্বাদ ছিল এই অগ্নিযুগের বিদ্রোহীদের ওপর। মুষ্টিমেয় যুবকের সাহসিক ক্রিয়াকলাপ ও আত্মদান আত্ম-বিস্মৃত জাতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

বছর দশেক কঠোর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কঠোরতর সংগ্রাম করার পর প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে তাঁরা বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হন। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সত্যসত্যই ভারতব্যাপী একটা বিদ্রোহ করার আয়োজন হয়। সে চেষ্টার ব্যর্থতা এবং ইংরেজের যুদ্ধ জয় সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

পনেরো বৎসরের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ও সংগঠনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তারা জাগিয়ে তুলেছে। এবার আরো ব্যাপক বিপ্লবী সংগঠন আবশ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে কল্পনা এবার সমষ্টিগত সন্ত্রাসবাদ আশ্রয় করে দাঁড়াল। ভীত ইংরাজ রাজ রাউলাট সাহেব নির্দেশিত বে-আইনী আইনের নিষ্পেষণ যন্ত্রে জাতির জাগ্রত জীবনী-শক্তিকে পিষে মারার জন্য উদ্যত হল। যে অত্যাচার মানুষকে নুইয়ে দিতে চায়, সে অত্যাচারই মানুষকে রুখে দাঁড়াবার শক্তি জোগায়। দাম্ভিক আমলাতন্ত্রের অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রতিবাদ করলেন।

প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে "জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের" অনুষ্ঠান হয়। গান্ধী পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র দেশের জনসাধারণ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করে। এ আন্দোলন অবসানের পর সশস্ত্র বিদ্রোহ পন্থার প্রতি লোকের আস্থা ফিরে আসে। ভীত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আবার দমননীতির আশ্রয় নেয়। বিপ্লবী বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার অভিসন্ধিতেই সরকার ১৯২৪ সালে অর্ডিনান্স জারী করে বাছা বাছা বিপ্লবী কর্মীদের গ্রেপ্তার ও আটক করে ফেলে। তিন-চার বৎসর বন্দী-জীবন যাপন করে বাইরে আসার পরই বাংলার বিপ্লবী শক্তি আরো দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে—তারা ১৯৩০ সালে চাটগাঁর অস্ত্রাগার দখল করে সারা বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করে দিল। দেশের জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি তারা পেয়েছিল।

মুষ্টিমেয় অগ্রণী যুবকের দল যে-সংগ্রাম শুরু করেছিল, প্রবলপ্রতাপ, সাম্রাজ্যবাদী শাসক পাশবিক শক্তির আঘাতে তাকে বার বার ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত করতে চেষ্টা করেও এর গতি রোধ করতে সমর্থ হয়নি; বরং শোষণপীড়িত নর-নারী আরো বেশী করে সাড়া দিয়েছে দেশকর্মীর সংগ্রামের ডাকে।

ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে। ধীরে ধীরে শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী শ্রেণী নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে স্বাধীন ভারতে তাদের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগুয়ান হয়। শোষণ ও দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আত্মরক্ষার চেতনাও প্রখর হয়ে ওঠে। রুশিয়ার গণ-বিপ্লব, উন্নততর সমাজব্যবস্থা ও সুখের জীবনযাত্রা ভারতের দরিদ্র জনগণের সংগ্রামের পথে আশা ও উদ্দীপনা জায়গায়। সোভিয়েত রুশিয়ার কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার আদর্শ এ দেশের শ্রমিক কৃষকের লক্ষ্যপথের প্রেরণা যোগায়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ধনতান্ত্রিক সমাজ-আদর্শ এবং পার্লামেণ্টারী রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি ধনীদের ও পুরানো কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অনুকরণীয় হলেও নবজাগ্রত ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী তা থেকে সুখী ও স্বাধীন জীবনের কোনই আশা ও উৎসাহ পায় না।

পূর্বের সংগ্রাম ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভারত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, পাশ্চাত্য দানবের বিরুদ্ধে প্রাচ্য মানবের মুক্তি সংগ্রাম।

এশিয়ার জনশক্তির অভ্যুত্থানের ফলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যভোগীরা প্রাচ্যের রাজা-জমিদার এবং ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের শোষণের অংশীদার করার নীতি গ্রহণ করে নিজেদের স্বার্থ ও প্রভুত্ব বজায় রাখার অপকৌশল অবলম্বন করেছে। দেশীয় ধনী মালিকেরা বিদেশীর পৃষ্ঠপোষিত এই স্বাধীনতাতেই সন্তুষ্ট আর সংখ্যাধিক্য দুঃখ পীড়িত জনসাধারণের কাছে এ-স্বাধীনতা দাসত্বের নাগপাশ বলে মনে হয়। তাই সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ-কৌশল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শোষিত জনগণের মুক্তিসংগ্রামের কৌশলেরও পরিবর্তন হয়েছে। সংগ্রাম আজ শুধু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়; যারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সহায়ক, লুঠের ব্যবসায়ে অংশীদার হয়ে যারা স্বেচ্ছাচারী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ কায়েম করে রাখছে, সংগ্রাম আজ তাদের সবারই বিরুদ্ধে—জমি, খনি, ব্যাঙ্ক ও শিল্প-কারখানার মালিক সাম্রাজ্যবাদের এই অনুচরদের বিরুদ্ধে, ধনতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের

বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। গণ-শক্তির এই মুক্তি সংগ্রামে ডক, রেল, খনি, কল-কারখানার শ্রমিক, গ্রামের চাষী এবং সাম্রাজ্যবাদী পীড়নে পীড়িত সেনাবাহিনী প্রধান উদ্যোগী।

সংস্কৃতি, সভ্যতা, ত্যাগ ও মানবতায় অবদান নিয়ে অগণিত দরিদ্র বঞ্চিত মানবের দল আজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে। জয় তাদের হবেই।

পরিশিষ্ট

সোমেন চন্দ

মহৎ কর্মপ্রেরণায় আত্মদান বৃথা যায় না। বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলণ্ডের তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক রালফ্ ফক্স-এর আত্মদান গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জল হয়ে থাকবে। বছর চারেক আগের কথা। ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে বসে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাই হচ্ছিল। আগ্রহভরা গভীর প্রাণে সোমেন ভাবছিল,—স্পেনে জনগণের জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—আন্তর্জাতিক বাহিনী—ব্রিটেনের গণ-সাহিত্যিক, ব্রিটেনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট রালফ্ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান—স্পেনের জনগণের ধন-সম্পদের মালিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম—বিদেশী কবি, সাহিত্যিক অধ্যাপক ও রাজনীতিক কর্মীদের জীবন উৎসর্গ—এই সব টুকরো টুকরো কথাগুলি একত্রে মিলিয়ে সোমেনের মনে এক অপূর্ব ভাব, বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার হলো। সোমেন জিজ্ঞাসুভরা প্রাণে বলে উঠলো,—সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লো? আমি বললাম: অত্যাচার যখন চরমে উঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারী ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নূতন সাহিত্য তৈরি হয়। ধন-শোষণ-মদমত্ত ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনায় লাঞ্ছিত গণ-মানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলার যে প্রেরণা সেই প্রেরণাই লেখককে গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সোমেন চুপ করে শুনে একটু পরে বললো: 'এঁরাই সত্যিকার সাহিত্যিক'। রাত্রিতে আমরা ফিরলাম। সোমেন তার গুটি দুই তিন লেখক বন্ধুদের নিয়ে নূতন সাহিত্যের কথা বলতে বলতে বাড়ি গেল।

এরা সবাই ছোট ছেলে—২০।২২-এর বেশী বয়স কারও নয়। সবে মাত্র কলেজের পড়া ছেড়েছে। কেউ গল্প লেখে, কেউ কবিতা, কেউ বা একটা আধটা প্রবন্ধ। একে অন্যকে পড়ে শুনায়। স্থানীয় মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশ করার সুযোগও পায়।

ঢাকা শহরে ছোটবড় অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের তথাকথিত রাজনীতিক বিপ্লব-সঙ্ঘ আছে। এরা কোন দলেই যায়নি। সোমেন একদিন বলে: দলের টানাটানি আমাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে যাইনি—কেবল মারামারি রেষারেষি তাদের কাজ,—আমার ভালো লাগে না।

আন্দামান ফেরতা, টেররিস্ট বিপ্লবী দলের পুরানো কর্মী বলে সে প্রথমটায় আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিনের পরিচয়েই আমি তাকে বলি,—সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্যপীড়িত দুঃখী জনগণের আশা-উত্তমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণ-সাহিত্য তৈরি কর—তাহলে তোমার ঈপ্সিত স্বাভাবিক কর্ম পথেই ভবিষ্যৎ গণ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুতের সহায়ক হতে পারো। লেখার দিকেই তার বেশী টান এইটে বুঝেই ঐ কথা বলেছিলাম। সোমেন সব কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। তবু তার আগ্রহটা বোঝা যায়।

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সোমেন তার দক্ষিণ মৈশণ্ডি পাড়ায় আমাদের কমিউনিস্ট পাঠ-চক্রে যোগ দেয়।

গোপনে ক্লাস হতো। সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে শুনতো—বেশী প্রশ্ন করত না। কৃষক শ্রমিকের জীবন কথা, কোটি কোটি দরিদ্র জনগণের মর্মব্যথা, তাদের সংগঠন, জাগরণ, মার্কস্-লেনিন প্রদর্শিত সংগ্রামের পথে সাম্যবাদের নবজীবন তাকে নূতন প্রেরণা দিলো। একদিন ক্লাসের পড়ার পর তার বাসায় গেলাম। নূতন কী লিখছো জিজ্ঞাসা করায় সে একটি গল্প পড়ে শুনালো। দেখলাম, গল্পে আমার ক্লাসের পড়ার ছাপ পড়েছে। বেকার মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ অশান্তি, তারই পাশে মুসলমান গাড়োয়ানদের দুর্গত বস্তি জীবন, অপরদিকে বাড়িওয়ালা মহাজনের ধনৈশ্বর্যপূর্ণ প্রাসাদ—ধনীর নিদারুণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবনে দাম্ভিকতার ছবি ফুটেছে সোমেনের লেখায়। চাকা ঘুরছে, লেখকের বিষয়বস্তু দৃষ্টিভঙ্গি আর পূর্বের মতো নেই। রসবোধ নূতনতর, গল্প সৃষ্টি ও লেখনভঙ্গি আগে থেকেও সুন্দর। বেশ ভালো লাগলো সোমেনকে। শান্তস্বভাব, সরল, কিন্তু গভীর ভাবের উদ্দীপনা জেগেছে প্রাণের পরতে পরতে। সোমেন কমিউনিস্ট পার্টিতে ভিড়ে পড়লো। আগ্রহশীল বিশ্বস্ত কর্মীর প্রশংসমান দৃষ্টি তার উপর। পুলিসের খাতায় এখনও নাম ওঠেনি, কাজেই 'দক্ষিণ মৈশণ্ডী প্রগতি পাঠাগার' পরিচালনের ভার পড়লো সোমেনের উপর। সোমেনের অমায়িক স্বভাবে পাড়ার ছেলেরা

তার গুণ-মুগ্ধ। 'প্রগতি পাঠাগারে'র সাপ্তাহিক বৈঠকে সোমেনের গল্প ও প্রবন্ধ হতো সবচেয়ে ভালো।

তখন ঢাকায় ৬।৭টি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র ছিল। মধ্যযুগীয় ভাবধারা মিশ্রিত আধুনিক বুর্জোয়া মতের গল্প, প্রবন্ধ, আর্ট ও অস্পষ্ট রাজনীতি ছিল ঐ কাগজগুলির উপজীব্য। প্রগতিশীল নূতন লেখকগণ অজ্ঞাত কুলশীল ও অপাঙক্তেয় ছিল—তেমন লেখন-প্রতিভাও তাদের ছিল না। এই লেখকদের সংগঠন ক'রে প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় সাহিত্যিকদের মাঝে একটি নূতন সাহিত্য-চক্র দাঁড় করানোই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। নূতন গণসাহিত্য সৃষ্টির কাজে রণেশ দাশগুপ্তের উৎসাহ, রচনা-ক্ষমতা, জ্ঞান বুদ্ধি যথেষ্ট প্রখর। এই যুবক মেধাবী লেখকের জোরেই আমরা "ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ" গঠনের কাজে অগ্রণী হলাম। বিভিন্ন পাড়ায় অজানা লেখকদের সঙ্গে সঙ্ঘ গঠনের কথা-বার্তা চললো। সোমেনের খুব উৎসাহ। মনের মতো কাজ পেয়েছে। সনাতনী সাহিত্যের গোঁড়ামি এবার ভাঙবে। সে তার পরিচিত অজানা অচেনা যুবক লেখকদের প্রগতি লেখক সঙ্ঘে টেনে আনলো। বড়দের বাধা ঠেলে একত্রে দাঁড়াতে পারবে বলে নূতন লেখক দলের সকলেরই আগ্রহ, উৎসাহ খুব প্রবল। কমিউনিজম বা শ্রমিক কৃষকের কথা আমরা কিছুই উল্লেখ করলাম না, কারণ তা সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও দেশীয় বুর্জোয়া উভয়ের রুচি-বিরুদ্ধ। ভারতীয় ঐতিহ্যপ্রণোদিত চিরাচরিত রসাভি-ব্যক্তির স্থানে প্রগতিশীল মনোভাব, নূতন রসবোধ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও তার নব অভিব্যক্তির প্রতি তীব্র আকর্ষণ পুরানোর বিরুদ্ধে নূতনের বিদ্রোহ সূচনা করতো। আমরা সেই বিদ্রোহী নবীন বুর্জোয়া লেখকদের নিয়ে নবযুগের সমাজতান্ত্রিক প্রগতির পথে নূতন সাহিত্য সৃষ্টির আশায় সঙ্ঘ গঠনে মনোযোগ দিলাম। এ সময়ে দরিদ্র জনগণের প্রতি দরদ দিয়ে গল্প লেখার রেওয়াজ যুবক লেখকদের মধ্যে দেখা দেয়; প্রবীণেরা একে বিদ্রূপ করতেন, নিন্দা করতেন। আমরা নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যুবক লেখকদের নিয়ে 'প্রগতি লেখক সংঘ' গঠন করলাম। সপ্তাহে একদিন সংঘের বৈঠক হতো। কবিতা, গল্প, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করা হতো এবং সাহিত্য বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হতো। মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, সকলকে খবর দেওয়া, নূতন সভ্য সংগ্রহ করার কাজে সোমেনের উৎসাহ থাকায় তারই উপর এ সকল কাজের ভার পড়লো। সে প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকতো, প্রায়ই গল্প লিখে নিয়ে আসতো। ক্রমে তার লেখার ধারা ভাবাবেগ সিঞ্চিত বেদনার অভিব্যক্তি থেকে রূঢ় বাস্তবের চেতনায় রূপায়িত হয়ে

বিপ্লবী খাতে প্রবাহিত হল, যা কিছু জড়, অনড়, সনাতন, যা কিছু গতানুগতিক, প্রগতি বিরোধী সবেরই মূলে সে করলো কুঠারাঘাত। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সে লিখবে এবং নিপীড়িতগণের বিপ্লবী সংঘ গঠন করবে এমনই তার সঙ্কল্প। পরে সে 'প্রগতি লেখক সংঘের' সম্পাদক হয়।

সোমেন গল্প লিখতো। ঢাকায় মাসিক ও সাপ্তাহিকে মাঝে মাঝে তা বের হতো। শ্রীহট্টের একটি মাসিকপত্রে এবং কলকাতায় কোনো কোনো মাসিকপত্রেও তার গল্প প্রকাশিত হতো। অনেক গল্প খাতাতেই থাকতো—অজানা লেখকের লেখা কেই বা নেবে?

সোমেনের বন্ধুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নারী-জীবনের মাধুর্য এবং অজানার সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে কবিতা ও সাহিত্য রচনা করতো, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমলোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখ্‌তো। প্রগতি লেখকদের দলে ভিড়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হলো,—তারা ক্রমে ক্রমে বাস্তবাদী হয়ে উঠ্‌ল—আত্মগত ভাব সৃষ্টির স্থানে বস্তুগত ভাব প্রকাশের দ্যোতনা এলো তাদের মনে। সমাজ-মনের সত্যিকার পরিচয় রূপায়িত হয়ে উঠ্‌লো তাদের নূতন লেখায়—নূতন ভাবধারায় নূতন চিন্তায় ও আলোচনায়। এক কথায় সকলেই গণ-মানবের দরদী সাহিত্যিক হয়ে পড়লো। সোমেনের চেষ্টায় ও আগ্রহে আমরা তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম—ক্রমশ তার রাজনৈতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে এসে পড়লো। সোমেন ঐ দলের অগ্রণী কর্মীরূপে তাদের আগে আগে চলেছিল।

সোমেনকে ঢাকার একজন প্রবীণ সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'কি হে তোমরা নাকি একটা প্রগতি লেখকদের দল বেঁধেছো? সাহিত্যের আবার প্রগতি পশ্চাদ্‌গতি কী? সাহিত্যের রস সৃষ্টি করতে পারলেই তা সাহিত্য হয়।' সোমেন সৌজন্যের সঙ্গে উত্তর দেয়—'রসবোধও যে সকলের সমান নয়, তাইতেই যত দ্বন্দ্ব বিরোধ। সেকালের জমিদারের প্রতাপ-ঐশ্বর্য, শাসন-শোষণ দিয়ে পল্লী-গাথা রচিত হতো, একালে পল্লীবাসী প্রজার দারিদ্র্য অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ফুটিয়ে তুলে সাহিত্য প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়। প্রবীণ চায় জমিদারের প্রতিষ্ঠা, নবীন চায় জনগণের প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা। বুদ্ধিমান কোনো লেখক হয়তো দুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে একটা মধ্যম পন্থার মীমাংসা দিয়ে সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন।' প্রবীণ ব্যক্তিটি উষ্ণভাবে বলে উঠলেন, 'তোমাদের সেই এক কমিউনিজ্‌মের বুলি'। 'এ শুধু আপনার মনের কথা—আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা'—এই বলে সোমেন চলে এল।

১৯৪০-৪১ সালে ঢাকার অনেক কমিউনিস্ট জেলে গেল—অনেকে গোপনে কাজ করার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। সোমেন তখন বৈপ্লবিক কাজে আরো তৎপর হয়ে উঠলো। সাহিত্য চর্চার অবসর বড় একটা রইলো না। সে ঢাকা রেলওয়ে মজুর ইউনিয়নে যোগ দিয়ে কাজ করতে লাগলো; মজুরের বস্তিতে, কারখানার গেটে, ইঞ্জিন সেডের কাছে কয়লার ধোঁয়ার নীচে দাঁড়িয়ে শোষিত শ্রমক্লান্ত মজুরদের সঙ্গে কথা কয়—ইউনিয়নের লাল পতাকার তলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহ দেয়। রেল মজুরেরা তাদের তরুণ নেতা সোমেনকে বিশ্বাস করতো—ভালোবাসতো। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দীপনা তারা পেয়েছিলেন তাদের নেতা কমরেড সোমেনের কাছ থেকে।

সোমেন আগে একবার ঢাকেশ্বরী মিলে কিংবা নারায়ণগঞ্জের পাটকলে গিয়ে মজুরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু লেখক সঙ্ঘ থেকে তাকে ছাড়া যায়নি। পার্টির স্বার্থে আমরা তাকে লেখক সঙ্ঘে রাখা অপরিহার্য মনে করেছিলাম। লেখক সঙ্ঘের স্বার্থেও ফ্যাসিস্ট বিরোধী বিপ্লবী সাহিত্যিকের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল।

সে মাঝে মাঝে ঢাকা শহরের আশে পাশে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ একঘেয়ে জীবনের সন্ধান নিতো। মজুর-কৃষকের লাঞ্ছিত অনাদৃত জীবন থেকে সে গণ-সাহিত্য রচনা করার প্রেরণা পেয়েছিল। 'সাহিত্যিককে শ্রমিক বিপ্লবের সহায়ক হতে হবে' 'ফ্যাসিজম ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে।'—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সঙ্ঘের বিশ্ব-বিখ্যাত সম্পাদক ডিমিট্রভের লেখকদের প্রতি এই নির্দেশ সোমেনের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

রেলওয়ে মজুর-সঙ্ঘ গঠনের কাজে সোমেন এমন কৃতিত্বের পরিচয় দেয় যে তাকেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়।

প্রথম থেকেই সোমেনের লেখার দিকে ঝোঁক ছিল বলে প্রগতি লেখক সঙ্ঘে তার ডাক পড়ে সবার আগে। সেও তার সাহিত্য সাধনার স্বাভাবিক কর্মপথে আগ্রহভরা প্রাণে যোগ দিয়ে নিজের লেখন-প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে নেয়। রাজনীতিক কর্মপ্রেরণা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল,—বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে বাদ দিয়ে শুধু সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে সে পারেনি। ফ্যাসিস্ট দানবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা প্রচেষ্টায় সকল শক্তি দিয়েই অগ্রসর হওয়া তার কাম্য ছিল, তার জন্যেই সে সাহিত্য ছেড়ে শ্রমিক সংগঠনে লেগে যায়। তার

লেখক বন্ধুদেরও সোমেন প্রথম টেনে আনে নূতন লেখক সঙ্ঘে। পরে তাদের কমিউনিজমের বিপ্লবী রাজনীতিতেও আকৃষ্ট করে তোলে। এইখানে বাইশ বৎসরের যুবকের প্রতিভা ও কর্মকুশলতার পরিচয়। লেখা দিয়ে ভাব-বিপ্লব আর কাজ দিয়ে হয় রাষ্ট্র-বিপ্লব—সোমেন তা শিখেছিল।

তার অন্তরের প্রেরণা সাহিত্য রূপ নেওয়ার আগেই ফ্যাসিস্ট ঘাতকের ছুরি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে দিল। প্রতিক্রিয়াশীল বর্বর ফ্যাসিস্টবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল উন্নত গণতন্ত্রবাদের সংগ্রামে তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক সোমেন চন্দই এদেশে প্রথম জীবন উৎসর্গ করলো, মুক্তি যুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ মৃত্যু বরণ করে হলো স্পেন, সোভিয়েত ও চীনের আত্মদানকারী গণ-সাহিত্য স্রষ্টাদের সংগ্রামের সাথী।

ঢাকা জেলা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলনে রেল মজুরদের একটি প্রসেশন নিয়ে আসার সময় প্রকাশ্য রাজপথে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিক গুণ্ডাদল সোমেনকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারা তাকে ভোজালী দিয়ে আঘাত করেছিল—মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরেছিল— চোখ উপড়ে দিয়েছিল। লাল পতাকা হাতে নিয়ে সে এসেছিল—লাল পতাকার নীচে দাঁড়িয়েই সে মরেছে। সোমেনের বুকের রক্তে লাল পতাকা উজ্জ্বল রঙীন হয়ে রইল। পৃথিবীর লাল ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখতে গিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে যত লোক মৃত্যুর কোলে শুয়েছে সোমেন তাদের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল। স্পেনে আন্তর্জাতিক বাহিনীর নিহত রাল্‌ফ ফক্স ও অন্যান্য শহীদের আদর্শে যে জীবন আরম্ভ, তাদের মরণ-পথেই সে জীবনের অবসান। ভারতে তার তুলনা মেলে না।

সোমেনের সাহিত্য প্রতিভা ছিল কিন্তু তা বিকাশের সময় হল না—গণ সংগঠনের বিপ্লবী কর্মকুশলতা ছিল কিন্তু তা প্রকাশের সময় হল না। বিপ্লবের শত্রুর নির্মম আঘাতে তরুণ বয়সেই তার জীবনান্ত হয়ে গেল। তবু এ জীবনের রক্তরেখায় বিপ্লব এগিয়ে চলবে উদ্বুদ্ধ গণ-জীবনের পথে।

সোমেনের শান্ত অমায়িক স্বভাব সকলকে আকৃষ্ট করেছিল—কারুর সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল না। ঘটনার কয়েক মাস পরে শান্তভাবে আলাপ করতে করতে ফ্যাসিস্ট দলের এক সরল যুবক অসতর্ক মুহূর্তে আমাকে বলেছিল, সোমেন বাবুকে মারা ঠিক হয়নি, তার প্রতি আমাদের কোনো আক্রোশ ছিল না বরং তার শান্ত স্বভাবের জন্য আমরা তাকে ভালই মনে করতাম।

বিপ্লবী সোমেন, কমিউনিস্ট সোমেন, ভারতের স্বাধীনতাকামী সোমেন

ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে আন্তর্জাতিক জন-যুদ্ধের বীর সৈনিক রূপে ২২ বছর বয়সে আত্মজীবন উৎসর্গ করে গণ-মানবের উদ্বুদ্ধ চেতনাকে সংগ্রামমুখী করে রেখে গেল। তার অস্পষ্ট অর্ধস্ফুট সাহিত্য ফুটে উঠবে, স্পষ্ট হয়ে উঠবে নতুন বিপ্লবী সাহিত্যে—নিপীড়িত গণ-মানবের মন বেদনার দুর্জয় হিংসার অভিব্যক্তিতে।*

* ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের (পরে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ') উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'সোমেন-স্মৃতি সভার' বক্তৃতা। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত।

উপসংহার

অতীত স্মৃতি যখন বিস্মৃতিতে বিলীনপ্রায়, বয়স এবং রোগ এ-দুয়েরই আক্রমণে আমার জীবন যখন ঘরের অচলায়তনে বন্দী, তখন স্মৃতিকথা লেখার মানে অনুর্বর জমিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা; স্মৃতির মালার ছিন্ন ফুলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে আবার মালা গাথার চেষ্টা। বিপ্লবী জীবন আরম্ভ হয়েছিল শতাব্দীর প্রথম যুগে মধ্যযুগীয় প্রভাবের মধ্যে শিক্ষা সংস্কার সবই অতীত ভাবধারায় গড়া। এরই মধ্যে বিদেশী অধীনতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লবের শিক্ষা পেলাম। বিপ্লবের সংগ্রাম পথে বুর্জোয়া. শিল্পোৎপাদন চিন্তা প্রবাহের ভিতর দিয়ে জীবন এসে পড়েছে গণবিপ্লবের স্রোতধারায়। বিশ্বের অগ্রগতির তালে তালে চেতনাও এগিয়ে চলেছে, কিন্তু এ দেশের বাস্তব অবস্থা দূর অতীতেই পড়ে আছে। পরিবর্তনের সাথে আমাদের শ্লথগতি বাস্তবকেও জোর কদমে চালিয়ে নিতে হবে; খাপ খাইয়ে চলতে হবে বিশ্বজনের সঙ্গে নইলে শিল্প বিপ্লবে ও উন্নত শিল্পোৎপাদনে যেমন পিছনে পড়ে আছি, গণবিপ্লব ও সমাজবাদী অর্থনীতি গড়ার ক্ষেত্রেও আমরা পিছনেই পড়ে থাকব। কবির খেদোক্তি থেকেই যাবে 'দিন আগত ঐ ভারত তবু কৈ?'

সমাজের গতানুগতিকের ক্লেদ থেকে বিপ্লব মানুষকে মুক্ত করে, সম্মুখপানে চলার বাধা দূর করে দেয়। আগে চলার পথ সহজ ও ত্বরান্বিত করে। বিত্ত সম্পদ ভোগী প্রতিক্রিয়ার শক্তি বিপ্লবী পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখার জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ করে।

আমার সংগ্রামী জীবন পথে ১৯৪২-৪৬ সাল এই পাঁচ বৎসর বাস্তব বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ভারতে। জাতীয় নেতা গান্ধী বিপ্লবের অনুকূল

পরিস্থিতিকে তার স্বকীয় কর্মনীতির খাতে চালিয়ে তখনকার বিপ্লবী অভ্যুত্থান বানচাল করে দেন। শেষের দু'বৎসর (১৯৪৫-৪৬ সাল) গান্ধীর লাগাম ছিঁড়ে জাতীয় অভ্যুত্থান ফেটে পড়ে—জন-বিক্ষোভের ঝড়ো হাওয়ায় লড়ায়ের দামামা বেজে উঠে নৌ বিদ্রোহে ও আনুষঙ্গিক পুলিস, বিমান ও গণ বিদ্রোহের অগ্নি-শিখায়। এখানেও জাতীয় নেতৃত্ব ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কঠোর হস্তে বিপ্লবের আগুন নিভিয়ে দেয়।

বিপ্লবী পরিবর্তনের অনিবার্য সংঘর্ষ ছাড়াই আমরা ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্র শাসনাধিকার পেলাম, অবশ্য দেশকে দ্বিখণ্ডিত করায় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত স্বীকার করেই। দুই বিবদমান পক্ষের স্বার্থের অনুকূলে আপস রফা করে শাসন ক্ষমতা অর্জিত হল। তার ফলে আমাদের গতানুগতিকের ক্লেদ দূর হল না। আগে চলার পথও ত্বরান্বিত হল না। এমনি অর্জিত স্বাধীনতার ফুটো নৌকায় আমরা যাত্রা করলাম স্বাধীন ভারতে জাতীয় জীবন গড়তে। কংগ্রেসী শাসনের সেই মন্ত্রে দেশের মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, চীনে, ইন্দোচীনে, (ভিয়েতনাম) ও ইন্দোনেশিয়ায় তখন সাম্রাজ্যবাদী বন্ধনের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চলছে। আপস রফার ফুটো নৌকোয় আমরা বিশ বৎসর অবাধে অনেক কষ্টে চলে আর বেশী দূর এগুতে পারলাম না; জলে নৌকো ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল।

আবার দেশের মানুষের চিন্তায় সংগ্রামের রুদ্র রূপ ভাসছে। এবার তা আরো ব্যাপক আরো তীব্র এবং গভীর।

আমি দেখছি অদূর ভবিষ্যতে ধনশক্তি আর সর্বহারা গণশক্তির সংঘর্ষ আসছে। আমার ৭৮ বৎসর বয়সের রোগজর্জরিত বার্ধক্য আমাকে মৃত্যুর কোলে ডেকে নিচ্ছে। পরিবর্তন প্রবাহ চলছেই চলবেও।

বিপ্লব আসছে নূতন প্রবাহে নবজাতকের সুন্দর জীবন নিয়ে।

স্বাধীন ভারতে ২৩।২৪ বৎসর বাস করার পরেও দেশের জন-সাধারণের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এল না। ধন বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে—একদিকে ধন ঐশ্বর্যের স্তূপ জমা হচ্ছে। আর একদিকে শ্রমজীবী মানুষের দুর্গতি বাড়ছে। একদিকে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিক আর একদিকে অসংখ্য মানুষ সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে।

কণ্টকময় বন্ধুর পথে আমাদের আরো চলতে হবে - জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে সমাজবাদের বৈজ্ঞানিক সুখী সমাজ গড়তে হবে। মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এ কল্পনাবিলাস নয়! মেহনতী মানুষের উদ্যোগে, তাদেরই কর্মসাধনায়

নবগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আলো জ্বলবে। মানুষ শিক্ষা সংস্কৃতিতে ও বৈজ্ঞানিক সমাজজীবন নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে যাবে।—সমাজের বিত্তসম্পদ, মানুষের নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তিগুলি ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির উপাদান না হয়ে তা সমাজের জনসমষ্টির উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত হয়ে জনসমষ্টিরই কল্যাণে নিয়োজিত হবে। নূতন যুগের এই শিক্ষা, মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ এই পথই আগামী দিনের নবজীবন গড়ার পথ। ধন-ঐশ্বর্য মানুষের গৌরবের ও শক্তির প্রতীক না হয়ে মানুষের কর্মশক্তি ও প্রতিভাই মানুষের শক্তি ও গৌরবের প্রতীক হবে। নূতন যুগের উন্নত সমাজ ব্যবস্থা আসছে অদূর ভবিষ্যতে। বিপ্লবী জীবনের শিক্ষায় ও জেল জীবনের চিন্তায় অর্জিত এই বৈজ্ঞানিক চেতনা আমাদের পথের সন্ধান দিচ্ছে।

বিপ্লবেরই জয়।

সতীশ পাকড়াশীর সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জী

নির্মল মৈত্র কর্তৃক সংকলিত

১৮৯৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকায় মাধবদী গ্রামে জন্ম।

তাঁর পিতার নাম ৺জগদীশ চন্দ্র পাকড়াশী।

পিতামহের নাম ৺জগৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য পাকড়াশী।

এনারা পাবনার স্থল গোবিন্দপুরের পাকড়াশী।

মায়ের নাম ৺সরোজিনী দেবী।

মাতুলালয় নরসিংহদী সার্টির পাড়ায় লেখাপড়া করেছেন।

ছোটবেলায় ধীর স্থির ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন।

বয়সের সঙ্গে বাইরের সবকিছু জানবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল।

১৯০৫-৬ সালের বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

১৯০৮ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বয়সের সাথে সাথে সমাজ সংস্কার কাজে—মরা পোড়ানো, রোগী সেবা করা, ক্লাব করা প্রভৃতি করতেন।

শরীর চর্চায় মনোযোগী হয়ে ছোরা, লাঠি, বন্দুক প্রভৃতি চালনা শিখতেন।

এই সময় মহারাজ ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, পুলিন দাস, ব্যারিস্টার পি. মিত্র-এর সংস্পর্শে আসেন।

কাকা-জ্যেঠাদের স্বাদশিকতার উৎসাহ তাঁকে এগিয়ে চলতে প্রেরণা জুগিয়েছে।

১৯০৭-৮ সালেই তিনি অনুশীলন দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

১৯১১ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর, দলের নির্দেশে রিভলভার আনতে ধরা পড়ে ১ বৎসর জেল খেটেছেন।

১৯১২ সালে ডিসেম্বর, দিল্লীতে বড় লাটের উপর বোমা পড়ে। বাংলায় সতীশ পাকড়াশীর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়।

এই থেকেই (১৯১২, ডিসেম্বর) আত্মগোপন কাজ শুরু হয়েছে।

আত্মগোপন করে পূর্ববঙ্গ-উত্তরবঙ্গ সংগঠন গড়ার কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

১৯১৩ শেষ দিকে রাজাবাজার আসেন এবং বোমা মামলায় পুনরায় তাঁর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়।

১৯১৪ সালের প্রথম দিকে বাদুড় বাগানে বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বোসের সাথে পরিচয় হয়।

রাজসাহীতে গোপন সংগঠনের কাজে ফটো বাঁধানো দোকান এবং ছাত্র পড়ানোর কাজ করেছেন।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বিপ্লবী নেতা ত্রৈলক্য চক্রবর্তীর সাথে পুরী গিয়ে কিছুদিন ছিলেন।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ সুরু হবার পরে পুরী থেকে ফিরে মালদহ দিনাজপুরের কাজে যান।

১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে বসন্ত চ্যাটার্জিকে হত্যা করতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়ে রাজসাহী যান।

১৯১৪ সালে দিল্লীতে আবার বড় লাটের উপর বোমা পড়ে। রাসবিহারী বোসের নামে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা। আর কমরেড সতীশ পাকড়াশীকে ধরার চেষ্টা।

কমরেড সতীশ পাকড়াশী মসার পিস্তল চালনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন।

রাজসাহী জেলার নাটোরের মোহিত মৈত্র (দেশহিতৈষীর সম্পাদক ছিলেন) সতীশ পাকড়াশীর সম্পর্শে আসেন।

অর্থ সংগ্রহে ময়মনসিংহের এক ধনী বাড়িতে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

বিদ্রোহের কাজ পরিচালনায়, দলীয় নির্দেশে তিনি যুক্তবাংলার এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্তে যোগাযোগ করেন।

এই সময়ে রাজসাহীর ধরাইল গ্রামে ডাকাতি করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

যুদ্ধের মধ্যে ভারতে বিদ্রোহের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় সতীশ পাকড়াশী দায়িত্ব নিয়ে মালদহে যান।

এই সময় মালদহ জেলা স্কুলের হেডমাস্টার গুপ্তচরের কাজ করতে থাকায় কমরেড সতীশ পাকড়াশীর নেতৃত্বে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত অর্থের প্রয়োজনে বাংলা দেশে বহু স্থানে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল। এই কাজে সতীশ পাকড়াশী জড়িত ছিলেন।

১৯১৬ সালের জুন মাসে প্রকাশ্য দিবালোকে দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত কুখ্যাত বসন্ত চ্যাটার্জিকে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী হত্যা করে সরে পড়েছিলেন।

১৯১৭ সালে চরম নিষ্পেষণের সময়, চরম সংকট মুহূর্তে দলকে বাঁচাতে সতীশ পাকড়াশীর নেতৃত্বে গৌহাটিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি। পুলিসের নজরে পড়ায় রক্তাক্ত সংগ্রাম করে বহু কষ্টে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী পালাতে সক্ষম হন।

১৯১৮ সালে মার্চ মাসে হাইকোর্টের সামনে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

তাঁর কাছে কোন কিছু না পাওয়ায় ষ্টেট প্রিজনার করে রাজসাহী জেলে নিয়ে রেখেছিল।

জেলখানায় বসে রুশিয়ার বিপ্লব বুঝতে চেষ্টা করেন।

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মুক্তি পেয়ে বাইরে আসেন।

কংগ্রেসের সাথে মিলে যাবার বিরুদ্ধে বিপ্লবী পুলিন দাসের সাথে কমরেড সতীশ পাকড়াশী ছিলেন।

এর দুই বছর পরে পুলিন দাসের নেতিবাচক কর্মপন্থায় সতীশ পাকড়াশী ও আরো অনেকে আস্থা হারান।

১৯২৩ সালের প্রথম দিকে রুশিয়া প্রত্যাগত অবনী মুখার্জির সাথে আলাপ-আলোচনা হয়।

কমরেড সতীশ পাকড়াশীকে বিদেশে পাঠিয়ে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা হয়েছিল। অবনী মুখার্জির জন্য শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি।

১৯২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী আবার রেগুলেশন থ্রি আইনে ধরা পড়ে ষ্টেট প্রিজনার হিসাবে ৫ বৎসর বন্দী থাকেন।

এবার জেলে বড় ব্যথা নিয়ে গিয়েছিলেন—ইউরোপ যাবেন, সোভিয়েত দেশে যাবেন, কোনটাই হোল না।

এবার ধরা পড়ার পর ভারতের প্রায় সব বড় জেলেই বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর অবস্থান।

এবার জেলে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সাথে কমরেড সতীশ পাকড়াশীর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে কমরেড গণেশ ঘোষের সাথে দেখা হয়েছে।

এই জেলেই কমরেড সতীশ পাকড়াশীর সাথে যতীন দাস, নিরঞ্জন সেন ও গণেশ ঘোষের আলোচনা হয়েছিল, বাইরে বেরিয়ে একত্রে কাজে নামা।

সূর্য সেনের সাথে পরে এই জেলেই দেখা হয়েছিল।

বাইরের জেলে যাবার পথে সূর্য সেনের সাথে একত্রে কাজের কথা ঠিক হয়েছিল।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে প্যারোলে বাড়ি আসেন। তার কিছুদিন পরেই মুক্তি পান।

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে এলবার্ট হলের কৃষক-মজুর পার্টির সভায় গিয়েছিলেন।

পরের দিনের শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বিপ্লব-বিমুখ পুরানো নেতৃত্ব বিরোধী অসন্তোষকে কমরেড সতীশ পাকড়াশী সংগঠিত রূপ দিয়েছিলেন।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্কসার্কাস ময়দানের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন।

এই অধিবেশনে বিপ্লবী নেতৃত্বও জমায়েত হয়েছিল। কমরেড সতীশ পাকড়াশী ছিলেন।

পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবীরা কাজের জন্য সতীশ পাকড়াশীদের সাথে আলোচনা করে।

বাংলার উৎসাহী সংগ্রাম অনুরাগী যুবকদের সংগঠিত করার কাজে কমরেড সতীশ পাকড়াশী দায়িত্ব নেন।

অনুশীলন মুখ্য নেতৃত্বের সাথে আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়া বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী জীবনের ঝুঁকি বিদ্রোহ করেছিলেন।

লড়াকু যুব শক্তিকে বৈপ্লবিক কাজে অনুপ্রাণিত করে "অনুশীলন রিভোল্টিং গ্রুপ" তৈরী করেন।

কমরেড সতীশ পাকড়াশী যুক্ত বাংলার অগ্নিযুগের নির্ভীক দৃঢ়চিত্ত বিপ্লবী সংগঠক।

বাংলাদেশের পুনঃ বিদ্রোহের পরিকল্পনায় কমরেড সতীশ পাকড়াশী, যতীন দাস, অম্বিকা চক্রবর্তী, বিনয় রায়, মিলিত হয়ে কাজের প্রোগ্রাম নিয়েছিলেন।

বিপ্লবী সব দলই রিভোল্টিং গ্রুপে যোগ দিয়েছিল।

কমরেড সতীশ পাকড়াশীর সাথে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে নিরঞ্জন সেনের বাসায় সূর্য সেন ও গণেশ ঘোষ গোপনে মিলিত হয়েছিলেন।

১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মেছুয়াবাজার একটি পুলিস হানা দিয়ে বোমা অস্ত্র সহ বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী ও অন্যান্য সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

প্রস্তাবিত কাজের মুখেই মেছুয়াবাজার বোমার মামলা তৈরি হল।

১৯৩০ সালে মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় কমরেড সতীশ পাকড়াশী ও নিরঞ্জন সেনের ৭ বৎসর জেল ও অন্যান্যদের ৫ বৎসর হয়।

আলিপুর জেলে কমরেড হালিম, সামসুল হুদা, সরোজ মুখার্জির সাথে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত কাগজ পত্র পড়েন।

এইখানেই তাঁর কমিউনিস্ট হবার ইচ্ছার প্রকাশ।

আগষ্ট মাসে রাজসাহী জেলে গমন।

১৯৩১ সালে হাজারিবাগ জেলে প্রেরণ। এই থানে আচার্য কৃপালনীর সাথে আলাপ হয়।

১৯৩৩ সালের প্রথমে আলিপুর জেলে আগমন।

এই জেলে কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন—পড়া শোনা করে বিপ্লবী হও, আগামী যুগ গণআন্দোলনের যুগ।

১৯৩৩ সালের এপ্রিলে ১৬ জন সহ কমরেড সতীশ পাকড়াশী আন্দামান যান।

১৯৩৩ সালের মে মাসে, মর্যাদার দাবীতে অনশন ধর্মঘট সুরু করেন।

কমরেড সতীশ পাকড়াশী মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় অর্থনীতি পড়তে সুরু করেন।

পুরাতন বিপ্লবী চিন্তাধারার পরাজয়, কমরেড সতীশ পাকড়াশী কমিউনিস্ট কন্‌সলিডেশনে যোগ দান করেন।

১৯৩৬ সালে কমরেড সতীশ পাকড়াশী ঘোষণা করেন, "আমি কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করব"।

১৯৩৮ সালে তাঁকে মুক্তি দিয়ে নজর বন্দী করে মাধবদীর বাড়িতে রাখে।

এই অবস্থার মধ্যেও তিনি এলাকায় কাজ করেছেন।

নজরবন্দী থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন।

কমরেড সোমেন চন্দ্র প্রমুখকে নিয়ে সাংস্কৃতিক চক্র তৈরী করেন।

এই সময় গোপন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজ করতে থাকেন।

যুদ্ধের সময়ে অর্ডিনান্স অমান্য করে ১৯৪০ সালে সভাপতিত্ব করায় ৬মাস জেল হয় পরে ছাড়া পাবার সাথে সাথে জেলে নিয়ে যায়। ১৯৪২ সালে ছাড়া পান।

১৯৪৩ সালে তিনি কলিকাতা আসেন। পার্টির হিসাব-রক্ষকের কাজ করেন।

১৯৪৯ সালে ধরা পড়ে জেলে যান এবং ১৯৫১ সালে মুক্তি পান।

১৯৫১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তান শহীদ স্মৃতি সমিতির সভাপতি হন।

পূর্ব পাকিস্তানের কর্মীদের সাহায্যের জন্য সমিতির হয়ে নিরলসভাবে খেটেছেন।

তার প্রচেষ্টায় মামলা, চিকিৎসা ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পরে পূর্ব বাংলার কর্মীদের একটা দল চলে আসে, তাদের সাহায্যে তিনি এগিয়ে যান।

এই কাজ তিনি বিশ্রাম ছেড়ে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত করেন।

তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সভ্য ছিলেন।

৫ বৎসর বিধান পরিষদের সভ্য ছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কণ্ট্রোল কমিশনের সভ্য ছিলেন।

তিনি কিশোর বাহিনীর সভাপতি ছিলেন।

১৯৫৫ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত P. R. C-র কার্যকরী কমিটির সভ্য ছিলেন।

২।৩ বার খাদ্য ও অন্যান্য দাবিতে আইন অমান্য করেছেন।

১৯৫৫ সালে চীন ভারত সীমানা বিরোধে তিনি পার্টির কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৯৬০ সালে বর্ধমানে প্রেনামে একজন সাচ্চা কমিউনিস্টের ভূমিকা নিয়ে লড়েছেন।

১৯৬০ সালের জানুয়ারী ভারত রক্ষা আইনে ধরা পড়েন।! ২ বৎসর জেলে ছিলেন।

১৯৫০ সালে বাংলা দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস কোথায়, "বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে" বইতে তিনি তুলে ধরেছেন।

নকশাল আন্দোলন রাজনৈতিক বিচ্যুতির প্রকট রূপ বলে চিঠিপত্রে লেখেন।

১৯৫৫ সালে হাঁপানীতে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯৫৬ সালে মাজা ভেঙে যাওয়ায় পি. জিতে নেওয়া হয়।

১৯৫১ সালে ডিসেম্বর মাসে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় পি. জিতে নেওয়া হয়।

১৯৫২ সালে ৩০শে ডিসেম্বর কমরেড সতীশ পাকড়াশীর মৃত্যু হয়।

অগ্নিদিনের কথা সতীশ পাকড়াশীর লেখা একমাত্র বই যা আত্মজীবনীমূলক হলেও ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের একটি তথ্যসমৃদ্ধ দলিল। বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হবার দীর্ঘ দিন পরে অধুনালুপ্ত মাসিক বিংশ শতাব্দী পত্রিকায় ১১ বর্ষ ১০ম সংখ্যা (চৈত্র ১৩৫২) থেকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। কিন্তু পত্রিকার প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ায় ১২ বর্ষ ১০ম (চৈত্র ১৩৫৫) সংখ্যার পর থেকে আর প্রকাশিত হয়নি। এর পরে নবজাতক প্রকাশন বইটি প্রকাশ করে। সতীশদার মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে বইটির পরবর্তী সংস্করণের প্রশ্ন উঠে। তিনি একে আরো পরিবর্ধিত করতে চেয়েছিলেন ও তার প্রাথমিক কাজে হাতও দিয়েছিলেন কিন্তু তা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল না অসুস্থতার কারণে।

সতীশদার মৃত্যুর পরে দেখা যায় বইটির বেশ কিছু ফর্মা দপ্তরীর ঘর থেকে খোয়া গিয়েছে। ফলে অনেকেই বইটি ক্রয় করতে পারেননি। চাহিদা সত্ত্বেও নানা কারণে বইটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। এই সংস্করণে একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে, সেটি তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী। সতীশদার অন্যতম সহকর্মী কমরেড নির্মল মৈত্র এটি সংকলন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সতীশদার একটি বিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের প্রয়োজন। তা ছাড়া তাঁর লেখা দিনপঞ্জী ও চিঠিপত্র নিয়ে একটি সংকলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে। সবশেষে এই বইটি যে আবার পাঠকদের দরবারে উপস্থিত হল তার জন্যে মজহারুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাই।

২০শে মার্চ ১৯৫২

শ্যামসুন্দর দে